আবির্ভাব

এরিক ফন দানিকেন

অনুবাদক : অজিত দত্ত

লোকায়ত প্রকাশন

১৯৬৫, ইকন-ফের্লাক, ডুসেলডর্ফ উণ্ড্ ভিয়েন।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় কর্তৃক
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত

পরিবেশক :
দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ
৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

অনুবাদকের নিবেদন

বাঙালি পাঠকমহলে এরিক ফন দানিকেন আজ একটি অতি পরিচিত নাম। পঁচাত্তর সালের আগস্টে যখন তিনি কোলকাতায় এসেছিলেন তখন যে শ্রদ্ধা, যে প্রীতি বাংলার মানুষ তাঁকে জানিয়েছেন, তার তুলনা কোলকাতার সাম্প্রতিক ইতিহাসে মিলবে না। তাঁকে চোখে দেখতে, তাঁর মুখ থেকে দুটো কথা শুনতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছেন কোলকাতার যাদুঘরে এবং বিজ্ঞান কলেজে। প্রগতিশীল চিন্তার ভাণ্ডার, বহু-বিতর্কিত সেই দানিকেনের আর একখানি বই তুলে দিচ্ছি তাঁদের হাতে।

'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?' তাঁর এ-জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের হেন ক্ষেত্র নেই যেখানে দানিকেন কোদাল পাড়েননি। এবার নেবেছেন বিজ্ঞানের প্রায়-অকর্ষিত পরামনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে, উদ্দেশ্য, গ্রহান্তরের মানুষের রেখে যাওয়া আরো নজিরের অনুসন্ধান করা।

পরামনস্তত্ত্বের পোড়ো জমিতে কোদালের মুখে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম উঠবে 'ধর্ম' আর যেহেতু দানিকেন ইউরোপের মানুষ, তাই তাঁর কোদালের মুখে স্বভাবতঃই প্রথমে উঠবে 'খৃস্টধর্ম'। এবং সে ধর্মের আলোচনা-সমালোচনাও যে খানিকটা করবেন তাতে সন্দেহও নেই, এবং করেওছেন। কিন্তু সে আলোচনা-সমালোচনা গোঁড়া খৃস্টানেরই ভালো লাগবে না, তো অন্যে পরে কা কথা। তবে, বইয়ের মনোহরার চিনির খোসাটার (সেটাও কম মিষ্টি নয়!) ধর্মের ওই প্রাথমিক কচকচিটুকু সহ্য করতেই হবে, কিন্তু তার ভেতরে যা মিলবে তা মনোহরার মতই সরেস এবং মনোহারী।

আগের বইগুলোর তুলনায় এ বইখানা অনুবাদ করতে গিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়েছিল পরিভাষা নিয়ে। বাংলা ভাষায়

পরামনস্তত্ত্বের এখনো নাড়ীই কাটা হয়নি, তো বুলি ফোটা তো দূরের কথা। তাই বেশ খানিকটা স্বাধীনতা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতে হয়েছে। নিজেই গড়ে নিয়েছি কিছু পরিভাষা। তবে, তাদের প্রায় প্রত্যেকটির যাথার্থ্য সম্পর্কে কোচবেহারের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান এবং কুয়েঙ্কা লিপি-ফলকের (বীজ ও মহাবিশ্ব—১৩নং ছবি) পাঠোদ্ধারকারী বিখ্যাত পণ্ডিত, ডাঃ দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল মহাশয়ের মতামত গ্রহণ করেছি এবং তাঁর সমর্থনও পেয়েছি। এ বিষয়ে আরো সাহায্যের জন্যে হাত পেতেছি বন্ধুপত্নী ডাঃ কৃপাময়ী কাঞ্জিলাল মহাশয়া এবং ডাঃ ভবতোষ দত্ত মহাশয়ের কাছে। এতৎ সত্ত্বেও, দানিকেন তত্ত্বের গুণী পাঠকদের কেউ যদি আরো ভালো কিছু উপদেশ করেন, সকৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করবো।

দানিকেনের গ্রন্থের অনুবাদ ছাড়াও এ গ্রন্থে আরো একটি লেখা সংযোজিত হয়েছে। লিখেছেন কোলকাতার ভারতীয় যাদুঘরের (মরা সোসাইটি!) পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষক এবং কোলকা[illegible] দানিকেন সোসাইটির প্রধান 'পুরোহিত' শ্রীযুক্ত শ্যামল চ[illegible] মহাশয়। দূরের পাঠকদের অনেকেই দানিকেনের কো[illegible] তথা ভারত সফর সম্পর্কে আজো কৌতূহলী। শ্যা[illegible] 'দানিকেনের কোলকাতা' তাঁদের কৌতূহল নিরসনে সাহায[illegible] বলে মনে হয়।

দানিকেনের কাশ্মীর সফর নাকি 'বিফল' হয়েছি[illegible] 'বিফলতার' পরিমাণ কতখানি, তার হদিস পাওয়া গে[illegible] লেখক পীতর ক্রাসা রচিত দানিকেন জীবনী, "দানিকেন [illegible] পড়ে। শ্যামলবাবুর লেখায় সে তথ্যের উদ্ধৃতি অত্যন্ত চমকপ্রদ। ক্রাসার মূল জার্মান গ্রন্থ থেকে সমস্ত উদ্ধৃতির অনুবাদ করে দিয়েছেন শ্রীযুত ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

আমাদের শাস্ত্র-পুরাণাদির গভীর থেকে নানা মণি-মুক্তো উদ্ধার করে দিয়ে সাহায্য করেছেন ডাঃ দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল, পদার্থ-বিদ্যার নানা সমস্যার জট ছাড়িয়ে দিয়ে সাহায্য করেছেন ডাঃ প্রতীপ কুমার চৌধুরী এবং সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজ—পাণ্ডুলিপি সংশোধন এবং প্রুফ দেখা—সে দুটো করে দিয়ে সাহায্য করেছেন আমার পুত্র-বধূ কল্যাণীয়া রেবা। প্রচ্ছদের পরিকল্পনা এবং চিত্রবিন্যাস এবারেও বন্ধু শ্রীঅমল ঘোষের। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

অজিত দত্ত

দানিকেনের

পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থনিচয় —

দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ ?

নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন

বীজ ও মহাবিশ্ব

আমার পৃথিবী

সূচীপত্র

ভূমিকা

এ গ্রন্থের সূচনা আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে। দশ বছর আগে প্রথম যখন আমি আশা-নিরাশা-বাণিজ্য-বেসাতিসঙ্কুল বিশাল সরাইখানা সদৃশ সেই লূর্দ্ নগরীতে যাই, সেই তখন থেকে একে আমার অন্তরের একান্ত গভীরে নিয়ে ঘুরেছি। (লূর্দ্ দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের এক তীর্থক্ষেত্র। সেখানে নাকি অলৌকিকভাবে রোগ নিরাময় হয়!) যত ঠাকুর সেখানে দেখেছি, যত অন্ত্যেষ্টি সঙ্গীত সেখানে শুনেছি, সব আমার মনের গোপন কোঠা থেকে ক্রমাগত হানা দিয়ে ফিরেছে এতকাল ধরে।

পাঁচটি বিশাল মহাদেশের ভেতর দিয়ে আমার নভশ্চর-দেবতাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করার কালে অলৌকিক দেবস্থানগুলিও দেখতে ভুলিনি। দেখেছি, তাদের সবগুলোই কী অদ্ভুত একরকমের! ক্রমে ক্রমে একটা কথা মনে চেপে বসেছে,—অলৌকিকের অস্তিত্ব-সম্পর্কিত সচেতনতা এমনই একটা ব্যাপার, যার গণ্ডি রয়েছে আমাদের সকলকে ঘিরে। এই সব কথা ভাবতে গিয়ে আমার নভশ্চর-দেবতাদের ভুলিনি, কিন্তু এমন কতকগুলো বই আছে, যারা গ্রীষ্মের আমের মত পেকে ওঠে।

যে সব লোকের 'ভর' হয়, প্রত্যাদেশ যারা পায়, তারা কেমন লোক? অস্থির-চিত্ত, ধর্মান্ধ কি তারা?

যে খৃস্টান মঠ, বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক মঠ, তাদের বিভূতিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়, শুধুমাত্র সেই সব মঠের অনুগ্রহভাজন হবার উদ্দেশ্যেই কি তাদের ওই অলোকদর্শন, ওই বিভূতি প্রদর্শন?

ক্যাথলিক মঠের গোঁড়া ধর্মমত যে-অলোকদর্শন সম্পর্কে অনেকখানি উৎসাহী, সে অলোকদর্শন কি দৈবপ্রেরণা প্রসূত?

আবির্ভাব

মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল ধর্ম 'ঈশ্বরের যে বাণী' উচ্চারণ করে, সত্যই কি বিশ্বাস করবো, সে বাণী ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত ?

দেবস্থানে যত বিভূতির প্রকাশ দেখি, সে সব কি প্রবঞ্চনা, কিম্বা আত্মপ্রবঞ্চনা ?

সে সব অলৌকিকের পেছনে কি আয়ুর্বেদিক অথবা বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি আছে, যার সাহায্যে তারা বিশ্বাসযোগ্য এবং ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে ?

নানা তীর্থ, নানা ধাম ঘুরে বেড়িয়েছি, পৃথিবীর বড় বড় গ্রন্থাগারে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, হিমালয়প্রমাণ নজিরও জমে উঠেছে, সেই সঙ্গে এসেছে প্রশ্নের প্লাবন, অভিভূত হয়েছি সে-প্রশ্ন-বন্যায়। প্রকৃতিগতভাবে প্রাচীন পন্থীদের মত আমি বিশ্বাসী নই, আমি জানতে চাই আমার দেবদত্ত বিচার-বিবেচনা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চাই আমি, কিন্তু দেবতার দোহাই পেড়ে মাথা নত করে শুধু মেনে নিতে নারাজ।—আমি কাজে লেগে পড়ি, মেনে নিয়ে বসে থাকি না। আমি কাজে নাবি ঈশ্বরের আঙিনায় কুতূহলী মজুরের মত, কিন্তু সে ঈশ্বর এত বড় যে কথায় কথায় তাকে ডাকা যায় না বিচারের আশে।

বহু বছরের পরিশ্রমের পর আজ প্রায় নিঃশঙ্কচিত্তেই বলতে পারি, আমার অনুপ্রবেশই এ পথে প্রথম। কিছু প্রশ্ন স্বাভাবিক-ভাবেই বিচার সাপেক্ষ থাকবে, তবে আশা করি, ভবিষ্যতে উপযুক্ত পণ্ডিতসমাজ এবং ধর্মসম্প্রদায়সমূহও বিশাল, জটিল এই অলৌকিকের রাজত্বের কার্য-কারণসম্পর্কিত আমার এই গবেষণাকে মেনে নেবেন এবং এ সম্পর্কে আজো যে সব ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে, খোলা মনে, অন্তর দিয়ে বিচার করে তাঁরা তাদের সংশোধনে এগিয়ে আসবেন।

জুরিখের ডাঃ রবেয়ার কেলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, অনেক

ভূমিকা

প্রেরণা, অনেক ধারণার জন্যে তাঁর কাছে আমি ঋণী, তাছাড়া এ গ্রন্থের এক অংশের রচনায় তিনি সহ-রচয়িতার ভূমিকাও গ্রহণ করেছিলেন। ডাঃ কেল প্রথম জীবনে ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর চর্চার বিষয় হয়েছে, আইন এবং রাষ্ট্রনীতি। তাঁর আইন সংক্রান্ত টীকা সুইস্ ব্যবহারজীবিদের নিত্য সহচর, তাছাড়া ঈশ্বর-তত্ত্বের ওপর তাঁর বহু গ্রন্থের ভেতর দুটি বিশেষ গ্রন্থের জন্যে তিনি স্বনামধন্য।

আর, পৃথিবীজোড়া প্রচারের জন্যে যে তেত্রিশটি প্রকাশন সংস্থা এ বই ছাপছেন, এই সুযোগে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

এরিক ফন দানিকেন।

আবির্ভাব

দিব্যদর্শন বাস্তব ঘটনা, অস্তিত্ব তার সত্যিই আছে।
দিব্যদর্শনের উদ্ভব বুদ্ধিমান মস্তিষ্কে।
সব বুদ্ধিমান মস্তিষ্কেই নিহিত আছে দিব্যদর্শন সৃষ্টির বীজ।
দিব্যদর্শন-সৃষ্টিতরঙ্গের উৎস বহির্জাগতিক।

* * *

গ্রহান্তরের মানুষের আমাদের গ্রহে আগমন সম্পর্কিত আমার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে অনেক নজির নিয়েছি পুরাণ থেকে। পুরাণের সেই জ্ঞান ভাণ্ডার বিস্ময়কর, চমকপ্রদ, কারণ তার ভেতর রক্ষিত আছে মানুষের কল্যাণে নানা 'ঘটনার' বিবরণ, সে সব ঘটনার অর্থ এবং উদ্দেশ্য পুরাণকার বুঝতে পারেননি তাঁর কালে। জাগতিক এবং বহির্জাগতিক জীবদের যোগাযোগের বিষয়ে পুরাণ একটি বিশাল ধন ভাণ্ডার, গুরুত্ব তার সীমাহীন।

* * *

বহির্জাগতিক মানুষ আমাদের সৌরজগৎ ছাড়াও ঘুরে বেড়িয়েছে আরো কত সৌরজগতে। তাদের উপযুক্ত, অনুকূল গ্রহ যেখানেই খুঁজে পেয়েছে, সেখানেই রেখে গেছে তাদের বংশধর, তাদের 'আপন অবয়বে'। সে বংশধরদের কেউ কেউ আমাদের চেয়ে কিছু বেশী উন্নত। 'দানব-মস্তিষ্ক'কে তারা পোষ মানাতে পেরেছে, উন্নততর করেছে, করেছে সুশিক্ষিত আমাদের চেয়ে ভালো করে। সুসভ্য সেই পণ্ডিতকুল, সুপরিণতবুদ্ধি সেই বহির্জাগতিক জীবেরাই আমাদের কাছে পাঠায় প্রবল শক্তিশালী চিৎ-স্পন্দন। আমরা যে তাদেরই 'রক্তাতো' ভাইবোন। সে স্পন্দন পাঠানোর উদ্দেশ্য, আমাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা, উদার, উন্মুক্ত করা।

অচেতনের অত্যাশ্চর্য জগৎ অল্প কিছু 'ভাগ্যবানের' কপালে অবারিতদ্বার,—ধর্মগুরুদের কথা বলছি না, বলছি মহামানবদের কথা। তাঁরাই এনেছেন সে জগৎ থেকে কত অলৌকিক আবিষ্কার।

১

দিব্যদর্শনের অস্তিত্ব কি সত্যিই আছে ?

আমার দুঃখু, আমার কপালে দিব্যদর্শন লাভ কখনো ঘটেনি। ১২০০০ স্বর্গত সাধু-সন্তদের কেউ আজ পর্যন্ত আমায় ডেকে বলেননি, 'কি গো, কেমন আছো ?' জানাননি কোন শুভেচ্ছা। কিন্তু প্রথমবার লূর্দ্‌ গিয়েই বুঝেছি যে এই দিব্যদর্শনের ব্যাপারটা এমনই ব্যাপার, যার সঙ্গে আমাদের সকলেরই একটা যোগ আছে। কত ভাবাবিষ্ট মানুষ সেখানে দেখেছি, শুনেছি কত মানুষের করুণ আকুতি, সেই সঙ্গে দেখেছি তাদের অশেষ কষ্ট। পাণ্ডাদের জ্বালায় তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছি। অলৌকিক ঘটনা কিছু ঘটতে দেখিনি।

১২৫ বছর আগে লূর্দে্‌ একটি চতুর্দশী কন্যা দিব্যদর্শন লাভ করেছিল। আজ প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটে সেই পবিত্র ক্ষেত্র দর্শন মানসে। পৃথিবীর হাজার হাজার তীর্থক্ষেত্রের ভেতর লূর্দ্‌ও একটা। সব তীর্থের মত সেখানেও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়, প্রায় একই অবস্থায়, একই ধরনে, একই পরিপ্রেক্ষিতে।

ক্যাথলিক বাগ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যাকে বলে, 'মানুষের মাঝে ঐশীশক্তির প্রকাশ' সেই রহস্য-রসিত প্রকাশের ব্যাখ্যা কেমন করে দেবো ?

প্রায় ক্ষেত্রেই দিব্যদর্শন ঘটে কোন একজন বা কয়েকজনের সমষ্টির কপালে। সে-দর্শন সচরাচর পবিত্র পরিবারের, খৃষ্টীয় প্রতীচ্যে যার অর্থ, মা মেরী, কোন একজন প্রধান দেবদূত কিম্বা যিশু অথবা স্বয়ং পিতা যোসেফ। সে সব দর্শনে যাঁদের আবির্ভাব ঘটে, তাঁরা কেউ কিন্তু নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র নন। যাঁরা দর্শন দেন, তাঁরা যে শুধু

হাসি হাসি মুখ করে আশীর্বাদ বিতরণ করতে আসেন, তা নয়, তাঁরা আসেন মানুষকে বলতে, কী তাদের কর্তব্য, কী অকর্তব্য এবং কোন কর্ম নিষিদ্ধ। সমস্ত মূর্ত অশরীরীই বলেন, তাঁরা স্বর্গের দূত, বলেন, তাঁদের হাতে আছে মানুষের রক্ষাকবচ, মানুষকে ত্রাণ করবার শক্তি আছে তাঁদেরই হাতে। আবার মনুষ্যকুলকে ধ্বংস করবার ক্ষমতাও আছে তাঁদেরই হাতের মুঠোয়। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ব্যাপারেও তাঁরা হস্তক্ষেপ করেন। সমষ্টি-মস্তিষ্কে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে প্রভাবিত করেন গোটা সমাজকে !

আমি আমার নভশ্চর-দেবতাদের সন্ধানে অনেক ঘুরেছি কিন্তু লূর্দ্ আমার মনে যে-দাগ কেটেছিল, সে-দাগ মোছেনি। দিব্যদর্শন, তথা অলোকদর্শনসম্পর্কিত 'সরকারী' বেসরকারী নানা বই পত্তর অলোকদর্শনধন্য পবিত্রস্থানসমূহে যা কিছু পেয়েছি, সংগ্রহ করেছি, পড়েছি। যেখানেই ব্যক্তিবিশেষ অথবা সমষ্টিবিশেষ দিব্যদর্শন লাভ করেছে, সেখানেই মানুষের মিছিল গেছে কাতারে কাতারে, তা সে স্থান পোপের অনুমোদনপুষ্টই হোক, অথবা অননুমোদিতই হোক, কিম্বা অনুমোদন-অসম্মতির মাঝামাঝি নীরবতাই হোক, মিছিলের অপ্রতুলতা কখনো ঘটেনি। 'প্রতিরোধ যেখানে অক্ষম, পোপের আশিষ বর্ষিত হয় সেইখানেই' (কুৎ ভুখোল্স্কি)। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি মানুষের যে-লোভ, অলৌকিকে 'বিশ্বাস' করবার প্রবৃত্তি তার চেয়ে কোন অংশে, কোন সময়েই কম নয়।

কয়েক বছর আগে পশ্চিম জার্মানীতে আর বের্লিনে দিব্যদর্শন-সম্পর্কে জনমতের একটা সমীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে, শতকরা ৫৩ জন বলেছিল, তারা দিব্যদর্শন এবং অলৌকিকে বিশ্বাসী, ৩৬ জন বলেছিল, তারা বিশ্বাস করে না, ১১ জন বলেছিল, ও বিষয়ে তারা কিছু জানেই না। আমার কেমন ধারণা, সমীক্ষার ফল পশ্চিম জার্মানী এবং তার বাসিন্দাদের পুরোপুরি প্রতিনিধিমূলক

নয়। অনেক দেশ আছে, বিশেষ করে ক্যাথলিক দেশগুলোতে, অলৌকিকে বিশ্বাসীদের অনুপাত আরো অনেক বেশি।

কেমনতরো আদিম মাটিতে ও বিশ্বাসের 'ফলন' উপচে পড়ে? কোন্ অনন্ত শক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখে, দেশ-কাল-সংস্কৃতি নির্বিচারে? ধর্মের ধরন-ধারণ উচ্চ-নীচ নির্বিচারে?

প্রতীত ব্যাপারটিকে একান্ত করে বুঝতে হলে, 'দিব্যদ্রষ্টাকে' জানতে হবে, জানাতে হবে দিব্যদর্শনের স্থান এবং পরিবেশকে, তাই গোড়াতেই কিছু অত্যাশ্চর্য দিব্যদর্শনের নিখুঁত ছবি পরিবেশন করবো। তার সব কটাতেই পাওয়া যাবে অলৌকিকের সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্য।

* * *

ইতালির ব্রেশা থেকে পাঁচ মাইল তফাতে মন্তিকিয়ারী যে ঘটনার কারণে বিখ্যাত হয়েছিল, সে ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের মধুঋতুতে।

এক তরুণী ধাত্রী, নাম পিয়েরিনা জিল্লি, একদিন হাসপাতালের গির্জেয় দেখলো, বেগনি পোষাক পরা এক সুন্দরী মেয়ে হাওয়ায় ভাসছে, চোখে তার জল, বুকে তার তিনটে তরোয়াল বেঁধা, রক্তের ক্ষরণ কিন্তু বিন্দু মাত্র নেই। রহস্যময়ী সে রমণী মূর্তি উচ্চারণ করছে তিনটি মাত্র শব্দ,—'প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত্ত, ত্যাগ'।

ভক্তিমতী পিয়েরিনা হতচকিতা। সে কি ভূত দেখলো? তার চোখ, তার চেতনা কি ভুল দেখছে? না কি, সে সত্যিসত্যিই দিব্যদর্শন লাভ করলো! প্রথমে সে সেই অপূর্ব অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা রেখে দিল তার অন্তরের গভীরে, গোপনে।

সাতচল্লিশ সালের ১৩ই জুলাই আবার সেই আবির্ভাব! এবারে সে অজানিতা শ্বেতবসনা, আর সেই তলোয়ার? না, সে বস্তু নেই। তাদের স্থান অলঙ্কৃত করেছে তিনটি প্রস্ফুটিত গোলাপ—একটি সাদা,

একটি লাল, অপরটি হলদে। পিয়েরিনা ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কে তুমি ?' রমণীর মুখে হাসি, বললেন, "আমি যিশুর মা।··· আমার ইচ্ছে, প্রতি বছর ১৩ই জুলাই পালিত হোক 'রহস্য গোলাপ'এর (Rosa Mystica) সম্মানে······"(১)। তারপর ধীরে ধীরে মূর্তি মিলিয়ে গেল বাতাসে।

অলৌকিক আবির্ভাবের পুনরাবির্ভাব ঘটলো গ্রামের গির্জেয় প্রায় পর পর, ২২শে অক্টোবর, ১৬ই নভেম্বর, ২২শে নভেম্বর। সে কদিন 'রমণী' পিয়েরিনার অনেক কথার জবাব দিয়েছিলেন। শেষ আবির্ভাবটি বিশেষভাবে নাটকীয়, কারণ তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, গ্রামের গির্জেয় '৮ই ডিসেম্বর দ্বিপ্রহরে আবার আসিব ফিরে'।

পিয়েরিনার সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, মন্তিকিয়ারীর চৌহদ্দি ছাড়িয়ে গোটা লম্বার্দির সমস্ত মানুষের কাছে। ফলে, ৮ই ডিসেম্বর জড়ো হয়েছে, হাজার হাজার মানুষের মিছিল, গির্জে উপছে পড়ছে, রাস্তাতেও আর তিল ধারণের স্থান নেই। সে নাটকের মূল নায়িকা, পিয়েরিনা জিল্লিকে মানুষের সে ভিড় ঠেলে গির্জের ভেতর আনাই দায়। গির্জের মাঝখানে যে জায়গাটিতে পিয়েরিনা এর আগে তিনবার দিব্যদর্শন লাভ করেছিল বসে পড়ল সেইখানটিতে হাঁটুগেড়ে। সে দিব্য-রমণী লোকের মুখে মুখে ইতিমধ্যেই 'যিশুর মা' হয়ে গেছেন। বিশ্বাসী এবং কৌতূহলী জনতার সঙ্গে সুর মিলিয়ে পিয়েরিনা সুরু করলো স্তব পাঠ। তারপর হঠাৎ এক সময় বলে উঠলো, 'হে মা, যিশু-জননী'।

কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না, বরং বলি, কিছু লোক ঠিক বুঝতে পারছে না, কিছু দেখা যাচ্ছে কি না। তা, সে যাই হোক, দৃষ্টি সকলেরই পিয়েরিনার ওপর নিবদ্ধ। পাচ্ছে তাদের গাঁয়ের মেয়ে পিয়েরিনার সঙ্গে মেরী মায়ের আলাপচারী

শুনতে না পায়, তাই এ একাগ্রতা। মায়ের আবির্ভাবের খবর বাইরে অপেক্ষমান জনতার কাছেও পৌছে গেল কানে কানে।

শোনা যায়, পিয়েরিনা দেখলো কুমারী মাতা নেবে আসছেন তুষার শুভ্র সোপানশ্রেণী বেয়ে, এবারেও বক্ষে তাঁর শ্বেত-পীত-রক্ত গোলাপ, মুখে অপার্থিব হাসি। মা বললেন, 'আমি নিষ্কলঙ্ক-যোনি, আমি পবিত্র মেরী, আমি আমার দেব-সন্তান যিশুর মা'।

তুষার শুভ্র সোপানশ্রেণী বেয়ে নাবতে নাবতে তিনি পিয়েরিনাকে বললেন, "এখন আমি মন্তিকিয়ারীতে এসেছি বলে আমার ইচ্ছে, আমি 'রহস্য গোলাপ' নামে অভিহিত হই"। তারপর সিঁড়ির শেষ ধাপে নেবে বললেন, 'যে কেউ এই টালিটির ওপর বসে প্রার্থনা করবে, ফেলবে অনুতাপের অশ্রুজল, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, স্বর্গারোহণ এবং মোক্ষ তার সুনিশ্চিত আর, আমার মাতৃ-হৃদয় তাকে রক্ষা করবে সকল আপদে'।

তারপর দীর্ঘ উনিশ বছর কেটে গেল, আর কোন আবির্ভাব ঘটলো না।

সচরাচর যা হয়ে থাকে, কিছু লোক পিয়েরিনাকে ঠাট্টা-তামাশা করলো, কিছু বা বললো, সে পবিত্র, সে পুণ্যশ্লোক। সাতচল্লিশ সালের ৮ই ডিসেম্বরের পর দিব্যদর্শন-ধন্য গির্জেটি অলৌকিকে বিশ্বাসী মানুষের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হল। কত রোগী সেখানে গেছে রোগ-মুক্তির কামনায়। তবে, মন্তিকিয়ারীতে যে অনেক অলৌকিক ঘটেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হাওয়ায় ভাসছে। পিয়েরিনাকে তিনি বললেন, ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সব সিঁড়িগুলোকে তিনবার চুম্বন করতে। তারপর বললেন, একেবারে নিচের সিঁড়ির বাঁ ধারে একটা ক্রুশ বসাতে। আরো বললেন, রোগগ্রস্ত মানুষ যেন সেখানে প্রভু যিশুর কাছে প্রার্থনা করে তাদের পাপ ক্ষমা করার জন্যে, তারপর ক্রুশ চুম্বন করে যেন সেই ঝরনার জল পান করে।

পিয়েরিনা সে আদেশ পালন করলো অক্ষরে অক্ষরে।

লোকের সঙ্গে ঝরনার ধারে বসে পিয়েরিনা প্রার্থনা করছে, এমন সময় আবার সেই 'রহস্য গোলাপের' আবির্ভাব। এবার তিনি একটি বিশেষ ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, 'আমার ইচ্ছা, এখানে আরো বড় একটি জলকুণ্ড স্থাপন করা হোক, যাতে রোগগ্রস্ত মানুষ অবগাহন করতে পারে'। পিয়েরিনা এখন তাঁর অন্তরঙ্গ, তাই গোলাপালঙ্কৃতা রমণীকে জিজ্ঞেস করলো, কী নাম হবে সে-ঝরনার? রমণী বললেন, 'মুক্তি ঝরনা'। পিয়েরিনা ফিরে শুধোয় 'ফন্তানেল্লেয় আপনার কী বাসনা?' 'এখানে আগত রোগগ্রস্তদের সেবা' (২)। তারপরে তিনি অন্তর্ধান করলেন।

ফন্তানেল্লের ঝরনার জলে রোগযন্ত্রণা সত্যিই দূর হয়! গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে, 'রোগাতুর মানুষকে এখানে নিয়ে এসো!' সত্যিসত্যিই অলৌকিক নিরাময় ঘটলো সেখানে।

* * *

১৯৬৬ সালের ৮ই জুন, কাল অপরাহ্ন। একশো জনেরও বেশি লোক ঝরনার ধারে প্রার্থনারত। বেলা তিনটে বেজে গেছে, পিয়েরিনা এসে পৌঁছলো, আগন্তুকদের অনুরোধ করলো, তার সঙ্গে স্তব পাঠ করতে। মুহূর্ত কয়েক পরেই স্তব পাঠ বন্ধ করে চেঁচিয়ে উঠলো পিয়েরিনা, 'দেখ, দেখ, আকাশপানে দেখ।'

পিয়েরিনা ছাড়াও বেশ কিছু বিশ্বাসী মানুষ দেখলো, ঝরনা থেকে প্রায় বারো হাত তফাতে একটি শস্যক্ষেত্রের ওপরে আকাশে মা মেরী ভাসছেন। এবারেও তিনি তিনটি গোলাপে সজ্জিতা। বললেন, সেই শস্য দিয়ে যিশুর ভোগ রাঁধতে। তারপর বললেন, সেই ভোগ রোমে নিয়ে যেতে আর অক্টোবরের ১৩ তারিখে নিয়ে যেতে ফাতিমায় (পোর্তুগালের গ্রাম, লিসবনের উত্তরে)। এ সব আদেশ-নির্দেশ দিয়ে চলে যাবার উপক্রম করতে পিয়েরিনা অনুনয় করলো, আর একটুক্ষণ থাকতে। মা মেরী তাঁর প্রিয় আধার পিয়েরিনার দিকে ফিরলেন, পিয়েরিনা জানালো, পুরোহিত, রোগগ্রস্ত এবং বিশ্বাসীজনের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা।

দুশোরও বেশি মানুষ প্রার্থনারত ঝরনার ধারে, পিয়েরিনা এলো আড়াইটে নাগাদ, শুরু হল সমবেত স্তবপাঠ। চতুর্থ স্তব পাঠকালে সে বলে উঠলো, 'মা এসেছেন'। প্রার্থনা এবং কথাবার্তা থেমে গেল। সবারই কান অদৃশ্যের সঙ্গে পিয়েরিনার আলাপচারীর দিকে। বাড়িতে তৈরী ভোগের সম্বন্ধে নিখুঁততর উপদেশ চাইলে রহস্য গোলাপ বললেন, 'কিছু শস্য প্রিয় পুত্র পোপ পাউলকে পাঠিয়ে দিও যাতে তার সামনেই সে-ভোগ পবিত্রীকৃত হয়, আর বাকীটুকু দিয়ে রুটি গড়ে আমার আবির্ভাবের স্মরণে ফস্তানেল্লে গ্রামে বিতরণ কর'।

সেই থেকে মানুষ ফস্তানেল্লে আর মন্তিকিয়ারীতে এসে প্রার্থনা করেছে, পোষণ করেছে কত আশা। অলৌকিকদর্শনধন্য অন্যান্য তীর্থের মত এখানেও মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা-প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে প্রতি দিবসে রজনীতে।

* * *

বলা যেতে পারে, এটা দিব্যদর্শনের একটা আদর্শ উদাহরণ। ঘটনার আগে মানুষ কিছু একটা দেখে, বিস্ময়ে বিমূঢ় সেই পুরুষ

অথবা নারী জানাতে চায় লোককে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, ডেকে আনে বিশ্বাসী আত্মীয়বন্ধুদের সেই বিশেষ স্থানটিতে, যেখানে সে 'দেখেছে'। অলৌকিক আবির্ভাবের খবর ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিগন্তরে। সে পুরুষ, সে নারী কি বিশেষ কোন গুণে গুণী? সাধারণ মানুষের চেয়ে কি তারা বেশি ভক্তিমান? গোঁড়া, ধর্মান্ধ কি তারা? বহির্জগৎ সম্পর্কে কি তারা কৌতূহলী? না কি, তারা সস্তায় নাম কিনতে চায়?

এ সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আমি অলোকদর্শনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছি পুরো দশ বছর ধরে। যখন শুরু করেছিলুম তখন বুঝিনি, কী অবিশ্বাস্য পরিমাণ বইপত্তর জমে উঠবে। ঝাড়াই বাছাই করে, নিয়েছি শুধু সেই কটি দিব্যদর্শনের ঘটনা, যাদের বৈশিষ্ট্য আরো অনেক দিব্যদর্শনের ঘটনার উদাহরণস্বরূপ হতে পারে। উদ্দেশ্য, যাতে আমার এই উদাহরণসমূহের ভিত্তিতে ওই সব অলৌকিকের ব্যাখ্যা যোগাতে পারি।

যদি বলি, একা এই খৃস্টান দুনিয়াতেই দিব্যদর্শনের অনুমিত সংখ্যা চল্লিশ (!) হাজারেরও বেশি তাহলে বুঝতেই পারছেন, কী পরিমাণ বিভিন্নতর বস্তু এতে আছে। ইতিহাসের পথ ধরে আজ পর্যন্ত সংঘটিত দিব্যদর্শনের নথিভুক্ত ঘটনানিচয় আমার পাঠকের সামনে উপস্থিত করবো। কিন্তু যতক্ষণ না ইতিহাসের এই বিশাল ক্ষেত্র থেকে আগাছা নির্মূল করা হচ্ছে, ততক্ষণ দেখানো যাবে না, কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছোন সম্ভব এবং কী ব্যাখ্যা তাদের দেওয়া যাবে অথবা তত্ত্বগতভাবে বিচার্যই বা কোন্ ব্যাখ্যা।

*　　*　　*

স্পেনের ইবোরায় প্রতি বছর ১৬ই আগষ্ট বিশ্বাসী মানুষের দল রক্তমাখা একটি বস্ত্রখণ্ডের সামনে প্রার্থনা করে। এ-প্রতীক পূজিত হচ্ছে ১০১০ সাল থেকে।

সে সময় একদিন খৃস্টের নৈশভোজোৎসব উদ্‌যাপন কালে ঘণ্টা-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লাল মদ খৃস্ট-রক্তে পরিণত হয়ে গেল। তা দেখে পাদ্রী বের্নার্দ অলিভিয়েরের মনে নাকি সন্দেহ জাগে। শোনা যায়, পর মুহূর্ত থেকেই সে-রক্তের পরিমাণ বাড়তে থাকে এক রহস্যময়-ভাবে এবং বিশ্বাসী ভক্তদের মনে হয়, সে রক্ত যেন গড়াচ্ছে প্রভুর বস্ত্রখণ্ড থেকে, বেদীর সোপান বেয়ে সে-রক্ত গড়িয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে, গির্জের মেজে। কল্পনা আরো দূর এগিয়েছে। গ্রামে কিছু রমণী নাকি পাথরের মেজের রক্ত মুছে নিয়েছে আপন অঞ্চল দিয়ে।— গির্জের ইতিহাসে একথা লেখাও আছে। সলসোনার পাদ্রী সন্ত এর্মেঙ্গল সে ঘটনার কথা শুনে পোপকে জানালেন। পোপ চতুর্থ সের্জেউস (১০০৯-১০১২) ইবোর্রার রহস্যময় রক্তমাখা বস্ত্রখণ্ডকে সর্বজন-পূজ্য হিসাবে ব্যবহৃত হবার অনুমতি দিলেন।

সাধু-সন্তদের পবিত্র আত্মাই যে শুধু অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে তা নয়, তাঁদের বস্ত্রখণ্ডেরও সে ক্ষমতা আছে। এ ব্যাপারে ইবার্রাই একমাত্র ব্যতিক্রম নয়।

* * *

১০৭৩ সালে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মসিয়ে তিয়েরি ব্রাবান্তের পিলেমন্তে নিহত হয়েছিলেন। খুনিরা তাঁর দেহ ফেলে দিয়েছিল একটা পচা ডোবায়। দেহের খোঁজে গ্রামবাসীরা বৃথাই আঁতিপাঁতি করল দিনের পর দিন, তারপর হঠাৎ একদিন একটা জ্যোতি দেখা গেল সেই ডোবার ওপর। সেই অলৌকিক আবিষ্কারে চমৎকৃত কৃতজ্ঞ এক শিল্পী কাঠের পাটার ওপর একটা ছবি আঁকলো, যেন জলের ওপরে মা হাওয়ায় ভাসছেন। ১২৯৭ সালে সে ছবি রাখা হল একটি নবনির্মিত গির্জেয়। গির্জের লিখিত ইতিহাস বলে, পবিত্রীকরণ উৎসবের দিন ছবিটি হঠাৎ 'অপূর্ব এক আলোর জ্যোৎস্নায়' উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল (৩)। ঘটনার

ইতিহাস সরকারীভাবে নথিভুক্ত না থাকলেও আমার ধারণা, ওটা মা মেরীরই কাজ। হয়তো তিনি সমবেত জনতার দিকে ফিরে একটু ক্ষমা-সুন্দর হাসি হেসেছিলেন, হয়তো বা তাঁর ছবির ভেতর থেকে তাদের দিকে একটু হাত তুলেছিলেন তাদের আশীর্ব্বাদ করতে।

*　　　*　　　*

স্পেনের ভালেন্সিয়ার কাছে হাত্তিভা থেকে মাইল তিনেক তফাতে কোদোল। ১২৩৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী খৃস্টান যোদ্ধাদের একটা ছোট্ট দল তাদের চেয়ে ঢের বেশি বড় একটা মুসলমান দলের সঙ্গে লড়ছিল।

যুদ্ধের আগে খৃস্টানদের ছ'জন প্রসাদ নেবার আগে প্রার্থনা করছিল। সবে তারা পাপ স্বীকার করেছে, প্রসাদ গ্রহণ তখনো বাকী এবং বাকীই রয়ে গেল, কারণ চিও পাহাড়ের দিক থেকে তখন শত্রুর রণহুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। যোদ্ধারা প্রার্থনা ফেলে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে উঠে পড়লো। গির্জে ধ্বংস হতে পারে এই ভয়ে পাদ্রী ভোগ এবং বেদী আবরক বস্ত্রটি পাথরের একটি স্তুপের নিচে লুকিয়ে রাখলেন। সে যুদ্ধে খৃস্টানরাই জয়ী হয়েছিল। পাদ্রী যখন পাথরের স্তুপের নিচে থেকে বেদী-আবরক বস্ত্রটি বের করলেন, দেখা গেল ভোগের ছ'খানা রুটি 'রক্তমাখা' আর সেগুলো আবরক বস্ত্রে আটকে রয়েছে। আরো আছে! পরের দিন মুসলমানেরা আরো অনেক সৈন্য, আরো বেশি রসদ নিয়ে এগিয়ে এলো। খৃস্টানদের স্বভাবতঃই মনে হল আর কোন আশা নেই, বাধ্য হয়ে তারা আগের দিন অধিকার করা চিও দুর্গে আশ্রয় নিল। পাদ্রীদের মাথায় হঠাৎ একটা মতলব খেলে গেল। পবিত্রীকৃত সেই বেদী-আবরক বস্ত্র একটা বাঁশে বেঁধে দুর্গের প্রাকারের ওপর দাঁড়িয়ে নাড়তে লাগলো শত্রুশিবিরের দিকে। কিম্বদন্তী বলে সে বস্ত্র থেকে আলোক রশ্মি বেরিয়ে ছড়িয়ে

পড়তে লাগলো দিকে দিকে, আর সে আলো এমনই চোখ ধাঁধানো যে শত্রু-সৈন্য প্রায় অন্ধ হয়ে পালিয়ে গেল।

ব্যাপারটা কি দিব্যদর্শনের আদি শক্তির একটা প্রমাণ ? খৃস্টের রক্তের এমনই শক্তি যে গোটা মুসলমান বাহিনীকে ঘুরিয়ে দিলো, এমন কি 'আল্লা হো আকবর' রণহুঙ্কারকেও দিলো তুচ্ছ করে ! না, দিব্যদর্শন সব ক্ষেত্রে শান্তির বাণী বহন করে না। প্রয়োজনে সে ত্রাসও সঞ্চার করতে পারে।

স্পেনে গেলে দারোকার সেই বেদীর আবরণ আজো দেখা যাবে। আজো তাতে ছ'টা লাল দাগ লেগে আছে (৪)।

*   *   *

চতুর্দশ শতাব্দীর কোন সময়ে, ঠিক দিনটি জানা নেই, ফ্রান্সের উত্তর-আলসাসের ত্রোয়া-এপিসের কাছে ফসল কাটতে গিয়ে এক চাষা কাস্তে দিয়ে নিজের দেহেই মরণ আঘাত দিয়ে বসলো। তার সেই দুঃখজনক মৃত্যুর স্মরণে স্থানীয় চাষারা ঘটনাস্থলের কাছে একটা ওক গাছে একটা ক্রুশ বসিয়ে জায়গাটার নাম দিলো 'আ লোম্ মর্'। ১৪৯১ সালের ৩রা মে, সেখানকার কামার দিয়েতের সোয়েরে ঘোড়ায় চেপে সেই ওক গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় এক শুভ্রবসনা রমণী তার সামনে আবির্ভূতা হলেন, মাথায় তাঁর অবগুণ্ঠন, এক হাতে একটি তুষার-যষ্টি, আর হাতে তিনটি শস্যমঞ্জরী। বিস্ময়-বিমূঢ় কর্মকারকে তিনি বললেন, স্থানীয় লোকেরা পাপ এবং অপকর্মে লিপ্ত। তারা যদি অনুতপ্ত না হয়, প্রায়শ্চিত্ত না করে তারা, তাহলে রোগ, অতিবৃষ্টি এবং তুষারপাত ঘটাবেন তিনি তাদের শাস্তিস্বরূপ। তারপর বললেন, 'কিন্তু আমার দক্ষিণ হস্তে ধৃত এই শস্যমঞ্জরী আশীর্বাদ এবং সুফসলের প্রতীক এবং আমারই মধ্যস্থতায় তোমরা পেতে পারো ভালো ফসল এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ'।

কর্মকার তাগড়া জোয়ান লোক। মগজে তার ধোঁয়ার লেশমাত্র নেই। ওই অলৌকিক ব্যাপারে সে বিশেষ মাথা ঘামালো না। নিএদেরমর্শ্‌ভাইহের গ্রামের একটি মানুষের কাছেও বললে না, কী দেখেছে সে। কিন্তু ঘটনা ঠিকই ঘটলো। বাজারে এক বস্তা মাল কিনেছে, কিন্তু কয়েকজন তাগড়া জোয়ান লোক দিয়েও সে বস্তা ঘোড়ার পিঠে তুলতে পারলো না, যত টানা-হেঁচড়া করে, বস্তা যেন ততই ভারী হয়ে ওঠে। বাছাধন তখন বুঝলেন, ঈশ্বরের শক্তির মহিমা কাকে বলে। মাথা নত করে হাটের সমস্ত মানুষের কাছে ব্যক্ত করলো, অলৌকিক সেই দর্শনের কথা। পাদ্রীরা ব্যাপারটা বুঝলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসী যারা, ভক্তিমান যারা, তাদের ডেকে মিছিল করে চললেন সেই সেখানে, যেখানকার নাম হয়েছে 'আ লোম্‌ মর্‌'। রহস্যময়ী সেই রমণী ভালো করেই চেনেন তাঁর ভক্তদের। ভালো ফসলের লোভ চাষাদের যে দেখাবে সেই তাদের মন জয় করতে পারবে।

ত্রোয়া-এপিস আলসাসের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র (৫)।

* * *

মহাযাজক টমাস ফন ভিলানোভা বাল্যে কট্টর ইহুদি ছিলেন। ১৫৫৪ সালে একদিন বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটলো। মনে হল, আকাশের এক জায়গা থেকে একটা পর্দা সরে গেল আর দেখা গেল, সেখানে রয়েছে সোনার একটা থালার ওপরে তুষার শুভ্র একখানি 'পবিত্র রুটি'। আবার একদিন ঠিক অমনিভাবেই আকাশের পর্দা সরে গেল আর দেখা গেল সেখানে যিশু দাঁড়িয়ে রয়েছেন। টমাস তখনও ইহুদি এবং তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে অমন দৃশ্য দেখার অর্থ, মৃত্যু সন্নিকট। তারপর বড় হয়েছেন ক্যাথলিক পাদ্রীর কাছে বাল্যের ওই ঘটনার কথা বলেছেন এবং খৃস্টান ধর্মও গ্রহণ করেছেন, কিন্তু মৃত্যু ঘটেনি!

* * *

চিলির কনসেপসিয়নের মঠ ত্রিত্ববাদীদের আস্তানা। মা মেরীর একটা পূর্ণাবয়ব মূর্তি আছে সেখানে, সেডার কাঠের তৈরী, সোনালি রং করা। হাত দুটো প্রার্থনার ভঙ্গিতে জোড় করা নয়, মনে হয় যেন কিছু ছুঁড়ছেন। কারণ এর একটা আছে।

১৬০০ সালে ইণ্ডীয়রা যখন কনসেপসিয়ন শহর আর যে-গির্জেয় তখন ওই মূর্তি ছিল, সেই গির্জে আক্রমণ করে, তখন নাকি ওই মূর্তি রহস্যময়ভাবে গির্জে ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে একটা গাছের ওপর উঠে মারমুখী ইণ্ডীয়দের সামনে দেখা দেন এবং মাটি নিয়ে ছুঁড়তে থাকেন আক্রমণকারীদের ওপর। ঘটনার বিবরণ থেকে ব্যাপারটা বিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। সেই দারুমূর্তিকে অমনভাবে কাদা ছুঁড়তে দেখে আচ্ছা-সে-আচ্ছা বীর ইণ্ডীয় পালাতে সুরু করেছিল। আজ আমরা বলতে পারবো না, ব্যাপারটা সত্যি, না একটা চমৎকার কিম্বদন্তী, তবে একথা সত্যি যে কনসেপসিয়নের মাটি-ছোঁড়া ভঙ্গির মূর্তি আজো মানুষের অন্তরের পূজো পান (৬)।

একটা কথা মনে রাখবার মতন যে দিব্যদর্শন সব সময়ে 'বায়বীয়' নয়। দর্শনদাতার যদি মন হয়, তাহলে তাঁর ভক্তদের মিইয়ে-যাওয়া ভক্তিকে চাঙ্গা করে তুলতে কাদাও ছুঁড়তে পারেন! কার্যই কারণের সমর্থক।

* * *

কিংবদন্তী বলে, ১৭১২ সালের ৩রা ডিসেম্বর ফরাসী জুরার বেজানসন শহরে একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছিল।. সে দিব্যদশনের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন মাগোফোলিস ১৮৬০ সালে ভাইমার থেকে প্রকাশিত তাঁর Neue Galerie des Übernatürlichen, Wunderbaren und Geheimnisvollen গ্রন্থে।

সকাল প্রায় ৯টা, আকাশ মেঘমুক্ত নির্মল, সূর্যের আলোয় পৃথিবী

আলোকময়, হঠাৎ দেখা গেল মাটি থেকে ৪০।৫০ গজ ওপরে আকাশে একটা মানুষের মূর্তি ভাসছে। সে মূর্তি তিনবার চেঁচিয়ে বললে, 'হে মনুষ্যগণ শ্রবণ কর, তোমাদিগের রীতি সংশোধন কর, নতুবা তোমাদিগের কাল আসন্ন জানিবে'। সে দিনটা হাটবার, মাগোফোলিস বলেছেন, 'দশ হাজারেরও বেশী মানুষের সামনে ঘটেছিল সেই অলৌকিক ঘটনা'। ভয়ঙ্কর সেই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে মূর্তি অন্তর্ধান করলো মেঘের অন্তরালে, আর মেঘটাকে দেখে মনে হল, সে যেন সোজা স্বর্গে উঠে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক পরে চারদিক এমন আঁধার করে এলো যে আশেপাশে বিশ মাইল পর্যন্ত আলোর লেশমাত্র ছিল না, এমন সূচীভেদ্য অন্ধকার। তার পরেরটুকু মাগোফোলিসের কথাতেই বলি,—

'মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। অনেকে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। নগরবাসিগণ করুণ প্রার্থনায় সমবেত হইয়া ঈশ্বরের করুণাভিক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে, তিনদিন পরে পুনরায় আকাশ পরিষ্কৃত হইল বটে কিন্তু এক প্রচণ্ড বঞ্ঝা ছুটিয়া আসিল এবং দেড় ঘণ্টাকাল তাহার দাপট প্রকাশ করিল। সে প্রকার ঝড় জীবিত মানুষের স্মরণকালে আর হয় নাই। তাহার পর নামিল মুষলধার বৃষ্টি, মনে হইল যেন আকাশ হইতে কেহ বিশাল বিশাল জালা উপুড় করিয়া দিল। তাহার সহিত যোগ দিল ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। সমগ্র শহর ধ্বংস হইয়া গেল। সাত ক্রোশ দীর্ঘ, তিন ক্রোশ প্রশস্ত নগরের মধ্যস্থলে একটি মাত্র মন্দির এবং তিনটি মাত্র গৃহ অটুট রহিল। গোলাকার একটি পাহাড়ের উপরে আজিও তাহাদিগকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়। ভগ্ন নগর-প্রাকারের কিয়দংশ এব দুর্গ-মিনার শীর্ষে আন্দোলিত পতাকাও দৃষ্টিগোচর হয় পার্শ্ব কোয়েৎস্ গ্রাম হইতে। কেহ তাহাদের সমীপস্থ হইতে পারে না। কেহ বলিতেও পারে না, কী তাহার অর্থ। তাহাদিগের প্রতি

দৃষ্টিপাত করিলে আজিও রোম হর্ষিত হয়, কারণ সে সমস্তই যে এক অলৌকিক, ভয়ঙ্কর ঘটনার পরিণাম।'

স্বর্গের সেই অজ্ঞাত পুরুষটি বেজানসনে আবির্ভূত হয়ে এক ভীষণ অঘটন ঘটিয়ে গেছে। সে যে নিঃসন্দেহে খৃস্টানধর্মজাত, সে কথা তার উক্তিতেই প্রকাশ (তোমাদিগের রীতি সংশোধন কর, নতুবা তোমাদিগের কাল আসন্ন জানিবে)। ভগবানের মারের কথাও মনে রাখতে হবে বৈকি, তার জন্যেই তো মাঝে-মধ্যে অমন বিভূতির প্রকাশ ঘটে। বেজানসন নিশ্চয় আশ-পাশের গ্রাম-গঞ্জের কাছে দৃষ্টান্তস্থল হয়ে থাকবে।

*　　　*　　　*

মানুষের বুদ্ধির কথা যেদিন থেকে শোনা গেছে, সেদিন থেকেই অলৌকিক দর্শন এবং ঘটনার প্রকাশ দেখা গেছে সর্ব ধর্মে, সব সভ্য মানুষের সমাজে। সে অলৌকিক আজো ঘটে চলেছে, ঘটবেও চিরকাল।

খৃস্টীয় প্রতীচ্যের মানুষ আমি, লালিত হয়েছি ক্যাথলিক ধর্মের মুক্তি-মোক্ষ-মতবাদের আওতায়। আমি জানি, আমার এ-লেখা পড়বে প্রধানতঃ প্রতীচ্যেরই মানুষ, তাই খৃস্টীয় অলৌকিক ঘটনাবলীর বিবরণই বিশেষ করে দেবো। কিন্তু এও সত্যি যে এই একই ধরনের ঘটনা এশিয়া, আমেরিকা, ভারত এবং দক্ষিণ আমেরিকাতেও ঘটেছে, এবং ঘটবে হাজারে হাজারে। কিন্তু গোটা পৃথিবীতে সঙ্ঘটিত অলৌকিক ঘটনার বিবরণ যদি লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করি (ব্যাপারটা অসম্ভব বলছি না!) তা হলে তা আর এক মহাভারত হয়ে উঠবে। যাই হোক, অলৌকিক ব্যাপার যে সর্বকালে, সর্বত্র বিদ্যমান, তার নজির-স্বরূপ এ গ্রন্থের শেষে দিব্যদর্শনের একটি তালিকা সন্নিবেশিত করেছি। তাতে শুধু ঘটনারই উল্লেখ আছে, তবে খৃস্টীয় জগতের এসব ব্যাপার যাঁদের জানা আছে, তাঁরা

বুঝবেন, অলৌকিক্ শুধু খৃস্টান অথবা শুধু ক্যাথলিকদের একচেটে নয়।

* * *

ইহুদীরা যিশুকে ত্রাতা বলে মানে না, তাই তাঁর পবিত্র পরিবার-বর্গের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক নেই। তাহলে, বাইবেলের 'পুরাতন নিয়মে' দিব্যদর্শনের এত ছড়াছড়ি কেন? দুটি দেবদূত আবির্ভূত হয়েছিলেন আব্রাহামের সামনে, লোটের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরা সোডম-গোমোর্হার ধ্বংসের আগে। আইজাকের পুত্র যাকোব তার বড় ভাই এসাউকে সামান্য পানাহারের পরিবর্তে তার জ্যেষ্ঠা-ধিকার ঠকিয়ে নিয়েছিল বলে এক দেবদূতের সঙ্গে তাকে লড়তে হয়েছিল জাবক নদীর চড়ায়। মোজেস বারেবারে দিব্যদর্শন লাভ করেছেন। তার ভেতর বিখ্যাততমটি লাভ করেছিলেন সিনাই পর্বতে। সেখানে য়াওহে (ঈশ্বর) তাঁকে লোকদের মুক্ত করার আদেশ দিয়েছিলেন, মিসরের বন্দিত্ব থেকে। গল্পটা হচ্ছে, চল্লিশ বছর ধরে ইস্রায়েলিরা একটি দিব্যবস্তুকে অনুসরণ করছিল, রাত্রে সে বস্তুকে মনে হত আগুনের একটা উজ্জ্বল স্তম্ভ, আর দিনের আলোয় দেখাতো মেঘস্তম্ভের মত (৭)। বিলিয়ামকে লোকে বলে, ঝুটো পয়গম্বর এবং বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তিনিও ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেছিলেন। আর, নেবুকাদনেজার, ইতিহাস যাঁকে এতটুকু শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি, তিনিও বেবিলনে এক ভোজ সভায় হঠাৎ দেখতে পান, দেয়ালের ওপর একটা হাত লিখে চলেছে। নিষিদ্ধ তোবিৎ পুঁথিতে (Book of Tobit) আছে, মহান দেবদূত রাফায়েল বীর তোবিয়াস এবং তাঁর ছেলেকে দর্শন দিয়েছিলেন। যিশু (মনুষ্য সন্তান) দেখা দিয়ে-ছিলেন পুণ্যবান ডেভিডকে মেঘের ওপর থেকে। বিবেচনা করুন, 'খৃস্টান' মনুষ্য সন্তানের জন্মই হয়নি তখন। ইস্রায়েল এবং যুদার রাজা জ্ঞানী সলোমনকে প্রভু অনেকবার দেখা দিয়েছেন। এ কথা

জানা যায় তাঁরই লেখা থেকে। আর একটা কথাও ভুললে চলবে না, অলৌকিক ঘটনা স্বর্গেও ঘটেছে। ঈশ্বর নিজে এবং দেবদূতদের অনেকে আমাদের আদি জনক-জননী, অবাধ্য আদম এবং ইভকে দর্শন দিয়েছেন (৮)।

বাইবেলে বর্ণিত দিব্যদর্শনের এ তালিকা সম্পূর্ণ তো নয়ই, ক্ষুদ্রতম তালিকাটিও হবে এর চেয়ে অনেক অনেক বড়।

*　　　*　　　*

কিম্বদন্তী বলে, রোম পত্তন করেছিলেন মঙ্গলের পুত্র রমুলাস এবং রীমাস। সদ্যোজাত শিশু দুটিকে স্তন্যদান করেছিল একটি স্ত্রী-নেকড়ে এবং লালন করেছিল রাখাল ফাউস্তুলুস। রমুলাস রোমে রাজত্ব করেছিলেন ৭৫৩ থেকে ৭১৫ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। শোনা যায়, ভলকান পুত্র সার্বিয়ুস তুল্লিয়ুস তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, 'মস্তকোপরি উজ্জ্বল অগ্নিশিখা পরিবৃত হইয়া' (৯)। চতুর্থ খৃস্টপূর্বাব্দের ঐতিহাসিক, হেরোদোতাস বহু-দেশ-ঘোরা মানুষ। পারস্য যুদ্ধের ইতিহাস তাঁর সুমহান কার্যাবলীর একটা। তিনি লিখেছেন, পারসিক সৈন্যেরা দেল্‌ফির আথেনা প্রোনোইয়ার মন্দিরে এমন ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনলো যে পালাতে পথ পেলো না। এমন অনেক গল্প আছে, যাতে দেখা যায় মানুষজন নেই অথচ মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কী বলবেন 'অলৌকিক শব্দ'? ব্যাধি নিরাময়ের দেবতা এস্‌ক্লেপিয়সের মন্দিরে দেবতা নিজে আবির্ভূত হতেন, আরোগ্যপ্রার্থীদের সামনে প্রত্যহ। যেন আধুনিক হাসপাতালের ব্যাপার, রোজ সকালে ডাক্তার এসে রোগীদের দেখে যাচ্ছেন।

কিম্বদন্তীমতে রোমের দ্বিতীয় নৃপতি, বিখ্যাত বিধায়ক, নুমা পম্পিলিয়স, জিয়ুস এবং য়ুরোপার পুত্র ক্নোস্‌সসের রাজা মিনস এবং স্পার্তার পৌরাণিক বিধায়ক, লিকুর্গস, এঁরা সবাই তাঁদের সৃজনী প্রতিভার জন্যে দেবতাদের কাছে ঋণী। দেবতারা সশরীরে এসে

তাঁদের প্রেরণা দিতেন। ট্রয় যুদ্ধের বীর ইনিয়স সপার্শ্বচর এবং বর্ম-চর্ম-অস্ত্র-শস্ত্রসমেত আবিভূ্র্ত হয়েছিলেন তাঁর পুত্র আস্কানিয়সের সামনে তাঁর মৃত্যুর পরে। কাইয়ুস জুলিয়স সীজারের জন্ম ১৩ই জুলাই ১০০ খৃঃ পূঃ, মৃত্যু ১৫ই মার্চ ৪৪ খৃঃ পূঃ। তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি এক থেস্সালিবাসীর সামনে আবিভূ্র্ত হয়ে বলেছিলেন, তাঁর পোষ্য-পুত্র কাইয়ুস অক্তেভিয়ানুসকে জানাতে যে তার ফিলিপ্পি বিজয় আসন্ন। ঈশ্বরের দূতরূপে যিনি আবিভূ্র্ত হয়েছিলেন, ৬০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে, পারসিক ধর্মের প্রবর্তক সেই জরোথুস্ত্র তাঁর আবেস্তার অনেকাংশ পেয়েছিলেন সাক্ষাৎ দেবতার মুখনিসৃত বাণী রূপে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক এবং একমেবাদ্বিতীয় আল্লার দূত মহম্মদ (আনুমানিক ৫৭০-৬৩২ খৃস্টাব্দে) ঐশ্বরিক প্রেরণা পেয়েছিলেন ৬১০ খৃস্টাব্দ নাগাত। মক্কাতে যে দেবাদেশ তিনি প্রচার করে-ছিলেন, কোরানে যে বাণী লিখিত আছে, তার অনেকখানি পেয়েছিলেন দিব্যদর্শন মারফত।

এটা ঠিক যে ধর্মপ্রচারকেরা দৈবাদেশ ব্যতীত, দিব্যদর্শন ব্যতীত তাঁদের কার্য সুসম্পন্ন করতে পারতেন না। সেই দিব্যদর্শনকেই তাঁরা সাক্ষাৎ দৈবানুমতি বলে ধরে নিয়েছিলেন। সেই ভাবেই তাঁদের মতবাদ কার্যকরও হয়েছে, আকর্ষণীয়ও হয়েছে। দৈবাদেশ, তথা প্রত্যাদেশের কথা উচ্চারণ যদি তাঁরা নাও করতেন, তাহলেও তাঁদের মতবাদের মহত্ব মোটেই ক্ষুণ্ণ হত না, তবে, জ্যোতির্বলয়, তথা দৈবমহিমার দাম যে অনেক বেশি!

* * *

অলোকদর্শনে পবিত্র আত্মাদের দেখতে পায় সাধারণতঃ দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন নারী-পুরুষ। তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জনসাধারণকে জানাতে গিয়েই তাঁরা হয়ে পড়েন দিব্যদর্শন, তথা অলৌকিক বিভূতির প্রচারক। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাঁদের কাছে বিভূতির প্রকাশ ঘটতে

থাকে তার পর থেকেই। তারপর সে খবর পৌঁছে যায় হাওয়ায় হাওয়ায় বহুজনের কাছে, যেন অমন খবরের জন্যেই অপেক্ষা করছিল তারা।

ঠিক এমনি ব্যাপারই ঘটেছিল, পোর্তুগালের এস্ত্রেমাতুরা প্রদেশের ফাতিমা গ্রামে। ১৯১৭ সালের ১৩ই মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তিনটি রাখাল ছেলে-মেয়ের কাছে মা মেরী আবির্ভূতা হয়ে বারবার বলেছেন, তাঁর আবির্ভাব-স্থলে একটি মন্দির স্থাপন করতে। ছেলে-মেয়েরা তো হৈ হৈ করে জাহির করলো তাদের দিব্যদর্শন লাভের কথা, ফলে সতেরো সালের গ্রীষ্ম এবং শরতে পোর্তুগাল এবং পোর্তুগালের বাইরেও তারাই ছিল প্রথম পাতার খবর।

প্রথম প্রথম দৈবসংযোগ ঘটতো ওই তিনটি ছেলে-মেয়ের সঙ্গে প্রত্যেক মাসের ১৩ তারিখে, কিন্তু তারপর ফাতিমায় তীর্থযাত্রী আসতে লাগলো কাতারে কাতারে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, ১৯১৭ সালের ১৩ই অক্টোবর অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ দেখতে সেখানে অপেক্ষমান ছিল সত্তর আশি হাজার মানুষ। তবে, সে প্রতীক্ষার ফল ভালোই ফলেছিল, দিব্যদর্শন শুধু তিনটি ছেলে-মেয়ের কপালেই জোটেনি, প্রতীক্ষমান জনতার কপালও খুলেছিল।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, দিব্যদর্শনের সম্ভাবনা প্রায় নেই, হঠাৎ এক জায়গার মেঘ ভেঙে আকাশের পরিষ্কার নীলিমা ফুটে উঠলো, দেখা দিলো সূর্য, উষ্ণ-উজ্জ্বল মৃদু আলো নিয়ে। 'সৌর অলৌকিকের' সূচনা তখনই হয়ে গেছে। তারপর সেদিন যা ঘটেছিল তার বিবরণ নথিভুক্ত হয়ে আছে নানা গ্রন্থে। সূর্য কাঁপতে কাঁপতে একটু একটু দুলতে লাগলো। ডাইনে-বাঁয়ে দুলতে দুলতে শেষে ঘুরতে লাগলো প্রচণ্ড জোরে, বিশাল এক চরকি-বাজির মত। সবুজ-লাল-বেগনি আলোর ঝরনা নাবতে লাগলো ঘূর্ণমান সেই সূর্য থেকে। পৃথিবীর আকাশ উথলে উঠলো এক অপার্থিব, অবাস্তব আলোয়। হাজার হাজার

মানুষ প্রাণভরে দেখলো সেই অপূর্ব দৃশ্য। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলে, কয়েক মিনিটের জন্যে সূর্য স্থির হয়ে দাঁড়ালো, যেন দর্শককে একটু হাঁফ ছাড়ার অবকাশ দিল। তারপরেই আবার শুরু হল সেই উদ্ভট ঘূর্ণন আর নানা আলোর ফুলঝুরি। যারা দেখেছে, তারা বলেছে সে দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আবার একটু থেমে তৃতীয় দফায় শুরু হল, সূর্য-নৃত্যের সঙ্গে আলোর ফুলকির বিচিত্র ঝরনা। সেদিনকার সেই সৌর-অলৌকিক চলেছিল বারো মিনিট ধরে আর, তা দেখা গিয়েছিল পঁচিশ মাইল জায়গা জুড়ে।

গোড়ার দিকে 'সরকারী' আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ফাতিমা পরিণত হয়েছে তীর্থক্ষেত্রে। ফাতিমা পৃথিবীর সুবিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রসমূহের একটি। দিব্যদর্শনের প্রথম এবং শেষ দিন, ১৩ই মে এবং ১৭ই অক্টোবর, ফাতিমা বহু প্রত্যাশার পুণ্যক্ষেত্র। হাজার হাজার মানুষ সেদিন একটা দিব্যদর্শন, একটা অলৌকিক ঘটনার প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকে, কিন্তু প্রতীক্ষমাণ জনতার বেশির ভাগ আশা করে, আবার সেই সৌর-অলৌকিকের আবির্ভাব হবে।

* * *

দিব্যদর্শনের ইতিহাস ঘাঁটলে একশোটার ভেতর নব্বইটা ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের আনাগোনা চলে ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে।

এ থেকে কি বলা যায় যে, যৌবনারম্ভে বা তার কিছু পূর্বে ছেলে-মেয়েদের গুরুমস্তিষ্কে কোন বিশেষ চিন্তা প্রবাহের সৃষ্টি হয়, যাতে চেতনার (অথবা অবচেতনার) আর এক জগতে তাদের প্রবেশাধিকার ঘটে? না কি, সহজাত কৌতূহলের সঙ্গে কচি-মনের বেবল্পা কল্পনা মিশে নক্ষত্রজগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়?

আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে, প্রথমে একটি শিশুর মস্তিষ্কেই কোন দিব্যদর্শন প্রক্ষিপ্ত হয় ছবির মতন, তারপর সে-মস্তিষ্ক সমবয়স্ক

অন্য মস্তিষ্কে সে-ছবি নিক্ষেপ করে চেতনা-সংবহন (telepathy) মারফত? দূরানুভূতির (অথবা চেতনা-সংবহনের) ব্যাপারটা তো আজ আর বিজ্ঞান-বিরোধী নয়। দিব্যদর্শনের আলোকচিত্রণ সম্ভব নয়, অথবা অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যেও তার বাস্তব রূপ ধরে রাখা যায় না সত্যি, কিন্তু মস্তিষ্কের আদিম কোষজালের অন্তর্গত 'ইন্দ্রিয়-তন্ত্রে' যে সে ছবি 'মনসা' নিক্ষিপ্ত হয়, তাতে কি সন্দেহ আছে?

'বাইরের' কারুর দ্বারা দিব্যদর্শনকে যদি বস্তুগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে বাণী, প্রত্যাদেশ, অভিলাষ, বাস্তব নির্দেশ এবং সর্বোপরি মূর্তির অভিক্ষেপ আসে কোথা থেকে?

একটি অপরিচিত রমণী 'রহস্য গোলাপ' নামে অভিহিত হতে চাইছে, এমন উদ্ভট কল্পনা একটা শিশুর মাথায় আসবে কেমন করে? শিশুরাই কি শুধু মনন-বিন্যস্ত অথবা মনন-সম্ভব অলৌকিকে অধিকারী? মানসিকভাবে গ্রাহী মন কি একা তাদেরই আছে? আমার তা মনে হয় না। যে ছেলেরা দিব্যদর্শন লাভ করে, তারা সবাই তাদের বয়সী অন্যান্য সব ছেলেমেয়েদের মতই দেহে-মনে সুস্থ-সবল। অতএব ছেলেমেয়েদের দেখা, আমাদের কালের ছেলেমেয়েদের দেখা দিব্যদর্শনের ব্যাপারে একটু অনুসন্ধান করা যাক।

* * *

আমার এ দিব্যদর্শন 'যাত্রায়' জুড়িগানের মত বেছে নিয়েছি বিশেষ একটি ঘটনাকে। আমার বিশ্বাস, তাতে তিনটে প্রশ্নের জবাব মিলবে। খুলেই বলি।

পুরাতন কাস্তিলিয়ের স্পেনীয় শহর সান্তান্দের থেকে বাষট্টি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে সান সেবাস্তিয়ান দ্য কারাবান্দাল, ছোট্ট করে, শুধু কারাবান্দাল। সেটা একটা ছোট্ট গ্রাম।

আবির্ভাব

সরু সরু পাথর বাঁধানো রাস্তা, সর্বসাকুল্যে বড় জোর চল্লিশ ঘর লোকের বাস।

১৯৬১ সালের ১৮ই জুন, রবিবার, বেলা সাড়ে চারটে। গোটা চারেক মেয়ে বাজারে খেলায় মত্ত। দুজনের নাম কনচিত্তা আর হাসিন্তা, দুজনেরই বয়স বারো। তৃতীয় জন মারী ক্রুথ, বয়স এগারো। তিন জনেরই পদবী গনথালেথ, তবে কেউ কারুর আত্মীয় নয়। স্পেনে গনথালেথ নামটা অন্য দেশের স্মিথ, দুপোঁ, মুয়েলারের মত একটা সাধারণ পদবী। চতুর্থ মেয়েটির নাম মারী লোলি মাথোন, বয়স বারো। তাদের মাথায় মতলব, মাস্টারমশায়ের বাগান থেকে আপেল চুরি করতে হবে।

রাত আটটা নাগাত চার বন্ধু মিলে গ্রামে ফিরছে, সঙ্গে কোঁচড় ভর্তি আপেল আর অপরাধী মন। আর হ্যাঁ, যে পাথুরে পথ দিয়ে তারা ফিরছে, তার নাম কালিয়েহা। মনের অশান্তি তাড়াবার ইচ্ছেতেই বোধ হয় তারা রাস্তা থেকে ইট কুড়িয়ে বাঁদিক পানে ছুঁড়তে লাগলো, উদ্দেশ্য, তাদের মনের ভূতটাকে তাড়ানো (১১)।

হঠাৎ কনচিত্তা দাঁড়িয়ে পড়ে আকাশপানে দেখতে লাগলো। তারপর বন্ধুদের বললে, আকাশে সে 'একটা মূর্তি দেখতে পাচ্ছে, ভারী সুন্দর দেখতে, চারদিকে তার আলোয় আলো'। বন্ধুরা ভাবলে, এ বুঝি আবার একটা নতুন খেলা, কিন্তু কনচিত্তা না-ছোড়, বলে, 'না রে না, দেখ না, ওই তো ওখানে'!

মেয়েরা আকাশপানে মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠলো, 'দেবদূত'! মুখে আর তাদের রা সরে না। বোবা মূর্তির মতন তারা আকাশে চেয়ে রইলো, আকাশে ভাসমান মূর্তির মতই তারা নির্বাক, নিস্পন্দ। তারপর যেমন হঠাৎ দেখা দিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ মিলিয়ে গেল সে-মূর্তি আকাশে।

এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে মেয়েরা তো সে গপ্পোয় পঞ্চমুখ। সঙ্গে

সঙ্গে সে-গপ্পো হাওয়ায় সওয়ার, সারা গাঁ গমগম করে উঠলো গপ্পের মৌতাতে।

সবার মুখেই এক কথা, চারটে সুস্থ, সবল বুদ্ধিমতী মেয়ে কি এক সঙ্গে একই মুখ দেখেছে ? অকারণে শুধু শুধু মিথ্যেই বা বলবে কেন ? ঘটনার বিবরণ তো চারজনের মুখেই একই রকম। আপেল চুরি ধরা পড়লে এমন কিছু বড় শাস্তি হত না, যে তা ঢাকবার জন্যে অমন একটা কথা বানিয়ে বলবে ? একবার যে কথা বলেছে, সেই কথাই তো বারেবারে বলছে, নির্ভুল বলছে। অনেক পরেও তাদের বর্ণনা বিকৃত হয়নি এতটুকু। লোকের মনে সন্দেহ জেগেছে বৈকি।

বাচ্চাদের স্বভাব সব জিনিস ঝালিয়ে নেওয়া। পরের দিন মেয়েরা আবার গেছে কালিয়েহায়, আঙুলে শক্ত করে মালা জড়িয়ে। 'দেবদূত' কিন্তু দেখা দেননি।

২০শে জুন আবার তারা গেছে, সঙ্গ নিয়েছে গ্রামের কিছু কৌতূহলী মানুষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে আশায় আশায়, কিন্তু বৃথা। সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে যখন ফিরে আসছে সবাই, তখন হঠাৎ আকাশে ভেসে উঠলো এক 'দিব্য জ্যোতি'। কিন্তু মেয়ে চারটে ছাড়া আর কেউ দেখতে পেলো না কিচ্ছু।

তার পরের দিন কালিয়েহায় আরো অনেক লোক সঙ্গী হয়েছে। 'দেবদূত' সেদিন নিজে থেকেই দেখা দিয়েছেন। সঙ্গীরা সেদিনও কিছু দেখতে পায়নি। তবে, তাদের কয়েকজন মেয়েদের মুখভাব পরিবর্তনের ছবি তুলে নিয়েছিল।

ঠাট্টা বন্ধ হল। লোকের মনে একটা ভীতির সঞ্চার ঘটলো, অতিপ্রাকৃত এবং অচিন্তনীয় সম্পর্কে। 'মেয়েদের' আবার দর্শন দিলেন পর পর চারদিন, ২২শে, ২৩শে, ২৪শে এবং ২৫শে জুন এবং সেই একই স্থানে। মেয়েরা বলেছিল, একই 'দেবদূত' বারেবারে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু কথা বলেননি।

১লা জুলাই সঙ্গী হল রোমাঞ্চ-সন্ধানীর এক বিরাট দল। মূর্তি সেদিন শুধু দেখা দিয়েই চলে গেলেন না, পুরো দুঘণ্টা রইলেন। এদিনও দর্শন সীমাবদ্ধ রইলো মেয়ে চারটির চোখে। কিন্তু সঙ্গে যারা গিয়েছিল, মূর্তির সঙ্গে তারা মেয়েদের আলাপচারী শুনতে পেয়েছিল। ঠিকমত বলতে গেলে, মেয়েদের মুখের প্রশ্নোত্তরই তারা শুনতে পেয়েছিল, মূর্তির কণ্ঠস্বর তাদের কানে পশেনি। এই প্রথম সে-দেবদূত কথা বললেন। বললেন, তিনিই মহান দেবদূত মাইকেল। সঙ্গীরা একবাক্যে স্বীকার মেনেছে, আলাপচারীর সময়ে মেয়েদের মুখে এক অদ্ভুত, অপ্রাকৃত ভাব ফুটে উঠেছিল। পুরো দুঘণ্টা তারা বসেছিল হাঁটুগেড়ে, পেছনে ঘাড় হেলিয়ে যেন নিশ্চল পাথর হয়ে গিয়েছিল তারা।

২রা জুলাই ছিল রবিবার। সেদিন গোটা কারাবান্দাল সেখানে ভেঙে পড়েছিল। এমনকি আশপাশের গাঁ-গঞ্জ থেকেও কাতারে কাতারে মানুষের মিছিল ভিড় করেছিল সে-দর্শনস্থলে। গির্জেয় সেদিন বেলা তিনটে থেকে চললো স্তোত্রপাঠ। সন্ধ্যে ছটা নাগাত মেয়েদের সামনে রেখে বিরাট মিছিল এগিয়ে চললো দর্শনস্থলের দিকে। ডাক্তার এবং পুরোহিতেরাও সে-মিছিলে শামিল। দশন-স্থলে চারটে খুঁটি পুঁতে দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল, যাতে 'মেয়েরা' পদদলিত হয়ে মারা না পড়ে।

অলৌকিক আবার ঘটলো।

মেয়েরা চারজন সবে তাদের ঘেরা গণ্ডিতে পৌঁছেছে, এমন সময় মা মেরী দেখা দিলেন, দুপাশে দুই দেবদূত সঙ্গে নিয়ে। দূতদের একজন মেয়েদের পরিচিত মাইকেল, অপরজন সম্পর্কে মেয়েরা বললে, তিনি মাইকেলের যমজ ভাই হতে পারেন। সেদিনের দর্শন সম্পর্কে তারা আলাদা আলাদাভাবে যা বলেছে, তা একই ছবির বর্ণনা। সকলকার ব্যক্তিগত বর্ণনাই এক।

মা মেরীর যে বর্ণনা তারা দিয়েছে, অন্যান্য বর্ণনার সঙ্গে তফাত নেই বললেই হয়। মাথায় তাঁর ঘন পিঙ্গল দীর্ঘ কেশ, সিঁথিতে দ্বিধা-বিভক্ত, মুখ ঈষৎ লম্বা, তিলফুলজিনি নাসা, কোমল অধর পল্লব, তুষারশুভ্র পরিধেয়, উর্ধাঙ্গে নীলাভ উত্তরীয় এবং মস্তকে তারকাখচিত স্বর্ণময় মুকুট। বয়স যেন সতেরো-আঠারো। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও মেয়েরা দেখেছে স্থানপরিবর্তনকালে তাঁর পদযুগল ব্যবহৃত হয় না—হাওয়ায় ভেসে যান তিনি। মায়ের দক্ষিণে মেয়েরা দেখলো একটা 'কম্পমান রক্তাভ ছায়া', তার ভেতর থেকে ফুটে উঠলো একটা ত্রিভুজ, কিছু যেন লেখা তার ভেতরে, কী তা জানে না তারা। দেবদূতদের পরনে নীল, মসৃণ পরিচ্ছদ। তাদেরও মুখ লম্বাটে, চোখ কাজল-কালো। তাদের হাতের নখ ছোট করে কাটা,—এত নিখুঁত করেও মেয়েরা দেখেছে!—আর তাদের পিঠ থেকে বেরিয়েছে রক্তাভ বিশাল ডানা।

গ্রামের পাদ্রী ডন ভালেন্তিন মেয়েদের আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করলেন। প্রত্যেকের বর্ণনা বর্ণে বর্ণে এক।

ফাদার রামন আন্দ্রেউ সে দিব্যদর্শনের একটি প্রতিবেদন পাঠালেন ২রা জুলাই সান্তান্দেরের বিশপ, আন্দাথালের কাছে। নিচে তার এক অংশের আক্ষরিক উদ্ধৃতি দিলুম,—

> মেয়েগুলির কোন প্রকার বাহ্যিক জ্ঞান ছিল না। দেহে তাহাদের তীব্র যন্ত্রণাদায়ক কাটা, পোড়া অথবা আঘাতের কোন অনুভূতি ছিল না। বাহ্যিক জগতের কোন কিছুই তাহাদের দেহেমনে কোন সাড়া জাগাইতে সক্ষম ছিল না। তাহাদের চক্ষের সম্মুখে হঠাৎ এক ঝলক আলোক অথবা অন্য কিছু ধরিয়া দেখা গিয়াছে, সে-আলোক ইত্যাদির কোন প্রভাব তাহাদিগের উপরে নাই। তাহাদিগের চক্ষু সম্পূর্ণ স্পন্দনহীন, নিমেষহীন ছিল (১২)।

২৭শে জুলাই তুবার দর্শন পাওয়া গেল। ভোরবেলা দেবদূত দর্শন দিয়ে বললেন, রাত ঠিক আটটায় আবার আসবেন। দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়লো সে খবর সর্বত্র। সরকারী হিসেবে ছ'শোরও বেশি লোক জমায়েত হয়েছিল সে রাত্রে। জনতার ভেতর ডাক্তার এবং পাদ্রীরা তো ছিলেনই, একটি 'গুপ্তচরও' ছিলেন, তিনি কর্দোবার শ্রমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দমিনিক সম্প্রদায়ের এক পাদ্রী।

মহান দেবদূত মাইকেল ঠিক সময়ে এলেন, রইলেনও পঁচাশি মিনিট। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে, মেয়েদের দেহ এমন শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে দুটো লোক প্রাণপণশক্তি প্রয়োগ করে অমন ছোট্ট ছোট্ট দেহ তুলতে সমর্থ হয়েছিল কোনক্রমে, কিন্তু তাদের মাথা কিম্বা হাত কোনভাবেই নড়ানো যায়নি।

অবিশ্বাসী নাস্তিকও সে দলে ছিল। থাকাটাই তো স্বাভাবিক। গির্জেও বাক্‌সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন। কেউ বললে সম্মোহ, কেউ বললে অলীক বিশ্বাস, কেউ বা বললে, সাজানো ব্যাপার, মিথ্যা—প্রতারণা, আবার কেউ তারও ওপরে গেছে, বলেছে অজ পাড়াগাঁয়ে এটা একটা টাকা রোজগারের কল।

মেয়েগুলোর ভেতর কন্‌চিত্তার ব্যক্তিত্বই সবচেয়ে বেশি। তাই মনে হয়, সে-ই তার বন্ধুদের প্রভাবিত করেছিল চেতনা-সংবহন মারফত। তাকে প্রভাবমুক্ত করতে নিয়ে যাওয়া হল সান্তান্দেরে, মিশতে দেওয়া হল, অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে, যাতে তাদের সঙ্গে-সমুদ্রে সাঁতরে তার পায়ের খিল ছাড়ে।

হপ্তাখানেক পরে কন্‌চিত্তার বাপ-মা নিতে এলো তাকে। এইবার শুরু হল আসল মজা! একটার পর একটা দিব্যদর্শন ঘটতে লাগলো, দিব্যদর্শনের যেন ভিড় লেগে গেল। লোকের উৎসাহ জাগলো আরো বেশি করে। মানুষের প্লাবন ছুটে এলো যেন সেই ক্ষুদ্র গ্রামে। ভিড়ের সেই ভয়াবহ চাপ অকল্পনীয়।

সরকারী অনুমানে পাঁচ হাজারেরও বেশি লোক জড়ো হয়েছিল ১৮ই অক্টোবর।

বছরের ওই সময়কার পক্ষে সেদিনকার আবহাওয়া মোটেই উপযুক্ত নয়। কোন পূর্বাভাষ ছাড়াই শুরু হল তুমুল ঝড় আর তুমুলতর শিলাবৃষ্টি। যে মাঠে তারা দাঁড়িয়েছিল, দেখতে দেখতে সে মাঠ হয়ে উঠলো মজা পুকুরের মত। তবু তারা দাঁড়িয়ে রইলো পাঁকে পা ড়ুবিয়ে, কিন্তু সব বৃথা, আকাশ খুললো না।

রাত আটটা নাগাত মেয়েদের হাতে লেখা একটি বাণী—যেন মায়েরই বাণী—পাঠ করে শোনানো হল। তাতে বলা হয়েছে, নৈবেদ্য নিয়ে এসো, প্রায়শ্চিত্ত কর, না হলে—সব বাণীতেই যেমন বলা হয়—মানুষকে শাস্তি পেতে হবে।

কারাবান্দালে আরো যত অলৌকিক ঘটেছে, তা সবের বিবরণ দেবো না, তার জন্যে অনেক বইপত্তোর আছে (১৩)।

*　　*　　*

সে-মেয়েদের শেষ পর্যন্ত কী হল, নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করবে। জীবনের সেরা তীর্থ সেরে আসার পর, অর্থাৎ পোপের সঙ্গে দেখা করার পর কন্‌চিত্তা গাঁয়ে ফিরে এলো। তার অল্পদিন পরেই চলে গেল পাম্‌প্লোনায়, ভর্তি হল 'সোপানং কার্মেলীয় সন্ন্যাসী' সম্প্রদায়ে। মারী লোলি আর হাসিন্তাও চলে গেল সারাগোস্‌সার এক সন্ন্যাসিনী মঠে। শুধু মারী ক্রুথ রয়ে গেলে বাপ-মায়ের কাছে।

কারাবান্দালের সেই চমকপ্রদ ঘটনাবলীর ইতিবৃত্তের ভেতর তিনটে বিশেষ ব্যাপার আমার চোখে পড়ে।

১। মহান দেবদূত মাইকেলের দর্শন দান। বাষট্টি সালের ১৩ই জুলাই রাত প্রায় ছুটোর সময় মাইকেল দেখা দেন কন্‌চিত্তার ঘরে। সে রাতে ওঘরে বাড়ির আরো কজন ছিল। ইতিবৃত্ত বলে, মেয়েটি হঠাৎ দুদ্দাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে

নেবে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলো জ্ঞানশূন্য হয়ে। সারা মুখ তার অপূর্ব এক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। ছুটতে ছুটতে এক সময়ে পড়ে গেল সে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতের ভঙ্গিতে। পাথরের মূর্তির মত পড়ে রইলো সে, জিব বেরিয়ে পড়েছে অনেকখানি। সে-রাত্রের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলে, কন্‌চিত্তার জিবের ওপর হঠাৎ দেখা গেল, বেশ পুরু, তুষার-শুভ্র একখানা 'পবিত্র রুটি'। প্রায় দুমিনিট ধরে দেখা গিয়েছিল সে রুটি, তারপর সে তা গিলে ফেলেছিল।

জিবের ওপরকার সে-রুটির বাস্তব রূপের একটা ফিল্‌ম্‌ও তুলে-ছিল একজন দর্শক। প্রায় চল্লিশখানা ফিল্‌মে সত্যিই একটা গোল সাদা মতন 'বস্তুর' ছবি উঠেছে, দেখতে প্রায় পবিত্র রুটিরই মত। প্রত্যক্ষদর্শীরা দিব্বি গেলে বলেছে, কন্‌চিত্তার হাত নড়েনি, তা দিয়ে জিব স্পর্শ করার কথা দূরস্থান। সেই 'প্রসাদ-প্রাপ্তির' কালে জিবকে সে মুখের ভেতর কিম্বা দাঁতের ফাঁকে নিয়ে যায়নি। তাছাড়া, অমন একটা ধপধপে সাদা জিনিস যে সে মুখের ভেতর লুকিয়ে রাখবে, তা ভাবাও যায় না। প্রসঙ্গতঃ বলি, শ্রী দামিনাসের তোলা এবং বার্থেলোনায় 'ধোওয়া' সে-ফিল্‌মে আমি দেখেছি সেই অলৌকিক রুটির ছবি। সময়টা ছিল গভীর রাত্রি, আলো বলতে দু'একটা পকেট-টর্চের আলো ছাড়া আর কোন আলো ছিল না। সে-আলোয় ছবি তোলাই তো অলৌকিক ব্যাপার!

২। ১৯৬৫ সালের ১৩ই নভেম্বর, শেষ দর্শনের দিনে মেয়েটি পোপের জন্যে এক বাণী পেয়েছিল 'মায়ের' কাছ থেকে। ছেষট্টি সালের জানুয়ারী মাসে সত্যিই সে রোমে গেল। সেখানে ঝাড়া দু'ঘণ্টা সে জর্জরিত হয়েছে, প্রথমে ধর্মের অধিকর্তাদের এবং পরে পোপের প্রশ্নবাণে। (রোম থেকে

সে গিয়েছিল সান গিওভান্নি রোটোণ্ডায় অলৌকিক-কর্মা ফাদার পিও'র সঙ্গে দেখা করতে।)

৩। কারাবান্দালের ঘটনানিচয়ের ভেতর সবচেয়ে অদ্ভুত, সব চেয়ে অসমঞ্জস হচ্ছে মারী ক্রুথের ব্যাপার, যার কথায় বলেছি, সে ফিরে গিয়েছিল বাপ-মায়ের কাছে, ঘর-কন্নার কাজে। সে হঠাৎ বলে বসলো, দিব্যদর্শন-টর্শন কিছু সে দেখেনি।

তার এ-অস্বীকৃতির কারণ কী?

সাতষট্টি সালের ১৭ই মার্চ, লুসার্নে থেকে প্রকাশিত 'ফাতেরলান্দ' পত্রিকায় 'কারাবান্দালে দিব্যদর্শনের কোন ঘটনা ঘটেনি' শীর্ষক খবরে পড়লুম,—

> ১৭ই মার্চ ১৯৬৭ সালের একটি 'সরকারী' বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, সান্তান্দেরের পাদ্রী, পুচোল মোন্তিস তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। (১) মা মেরী অথবা দেবদূত মাইকেল, অথবা অন্য কোন দেবদূতের একজনেরও কোন দর্শনলাভ ঘটে নাই। (২) কোন বাণীও তাঁহাদের নিকট হইতে আসে নাই। (৩) কারাবান্দালে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার স্বাভাবিক লৌকিক ব্যাখ্যা বর্তমান।

ব্যাপারটা হতবুদ্ধিকর।

কারাবান্দালের ঘটনাবলীর ছবি আছে, টেপ-রেকর্ডও আছে। অনুসন্ধানও চালানো হয়েছে, ওপর মহলের পাদ্রীসমাবেশে শুনানিও হয়েছে। সব পরীক্ষকই বলেছেন, প্রত্যেকটি মেয়ের বক্তব্য এক, উল্টো পাল্টা ছিল না। তাছাড়া, পোপ নিজেও তো কন্‌চিত্তার সঙ্গে কথা বলেছেন।

'ঘটনার' সংঘটন সম্পর্কে কারুর কোন মতদ্বৈধতা নেই, নেই কোন সন্দেহ। তবে, সে সবের স্বাভাবিক লৌকিক ব্যাখ্যাও পাওয়া

গেছে। কী ঘটতে দেওয়া হবে না, শুধু নয়, কী ঘটতে দেওয়া হবে, সে সম্পর্কে গির্জের যদি একটা আচরণ-বিধি থাকতো, তো ভালো হত। বিশ্বাসী যারা, তাদের কাছে এর কম কিছু হলে চলবে না।

যাই হোক, কারাবান্দালের ঘটনাসমূহকে দশ-বিশ বছরের ভেতরে যদি একটা 'প্রধান অলৌকিক ঘটনা'র মর্যাদা না দেওয়া হয় তো বিস্মিত হবার কিছু নেই।

গির্জে যথেষ্ট চালাক, অপেক্ষা করতে তার আপত্তি নেই। তেমন যদি কোনদিন ঘটে, মারী ক্রুথ বলতে পারে (লিখেও যেতে পারে তার উইলে) যে তাকে মিথ্যে বলতে হয়েছিল, স্বর্গের প্রত্যক্ষ নির্দেশে, 'ধর্মাবতারদের পরীক্ষার প্রয়োজনে'। বাকী তিনটি মেয়ে তাদের মঠে সন্ন্যাস যাপন করতে করতে প্রায় সন্ন্যাসিনী হয়ে উঠবে এবং আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটিতে তারাও হয়তো ঠিক কথাটিই উচ্চারণ করবে।

প্রসঙ্গতঃ বলি, কারাবান্দালে আগের মত এখনো ব্যাখ্যার অসাধ্য উপায়ে রোগ-নিরাময় হয়ে চলেছে।

* * *

১৫৯৪ সালের মে মাসে ইকোয়েডরের গুয়াদালুপে অঞ্চলে একবার খরা-তুর্ভিক্ষ হয়। সে অঞ্চলের ইণ্ডীয়দের ধারণা হয়, সেই তুরবস্থার জন্যে দায়ী গোটাকতক খৃস্ট ধর্মাবলম্বী ইণ্ডীয়, তাই ভয় দেখিয়ে তাদের খৃস্টধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করে তারা। তারপর তাদের প্রাচীন ইঙ্কা দেবতার পূজোপাঠ, নৃত্যগীত শুরু করতেই আবির্ভাব ঘটলো এক দেবীর। তিনি বললেন, ইঙ্কা দেবতার নয়, তাঁর পূজো করলেই খরা-তুর্ভিক্ষ দূর হবে, অন্যথায় সবংশে নির্বংশ হবে তারা। ভীত, চকিত ইণ্ডীয়রা অগত্যা তাঁরই পূজো শুরু করলো, খরা-তুর্ভিক্ষও দূর হ'ল অচিরে। আজো সে দেবীর পূজো চলছে সেখানকার মন্দিরে মন্দিরে। প্রতি বছর ১৩ই সেপ্টেম্বর 'গুয়াদালুপের' দেবীর পূজো অনুষ্ঠিত হয় ষোড়শোপচারে মহা ধুমধামে।

দিব্যদর্শনের অস্তিত্ব কি সত্যিই আছে?

*   *   *

আমার মনে হয়েছে, যে সব দিব্যদর্শনের ঘটনা ওপরতলার পাদ্রীমহল কর্তৃক পরীক্ষিত হয়েছে এবং স্বীকৃতও হয়েছে, তাদের ভেতরেও একটা অসঙ্গতি আছে। মা মেরী বারে বারে বলেছেন, হয় ঈশ্বর নিজে, না হয় তাঁর পুত্র যিশু তাঁর ওপরে ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। যদি তাঁর সে ক্ষমতা থাকে এবং তাঁর একান্ত কামনা হয় যে আরো বেশি সংখ্যায় ইহলোকের ধার্মিক মানুষ তাঁর পূজো করুক, তাহলে অমন সব প্রায়-জনহীন অঞ্চলে তিনি আবির্ভূতা হন কেন? কেনই বা শুধু ছেলেমানুষদেরই দেখা দেন? তাঁর ইচ্ছেকে ফলবতী করবার ক্ষমতা তাদের কতটুকু?

আমি কিন্তু অলৌকিক প্রত্যাদেশ ছাড়াই তাঁর ইচ্ছেকে আরো ভালো করে প্রচার করার ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারি।

বড় বড় ছুটির দিনে পোপ যখন সেণ্ট পীটারস্ স্কোয়ারে লক্ষ লক্ষ প্রতীক্ষমান মানুষের উদ্দেশে, তথা গোটা পৃথিবীর মানুষের উদ্দেশে তাঁর আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন, তখন সে-বাণী পাঁচটা মহাদেশে বহন করে নিয়ে যায় বহু বহু দূরেক্ষণ সংস্থা। যে গির্জে থেকে পোপ তাঁর আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন, সে গির্জে তৈরী হয়েছে সেণ্ট পীটারের সমাধির ওপরে। তাঁরা যদি সত্যিই স্বর্গ থেকে আসেন, তাহলে দর্শনদানের পক্ষে অথবা উপযুক্ত 'আধার' সন্ধান করার পক্ষে, তার চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথায় পাওয়া যাবে? মেরীর আন্তরিক ইচ্ছেকে রূপ দান করার পক্ষে কি সেইটেই সেরা সুযোগ নয়?

দিব্যদর্শনের ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগে না, বরং বিরক্তিকর মনে হয়। আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না, মেরী দোরে দোরে হাত পেতে বেড়াচ্ছেন, 'ওগো, তোমরা আমার পূজো কর' বলতে বলতে। তাছাড়া, এটাই বা কেমনতরো স্বর্গীয় ব্যবহার তাঁর, যে অনুষ্ঠানে ত্রুটি হলেই চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাবেন, তাঁর

সর্বশক্তিমান পুত্র মানব বংশ ধ্বংস করবেন বলে ? ঈশ্বর অথবা তাঁর পুত্রের সর্বশক্তিমানতা এবং মঙ্গলময়তার যে ধারণা আমাদের মনে গেঁথে আছে, তার সঙ্গে কি এমন ব্যবহারের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় ?

ব্যাপারটা কী হয় ? দিব্যদর্শনের সঙ্গে কি কোন গূঢ়তত্ত্বের সম্পর্ক আছে ? গূঢ়তত্ত্ব বলতে বলছি, তন্ত্রের মত কোন গুপ্ত সাধনপদ্ধতি, যার মারফৎ পূজিত ঈশ্বরের সঙ্গে ঘটে ব্যক্তিগত সান্নিধ্য। একি সেই রকম কোন কিছু ? এচ. ইউ. ফন বেলথাজার এ সম্পর্কে একটি ভালো কথা বলেছেন,—

> মানুষ যখন অপ্রাপ্য, অমূল্য, পবিত্র কিছু হঠাৎ পেয়ে যায়, তখন তা সে লুকিয়ে রাখে আপন মনের নিভৃতে, না হয়, ঠাকুরঘরের গোপন অন্ধকারে, লোকচক্ষের একান্ত অন্তরালে। তারপর, স্বাভাবিক ইতিহাসের ধারাবহির্ভূত এক কাহিনীর রহস্য অবগুণ্ঠনে ঢেকে দেয় তার পরম-প্রাপ্তিকে (১৪)।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে যা কিছু গোপন, তারই দাম লাখ টাকা। নেহাৎ জলো চিঠির ওপরেও '৭৪॥' লেখা থাকলে, পড়বার জন্যে প্রাণ আইঢাই করতো। সাধারণ, সরল মানুষও চায় 'গোপনের' আস্বাদন, গুপ্ত সম্প্রদায়ের গোপন গণ্ডির পানে কে যেন তাকে টানে, ঢুকতে চায় তার গভীরে। গুপ্তধর্ম, গুপ্তসম্প্রদায়, গুপ্তচর ইত্যাদি গূঢ় সব কিছুরই একটা অস্বাভাবিক, লোভনীয় আকর্ষণ আছে। পূত পবিত্র গোপনের উদ্ভাবন, একটা আশ্চর্য কাণ্ড বৈকি। যে 'গূঢ় রহস্যে'র কথা এবার বলছি, তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না।

* * *

প্রত্যেকটি আবির্ভাবের মূলে কারণ থাকেই। এক একটা আবির্ভাব যেন নব নব দিগ্‌দর্শনের চাবিকাঠি। যখনই কোন মানব-সমাজের সংহতি নষ্ট হয়ে যায়, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে সে সমাজ, তখনই

অন্ধকারে আলোক বর্তিকার মত আবির্ভাব ঘটে কোন দেবাত্মার (দানিকেন যেন গীতার বাণী আওড়াচ্ছেন)।

আবির্ভাবের দর্শন মেলে চিরাচরিত জানা প্রথায়। ১৯৩২ সালের ২৯শে নভেম্বর ফ্লাণ্ডার্সের নামুর অঞ্চলে এক আবির্ভাব ঘটেছিল। এগারো বছরের ছেলে আলবের, সঙ্গে আরো তিনটি ভাইবোনকে নিয়ে ইষ্টিশনের কাছের বাগানে লুর্দের দেবী মূর্তি দেখতে গিয়েছিল। মূর্তির সামনে একটা ঘণ্টা। আলবের ঘণ্টাটা ধরে বাজিয়ে দিলো। আশ্চর্যের কথা, ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিও দুলতে লাগলো আর তাঁর গা থেকে আলো ফুটে বেরুতে লাগলো।

ব্যাপারটা ভালো করে দেখতে, ছেলেমেয়েরা আবার গেল তার পরদিন। সেদিনও সেই একই ব্যাপার। যতবার ঘণ্টা নাড়ে ততবারেই মূর্তির গা থেকে আলো বেরোয়। ৩রা ডিসেম্বর ওদের একজন মজা করে মূর্তিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি মাটির ঠাকুর না সত্যিকারের?' মূর্তি নির্বাক। ২৩শে ডিসেম্বর তারা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'বল না গো, তুমি মাটির না সত্যিকারের?' সেদিন কিন্তু দেবী চুপ করে না থেকে এক চমৎকার জবাব দিলেন বললেন, 'সত্যিকারেরই তো, সেই জন্যেই তো লোকে এখানে আসে পূজো দিতে'। ৩রা জানুয়ারি মূর্তি পুরোপুরি রক্ত মাংসের মাদোন্নার রূপে দেখা দিলেন। আলবেরকে বললেন, 'বিদায়, ভগবান তোমার সহায় হোন'। গিলবেরকে (আলবেরের ভাই) ডেকে বললেন, 'আমি পাপীকে পাপমুক্ত করি'। আলবেরের আর এক ভাই আঁদ্রেকে বললেন, 'আমি ঈশ্বরের মা, স্বর্গের রানী'। আর ফের্নান্দেকে বললেন, 'তুমি যদি আমাকে আর আমার ছেলেকে ভালোবাসো তাহলে তুমি আমার কাছে তোমাকে উৎসর্গ কর'।

ছেলেমেয়েরা বাপ-মা এবং বাড়ির লোকেদের কাছে ও গপ্পো যে করবে, এ তো জানা কথা। আর তার বদলে বকুনি ধমকানিও যে

জুটবে, তাও জানা কথা। জুটলোও। এলো ডাক্তার, এলো মনশ্চিকিৎসক। জেরায় ছেলেরা একটা বৈ দুটো উত্তর দিলে না। প্রত্যেক বারে একই জবাব দিলো, একটি কথারও নড়চড় হল না একবারও।

শিশুর নরম মনের ওপর যে ছাপ পড়ে, বয়সের পলি পড়ে সে ছাপ ঢাকা পড়ে যায়। হয়তো সে পলি সরেও যায় কারুর কারুর ক্ষেত্রে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে।

দেবী কি শিশু-মনস্তত্ব বুঝতেন না, নাকি বুঝতেন? ওগুলো কি ছেলেদের কাছে মায়ের কথা? যে কথা বয়স্কের কাছে বলা চলে, তা কি ছেলেদের কাছে বলার উপযুক্ত? দেবীর বুকে তিনটি গোলাপ। সাদাটি মায়ের দানের প্রতীক, লালটি ছেলেদের দানের আর হলদেটি প্রায়শ্চিত্তের। বড়দের মন কৃত্রিমতায় ভরা, ছোটদের মন অকৃত্রিম। তাই বোধহয় বড়দের কাছে ঈশ্বর বড় একটা মন খোলেন না, খোলেন ছোটদের কাছে। ধর্মগুরুরা কী বলেন? স্বর্গের অধিকার কি শুধু শিশুদেরই একচেটে? জানি না, শুধু জানি ১৯৩৩ সালে সেই মূর্তিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিশাল এক গির্জে।

*　　*　　*

হেরল্ট্‌স্‌বাখের ঘটনা রোমান ধর্মের একনায়কোচিত ব্যবহারের একটি আদর্শ নিদর্শন। এ গপ্পো আগাথা ক্রিস্টি অথবা জর্জেস সিমেননও ফাঁদতে পারতেন।

হেরল্ট্‌স্‌বাখ বাভেরিয়ার মিত্তেলফ্রাঙ্কেনের একটা গ্রাম।

৯ই অক্টোবর, ১৯৪৯ সাল।

চারটে মেয়ে, মারী হাইলমান, বয়স দশ, ক্যুনি শ্লাইখের, এগারো, গ্রেতে গুয়েগেল, এগারো আর এরিকা মুয়েলার, তারও বয়স এগারো। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ক্লাসের জন্যে তারা শরতের পাতা তুলছিল নানা গাছ থেকে। বাড়ি ফেরার পথে দেখলো, গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে, বেশ ওপরে উজ্জ্বল হস্তাক্ষরে লেখা তিনটি অক্ষর,

IHS (Iesus Hominum Salvator = যিশু মানবত্রাতা) লেখাটা যেন বিয়ারের সবুজ বোতলের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। লেখা মিলিয়ে গেল, তারপর দেখা গেল এক শুভ্রবসনা নারী মূর্তি, যেন শ্বেতাম্বরা সন্ন্যাসিনী, বার্চ গাছের মাথার ওপরে ভাসমান। মূর্তি ইতস্ততঃ আন্দোলিত হতে লাগলো মৃদুমন্দ গতিছন্দে।

মেয়েগুলি বুদ্ধিমতী, ঘাবড়ে যায়নি। মাথা তাদের ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্যে এক-দুই গুণলো, আশপাশের যে গোলমাল শোনা যাচ্ছে, তা নিয়ে আলোচনা করলো, তারপর দৌড়ে পুকুরপাড়ে গেল, দেখলো, আগের মতই সাতটা হাঁস সাঁতরাচ্ছে সেখানে। না, স্বপ্ন তারা দেখেনি। রমণী মূর্তি তখনো ভাসমান 'ওই হোতা,' পাহাড়ের মাথার ওপরে। মূর্তি ভাসতে ভাসতে উঠতে লাগলো। আরো আরো ওপরে, তারপর মিলিয়ে গেল নীল আকাশের মাঝে। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে দেখা গেল সে মূর্তিকে।

বাড়িতে মেয়েদের কথার এক বর্ণও কেউ বিশ্বাস করলো না। তাদের মাথার ভূত ছাড়াতে মায়েরা নিজেরাই গেল 'অকুস্থলে'। পাহাড়ের ওপরে উঠে মায়েরা দেখে, মেয়েরা হঠাৎ নিথর হয়ে কী দেখছে। সেই মূর্তি আবার তাদের সামনে। মায়েরা শুধু এইটুকুই বলেছিল যে তাদের মেয়েরা এমন অদ্ভুতভাবে, এমন গভীবভাবে বিচলিত হয়েছিল যে তার ছোঁয়া মায়েদের মনেও লেগেছিল। পরে মেয়েদের জবানবন্দী যখন স্বতন্ত্রভাবে নেওয়া হয়, তখন দেখা গেছে চারটে জবানবন্দীতে কোথাও অমিল নেই কোনখানে।

১০ই অক্টোবর। ক্যানি শ্লাইখের পাহাড়ের ওপর বেড়াতে গেছে আর একটা মেয়ের সঙ্গে। তাদের খেপাতে খেপাতে পিছু নিয়েছে চারটে ছেলে। তাদের নাম, আন্দ্রেয়াস বুয়েৎনের, বয়স তেরো, মিখায়েল লিণ্ডেনবের্গ, আদল্‌ফ্‌ মেস্‌বাখের আর হাইনৎস্‌ মুশা, তাদের বয়স সবারই বারো। সব কটা ছেলে-মেয়েই দেখলো, সেই

স্ত্রীমূর্তি গাছ-পালার ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যাচ্ছে পূবদিক পানে।

১২ই অক্টোবর। মেয়েরা সেদিন দেখতে পেলো শুধু একটা 'শুভ্র জ্যোতি', কিন্তু মিখায়েল লিঙেনবের্গের এবং তার ভাই মার্তিন বললে, তারা দেখেছে, এক 'শুভ্রবসনা নারীমূর্তি'।

১৩ই অক্টোবর। আন্তোনিয়া সাম (দর্শনার্থী ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে) সে-মূর্তিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী চান আপনি?' উপস্থিত সবকটি ছেলে-মেয়ে শুনলো, মূর্তি বলছে, 'লোককে আরো ভালো করে প্রার্থনা করতে হবে'

গ্রামের পাদ্রী, গাইলেরকে ছেলে-মেয়েরা ধরলো, তাদের সঙ্গে পাহাড়ে যেতে হবে। পাদ্রী গেলেন না, উপরন্তু বামবের্গের পাদ্রীবর্গের শাসন-সংস্থাকে জানালেন সেখানকার ঘটনাবলীর কথা।

১৬ই অক্টোবর। হের কুমেলমানকে পাঠিয়েছিল ধর্ম-সংস্থা। ছেলে-মেয়েদের তুরীয় অবস্থার উচ্ছ্বাস তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

পঞ্চাশ সালের পরবর্তী কয়েক মাস দিব্যদর্শন ঘটেছে অনেকবার এবং দর্শকদের সংখ্যাও বেড়েছে অনেকগুণ। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসের ১৩ তারিখ থেকে অক্টোবরের ৩১ তারিখ পর্যন্ত বেশ ঘন ঘন দর্শন মিলেছে। তার পর শান্তি নেবেছে হেরল্ট্স্বাখে।

কিন্তু সত্যিই কি শান্তি নেবেছে? দেখা যাক।

দর্শনকালে মূর্তির আবির্ভাব সব সময়ে এক ছিল না। কখনো মা মেরী একলা, কখনো বা কোলে শিশু যিশু। কখনো এসেছেন মহান দেবদূতেরা, কখনো বা ত্রয়ী। এক আধ বার পিতা যোসেফকেও দেখা গেছে। উনপঞ্চাশ সালের বড়দিনে নাকি ছেলে-মেয়েদের চোখের সামনে খৃস্টের জন্মবৃত্তান্ত চলচ্চিত্রের ছবির মত ফুটে উঠেছিল!

হেরল্ট্ স্বাখে ঈশ্বরের প্রতিনিধিদের আবির্ভাবের পরিণতি কী হয়েছিল জানেন ? ধর্মসংক্রান্ত অপরাধের বিচারের প্রয়োজনে আহূত হয়েছিল ধর্মীয় বিচারসভা !

৩০শে অক্টোবর ১৯৪৯ সাল। বামবের্গের ধর্মসভা ধার্মিকদের উদ্দেশে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তারা যেন 'অকুস্থলে' না যায়।

১০ই জানুয়ারী ১৯৫০ সাল। মিনারশীর্ষ হতে ঘোষিত হল, পাদ্রীসম্প্রদায়ের পরীক্ষায় দেখা গেছে, দর্শনসমূহের ভেতর এমন কিছু পাওয়া যায়নি, যাতে বলা যেতে পারে যে তারা অতিপ্রাকৃত-সম্ভূত। অতএব ওখানে তীর্থযাত্রা এবং মিছিল নিষিদ্ধ।

২রা মার্চ ১৯৫০ সাল। পাদ্রীসম্প্রদায়ের অনুশাসন, কোন পাদ্রী সেখানে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা অথবা তাতে যোগদান করতে পারবেন না, যদি সে অনুষ্ঠান দিব্যদর্শন সংক্রান্ত হয়।

৬ই মার্চ ১৯৫০ সাল। প্রধান পাদ্রী, ডাঃ কোল্ব্ গ্রামের পাদ্রী গাইলেরকে ডেকে, ভবিষ্যতে তাঁর ঘটনাস্থলে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিলেন।

২রা অক্টোবর ১৯৫০ সাল। প্রধান পাদ্রী পোপের আপিস থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বরের যে চিঠি পান, তাতে লেখা ছিল,—

> ······তদ্ব্যতীত আপনি (বামবের্গের প্রধান পুরোহিত) দিব্যদর্শনসংক্রান্ত ব্যাপারে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, মহামান্য পোপের দপ্তর তাহা সমর্থন করিতেছে এবং যে সমস্ত পাদ্রী এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সভ্য প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ পালন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছে, যাঁহারা এ পর্যন্ত তাহা পালন করেন নাই, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছে, অবিলম্বে তাহা যেন পালিত হয়···ইহা আমাদিগেরও অভিমত যে, পর্বতে

> প্রার্থনার অনুষ্ঠান পালন করার অর্থ দিব্যদর্শনের সত্যতা স্বীকার করা। অতএব তাহা বন্ধ করা হউক…।

১২ই অক্টোবর ১৯৫০ সাল। পাহাড়ে পাদ্রীর উপস্থিতি ছাড়াই যে-প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ধর্মসভার অনুরোধ, তা যেন বন্ধ করা হয়।

৪ঠা আগস্ট ১৯৫১ সাল। হেরল্ট্‌স্‌বাখের যাজক-পল্লীর পুরোহিত, পল্লীবাসীর শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয়, পক্ককেশ গাইলের আটতিরিশ বছর সসম্মানে পৌরোহিত্য করার পর বদলি হয়ে গেলেন। অপরাধ? তিনি দিব্যদর্শনের বিশুদ্ধতা সমর্থন করেছিলেন। তার আটবছর পরে তাঁর মৃতদেহ ফিরে এলো হেরল্ট্‌স্‌বাখে।

১৬ই আগস্ট ১৯৫১ সাল। পোপের আপিস নতুন অনুশাসন জারী করলেন।

> বিগত ১৮ই জুলাই, ১৯৫১ সাল, বুধবার নীতি এবং ধর্মেরবাহক মহান পুরোহিতগণ পূর্ণক্ষমতাসম্পন্ন এক সভায় মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,—
> ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে আলোচ্য দিব্যদর্শনসমূহ অলৌকিক নহে। অতএব নির্দিষ্ট স্থানে অথবা অন্য কোন স্থানে তদ্দর্শন সংক্রান্ত ধর্মবিশ্বাস নিষিদ্ধ। যে পাদ্রীগণ ভবিষ্যতে এই নিষিদ্ধ ধর্ম-বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের কর্তব্যকর্ম হইতে তাঁহাদিগকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত মহামান্য পোপের অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

২২শে আগস্ট ১৯৫১ সাল। বদলী পাদ্রী, ডাঃ শ্‌মিট্‌ তদন্তকারী বিচারকের মত পরীক্ষা করে ফরমান জারী করলেন, যে-সব ছেলে-মেয়েরা দিব্যদর্শন লাভ করেছে, তারা পবিত্র প্রসাদের ভাগ পাবে না। তাছাড়া, আরো বলা হল, তারা পাহাড়ের দিকে শুধু যাবে না

নয়, ভবিষ্যতে বলতেও পারবে না যে মা মেরীকে তারা দেখেছে। কিউরিয়ার (পোপের আদালত) ভয়ে ছেলেরা পাহাড়ের ছায়া মাড়ালো না পাঁচমাস, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রসাদের ভাগ তাদের কপালে জুটলো না।

১৫ই মে ১৯৫৫ সাল। একটি মকদ্দমার রায়ে ধর্মসংস্থা বাধ্যতামূলক পাহাড় পরিষ্করণের আদেশ জারী করলেন। ইতিমধ্যে পাহাড়ের ওপরে যে মেরীর মূর্তি, ছোট বেদী ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে, সেগুলোকে তো সরাতে হবে।

৪ঠা থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ সাল। ফর্থ্‌হাইমের আদালতের এক মামলায় প্রতিবাদী ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত এক সরকারী কর্মচারী, নাম পাউল শ্লাইডের। হেরল্ট্‌স্‌বাখের ঘটনার ওপর ১৯৫৪ সালে একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তিনি (১৪)। সে মামলাতেও বাদী ছিলেন ধর্ম-সংস্থা। সাক্ষীদের ভেতর দিব্যদর্শন প্রাপ্ত কয়েকটি ছেলে-মেয়েও ছিল। ১৯৫৭ সালে তাদের বয়স হয়েছে সতেরো-আঠেরো। তারা একবাক্যে সমর্থন করেছিল যে উনপঞ্চাশ-বাহান্ন সালে তারা দিব্যদর্শন লাভ করেছে।

এখানে বলে রাখি যে উনপঞ্চাশ সালের ৮ই ডিসেম্বর হেরল্ট্‌স্‌বাখে একটা 'সৌর-অলৌকিক' দেখা গিয়েছিল এবং সে-অলৌকিকের দর্শক ছিলেন দশ হাজার লোক। যাজক-পল্লীর পুরোহিত, গাইলের তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন,

> সূর্য ফট ফট শব্দ করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো, তার মাঝখানে দেখলাম গোলাপের একটি পাঁচ ইঞ্চি চওড়া মুকুট। আন্তোনিয়া সাম সূর্যের মধ্যে মা মেরী এবং তাঁর শিশুপুত্রকে দেখলো। পাহাড়ের উপরে আমরা পাঁচজন যাজক দাঁড়িয়েছিলাম। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এর সাক্ষী দেবো।

ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক, ডাঃ জে. বি. ভাল্‌ৎস্‌ এই বর্ণনা দিয়েছেন (১৭),—

> তাহা উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। মনে হইল, সূর্য যেন আরো বৃহৎ হইয়াছে, তাহা আরো নিকটে আসিতেছে। চক্ষু যেন ঝলসাইয়া যাইবে। আমি যেন অন্ধ হইয়া গেলাম, অনুভব করিলাম, অস্বাভাবিক কিছু ঘটিতেছে, ভয়ঙ্কর কিছু একটা যেন এখনই ঘটিবে। আমি ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম…। অতঃপর সূর্য ঘুরিতে লাগিল। সে-ঘূর্ণন এমনই প্রকট যে মনে হইল, যেন কোন যন্ত্র তাহাকে নির্দিষ্ট গতিতে একভাবে ঘুরাইতেছে। ঘূর্ণন কালে তাহাতে নানা বর্ণের কী অপূর্ব সমাবেশ দেখিলাম।

*　　*　　*

হেরল্ড্‌ স্বাখের চেয়ে কম খ্যাত এমন আরো অনেক দিব্যদর্শনের ঘটনার কথা পোপের দপ্তরকে জানাতে পারি। সে সব ঘটনা অনেক কম লোক দেখেছে সত্যি, কিন্তু সেগুলো 'খাঁটি' বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

সবই নির্ভর করে উপযুক্ত ধর্ম-সংস্থা কেমন প্রতিবেদন পেশ করছেন, তার ওপর। মানুষের ওপর সে-প্রতিবেদকের যতই প্রভাব থাক, আর যত বড় ব্যক্তিত্বই তাঁর থাক, প্রতিবেদন যে ত্রুটিহীন হবেই, এমন কথা কখনোই বলা যায় না। রোমে প্রতিবেদন পেশ করবার সময় বামবের্গের কর্তারা কী লিখেছিলেন? প্রতিবারে একই বর্ণনা দেয়নি বলে দিব্যদর্শনপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েরা কি অবাধ্য ছিল? না কি, সমগ্র পবিত্র পরিবারটিকে গাছ-পালার মাথার ওপরকার আকাশে চলাফেরা করতে দেখেছিল বলে অপরাধী? অথবা, গোপন তথ্যের শেষে উল্লেখিত ধর্মমতের সঙ্গে তাদের পাওয়া বাণীর সামঞ্জস্য ছিল না বলে? কী তাঁরা লিখেছিলেন, তা আমরা কোন কালে জানবো না।

গোপন দলিল ধর্মীয় দপ্তরেই থাকে ভালো, সরকারী দপ্তরে অথবা মহাফেজখানায় যত বড় করেই 'একান্ত গোপনীয়' লেখা থাক না কেন, অমন ভালো করে রাখা যায় না।

রোমই ঠিক। যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে খিড়কির দরজার একটা পাল্লা সব সময়ে খোলা থাকে যাতে গির্জের কল্যাণে 'হ্যাঁ' কে 'না', 'না' কে 'হ্যাঁ' করা যায় সহজে। হেরল্ট্ স্বাখের ক্ষেত্রে কিন্তু সে-দরজা চেপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দ্বাদশ পোপের অভিষেকের পর। রোমের একটা বহু প্রচলিত প্রবাদ বলে, যার রাজত্বে বাস করি, তার ধর্মই সর্বাগ্রে গ্রহণীয়।

* * *

বেলজিয়ামের বানো গ্রামের শ্রী বেকো ছ'টি সন্তানের জনক। ছোট মেয়ে বারো বছরের মারিয়েৎ। ধর্মে তার রুচি নেই। অন্যায় কথা, পরিবারটি যে ক্যাথলিক। ১৯৩৩ সালে ১৫ই জানুয়ারী। গভীর রাত্রে মারিয়েতের ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে বাগানে নজর পড়লো। হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলো ঝলকে উঠলো সেখানে আর অপরূপ রূপবতী এক কন্যা সেখানে দাঁড়িয়ে দুহাত ছড়িয়ে! মারিয়েৎ চমকে চিৎকার করে মাকে ডাকলো। মাও দেখতে পেলেন সে মূর্তি। মারিয়েৎ সে কন্যার বর্ণনা দিয়েছে, তুষারশুভ্র বস্ত্র, ঘন নীল মেখলা, মাথায় শ্বেত অবগুণ্ঠন, দক্ষিণ পদ একটি স্বর্ণগোলাপে ন্যস্ত, ডান হাতে গোলাপের একটি সাজি আর মুখে মৃদু হাসি। সেই দর্শনের পরে মারিয়েতের মনে এলো পরিবর্তন। ধর্মানুষ্ঠানকে সে আর কোনদিন এড়িয়ে যায়নি।

তিন দিন পরে আবার সেই আবির্ভাব, সেই বাগানেই। একখানা সাদা মেঘ যেন নেবে এলো আকাশ থেকে মারিয়েতের খুব কাছে, চার-পাঁচ হাতের ভেতরে। মেঘ সরে প্রকাশ পেলো সেই মূর্তি, হাতে তাঁর একটি জলপাত্র। মারিয়েৎকে বললেন, 'স্পর্শ কর

এই জল, এ পাত্র আমার প্রতীক, বিদায়, আবার দেখা হবে'। সেই একই আবির্ভাব ঘটেছে ১৯-২০শে জানুয়ারী, ১১ই, ১৫ই, ২০শে ফেব্রুয়ারী আর শেষবার ২রা মার্চ। সে সব দর্শনে তিনি বলেছেন, 'আমি অনাথের মা' 'ঈশ্বরের মা' 'দরিদ্রের জননী' 'আমার এ জল সকল মানুষের রোগমুক্তির উপায়'।

এর কী ব্যাখ্যা করবো? গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে বলেই কি সে দিব্যদর্শন লাভ করেছিল? কিন্তু মারিয়েৎ তো সন্ন্যাস গ্রহণ করেনি। সে বিয়ে করেছে, পুরোপুরি সংসারী মেয়ে সে।

১৯৩৩ সালের ২২শে আগষ্ট রোম সে আবির্ভাবের ঘটনাকে সরকারীভাবে মেনে নিয়েছেন। একটি গির্জেও গড়া হয়েছে। তার ভেতর রাখা হয়েছে পবিত্র বারির একটি পাত্র। সে জল ডাক্তারদের পরম বিস্ময়ের বস্তু। ছোট্ট গ্রাম বানো আজ বিশ্ব-বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রের একটা।

* * *

১৯৫০ সালের ১৫ই এপ্রিল। সিসিলির আকোয়াভিভা প্লাতানি গ্রামে বারো বছরের মেয়ে তিনা মালিয়া বেলা বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত পরপর পাঁচবার দিব্যদর্শন পেয়েছিল।

একটা হালকা মেঘে গোটা আকাশ ঢেকে গেল। সূর্যকে মনে হল, একটা বিশাল নক্ষত্র যেন। সে নক্ষত্র দুলতে দুলতে নেবে এলো এঁকে বেঁকে, আবার উঠে গেল একই ভাবে, তারপর আবার সে যে-সূর্য, সেই-সূর্য। সেই ঘটনা আবার ঘটলো বিকেল চারটে একুশ মিনিটে।

* * *

১৯৫৮ সালের পয়লা জুন। চেকোস্লোভাকিয়ার ক্রাকোফ অঞ্চলের তুর্জেভ্স্কা গ্রামের মাতুশ লাশুৎএর বরাতে এক দিব্যদর্শন লাভ ঘটেছিল। ভদ্রলোকের বয়স বিয়াল্লিশ, তিনটি সন্তানের জনক, দায়িত্বশীল এবং মতবাদে কম্যুনিষ্ট। তিনি দেখলেন, গোলাপের

এক সীমাহীন সমুদ্রের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক দেবী মূর্তি। জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত সেই একই আবির্ভাবের দর্শন পেয়েছেন সাতবার। ওরই ভেতর একবার যিশুরও দর্শন পেয়েছেন তিনি। যিশুকে তিনি কেমন দেখেছিলেন, তাঁর কথাতেই বলি,—'দেখলাম শ্বেত বস্ত্রে আবৃত দেহ, ডান কাঁধ থেকে পেছনে বেড় দিয়ে বাঁ হাতে ঝোলানো একটা লাল কম্বল আর বাঁ হাতে হেলানো তাঁরই সমান লম্বা একটা ক্রুশ। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন বিশাল এক সমবাহু ত্রিভূজাকৃতি জ্যোতির মধ্যে। সে ত্রিভূজের মধ্যে তাঁর মূর্তি ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং জ্যোতিষ্মান'।

চেকোস্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষ সে 'দেখাকে' সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন এবং সবরকমে চেষ্টা করেছেন যাতে তুর্জোভ্‌স্কার এই খবর ছড়িয়ে পড়তে না পারে, কিন্তু হলে হবে কি, হাজার হাজার পুণ্যকামী মানুষের ভিড় সেখানে লেগেই আছে।—দেখা যাচ্ছে, আবির্ভাব কোন রাজনৈতিক সীমানার ধার ধারে না, লৌহ যবনিকার এপার ছেড়ে ওপারেও হানা দিতে শুরু করেছে সে!

* * *

দিব্যদর্শনসংক্রান্ত শত শত সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে বুঝেছি, দিব্যদর্শনকে স্বীকৃতি দেওয়া বা নাকচ করার একচেটে ক্ষমতা একমাত্র ক্যাথলিক গির্জের, যদিও এটা ঘটনা যে মানুষ দিব্যদর্শন লাভ করেছে এবং এখনো করছে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক অনুশাসন মতে মা মেরী অথবা প্রভু যিশু কিম্বা দেবদূতদের কারুর যাকে খুশি তাকে দর্শন দেবার স্বাধীনতা নেই। এমনকি দিব্যদর্শন যারা লাভ করে, তাদেরও অধিকার নেই সে-দর্শনের সত্যাসত্য বিচার করবার।

অলৌকিককে স্বীকৃতি দেবার একচেটে অধিকারের দাবি ক্যাথলিক ধর্মের জন্মেছে, সে তার শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে। যথা,

মা মেরী যদি কোন এক দর্শনে কোন বাণী দেন এবং সে-বাণী যদি ক্যাথলিক মতবাদের সঙ্গে না মেলে, তাহলেই নাকচ হয়ে যাবে, এবং নথিভুক্ত হবে প্রামাণিক, তথা 'বিশুদ্ধ' নয় বলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে চেপেও দেওয়া হবে, যেন ঘটনাটা ঘটেইনি কোন কালে।

ধর্মে যে বিশ্বাসী নয়, তার কপালে যদি দিব্যদর্শন ঘটে, তাহলে সে-বেচারাকে শরণ নিতে হবে মনোরোগবিৎ কবিরাজ মশায়ের…না হয়, রাত পোয়াবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে দৌড়োতে হবে গির্জেয়, ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নিতে!

* * *

রুদল্‌ফ্‌ ক্রায়মের-বাদোনি ক্যাথলিকও বটেন, আবার লেখকও বটেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'ধর্ম কি ক্লাবের মতন, যে তার সভ্য হতে গেলে তার নিয়ম-কানুন মানতেই হবে?'

ধর্মীয় পাণ্ডাদের ঔদ্ধত্য বেদনাদায়ক। 'যাহা স্বীকৃত নহে, পোপের যাহাতে সম্মতি নাই, তাহা তুমি দেখিতে পারিবে না—যে-বাণী পোপের আশীর্বাদপূত নহে তাহা তুমি শ্রবণ করিতে পারিবে না।' আবার তার ওপরে আছেন দৈবপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত ভদ্র মহোদয়গণ, সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম এবং সর্বদর্শী যাঁরা। ক্রায়মের-বাদোনির বই থেকে (Die Last, Katholisch Zu Sein—ক্যাথলিক হওয়ার দায়) আর একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি,—

> আইনগত সমস্ত সিদ্ধান্তে গির্জের কী অধিকার আছে ঈশ্বরকে সাক্ষী হিসেবে ডাকবার? তাহলে, (নতুন জঞ্জালের জায়গা করতে) যে জঞ্জাল সাফ করা দরকার, সে পুরোন জঞ্জাল জমতেই থাকে কেন?

দিব্যদর্শনের ঐতিহাসিক এবং আধুনিক সারসংক্ষেপ থেকে যদি পৃথিবী বিখ্যাত দুটি মহিলার কথা, সিয়েনার ক্যাথরিন আর অর্লেয়াঁর কুমারীর কথা, বাদ যায় তাহলে অমার্জনীয় অপরাধ হবে।

দিব্যদর্শনের উর্ধ্বে এ মেয়ে দুটির একটি বিশেষ স্থান আছে, কারণ তাদের দর্শনের সঙ্গে ওতপ্রোত ছিল রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার। রাষ্ট্রনীতির ওপর দুজনেরই ছিল প্রভূত প্রভাব। জেস্যুইট ফাদার হেরমান বুজেনবাউমের (১৬০০-১৬৮৬) গ্রন্থের 'কার্য অনুমোদিত হইলে, কারণও অনুমোদিত হইবে', বাণীটি তখনি বেশ সম্মানিত। তাঁর গ্রন্থের নাম Medulla theologiae moralis (নীতি-ধর্ম কথা)। গির্জের কৌশলের কাছে মাথা নত করতেই হয়, অতীতের দিকে চেয়ে আরো বেশি করে মাথা নত করছি।

*　　*　　*

ইতালির তসকানীর শহর সিয়েনার খুব বোলবোলা ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। চতুর্দশ শতাব্দীতে সিয়েনা যখন শিল্পমাধুর্যের চক্রশীর্ষে, তখন ক্যাথরিনের জন্ম। সিয়েনা ছিল ফ্লোরেন্সের প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৫৫৯ সালে পরাজিত হয়ে তার গর্ব চূর্ণ হয়, এবং পরিণত হয় শস্যশ্যামল একটি গ্রামীণ কেন্দ্রে।

ক্যাথরিনের জন্ম ১৩৪৭ সাল নাগাত। পরিবারের সে ত্রয়োবিংশতি অথবা চতুর্বিংশতি সন্তান (তার একটি জমজ বোন ছিল)। পিতা, প্রধান রঞ্জক, বেনিনকাজা। সতেরো বছর বয়সে ক্যাথরিন দমিনিক তৃতীয় সংসদে যোগ দেয়। সে-সংসদে সাধারণ সম্প্রদায়গত মঠ-জীবন যাপন করতে হত না, তাদের আপন নিয়মের বশবর্তী ছিল তারা। শোনা যায়, ক্যাথরিন থাকতো 'পুরোপুরি তার আপন সাধন-ভজন নিয়ে'।

Katherina von Siena—Politische Briefe (১৮) গ্রন্থটি প্রকাশের জন্যে 'কুরের' পাদ্রীর অনুমোদন লাভ ঘটেছিল ১৯৪৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর। তাতে আছে,—

> ১৩৭০ সাল নাগাত ক্যাথরিন 'সমাধির' অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তখনই সে নবজীবন লাভ করে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচারের নিমিত্ত।

১৩৪৭ সালেই সে বলেছিল, তার প্রিয়তম যিশুর সঙ্গে তার নিবিড় সান্নিধ্যের কথা, বলেছিল, তাদের হৃদয় বিনিময়ের কথা। ক্যাথরিন যিশুর ক্ষতচিহ্নও লাভ করেছিল। শোনা যায়, শৈশবেও সে অন্য শিশুদের থেকে ছিল ভিন্নতর।

> জ্ঞানের উদয়ের প্রায় অব্যবহিত পরেই যিশু তাহাকে দর্শন দান করেন। তখন তাঁহার পরিধানে ছিল পোপের পরিচ্ছদ এবং মস্তকে ছিল টায়রা। তাঁহার বরাভয় হস্ত প্রসারিত করেন ক্যাথরিনের প্রতি। সেই মূর্তি দেখিয়াই পোপকে 'পৃথিবীতে খৃস্টের অবতার' বলিয়া তাহার মনে হইয়াছে।

তার প্রব্রজ্যার শুরুতেই এমন কাহিনী শুনে আমার চতুর্থ সংগীতটি মনে পড়ে, 'ঈশ্বর সাধু-সন্তদের পথ দেখান এক বিচিত্র উপায়ে'। গানের কথাটাকে আমার একটু বদলাতে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে করছে, 'ঈশ্বরের' জায়গায় 'গির্জে' কথাটা বসিয়ে দিতে!

> তাহার যৌবনকালের সাধনায় যে-সমাধি দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহার জীবনের গতি পরিবর্তিত করিয়াছিল। পূর্ণ চার ঘণ্টা কাল লোকে মনে করিল, তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। সেই সমাধিতেই ঈশ্বর তাহাকে সাধু-সন্তদিগের পবিত্রতা দর্শন করান…।

ক্যাথরিন একটি শুভ্র পশমী পোষাক পরে, গায়ে একটা কালো শাল জড়িয়ে সিয়েনার পথে পথে ছুটে বেড়ালো। তার অলোকদর্শন, তার সমাধির কথা তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। শহরে হেন লোক নেই যে তাকে চেনে না। তার চোখে যেন কী এক 'জাদু'।

একের পর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটতে লাগলো তার চোখের ওপর, তীর্থকামীর মন নিয়ে কাতারে কাতারে মানুষ দেখতে ছুটলো তাকে।

১৩৭৪ সাল থেকে লোকে বলেছে, সে 'সর্বজনীন হিতার্থে আত্ম-নিয়োগ' করেছিল। সে-আত্মনিয়োগ রূপ নিল এক অগ্নিগর্ভ পত্রের—সে চিঠি, আদেশ পত্র, 'রাজনীতি সংক্রান্ত পত্র', লেখা রাজা-রাণীদের কাছে, পোপ-পাদ্রীদের কাছে (ক্যাথরিন লিখতে শিখেছিল শেষ বয়সে)। ধর্মযুদ্ধে যোগদানের গোঁড়া সমর্থক ছিল সে। বলতো, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমারো ইচ্ছা'।

দেখছি, খৃষ্টীয় বিনয় এবং নম্রতার আদর্শের ধার দিয়েও যেতো না ক্যাথরিন। তার ক্রিয়াকলাপ ধর্মীয় প্রেরণাপ্রসূত মনে হলেও আসলে তার প্রভাব ছিল রাষ্ট্রনৈতিক।

পোপ একাদশ গ্রেগরী (১৩৭০-৭৮) সপারিষদ আভিনিয়নে নির্বাসন যাপন করছিলেন। দিব্যদর্শন মারফত যে দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হয়েছিল, তারই জোরে ক্যাথরিন ফিরিয়ে আনতে চাইলো পোপকে, যাতে আবার তিনি রোমে বসে পূর্ণ মর্যাদায় ধর্মীয় প্রশাসন পরিচালনা করতে পারেন। তার জন্য সে তাবড় তাবড় রাজপুরুষের সহানুভূতি আদায় করলো, তারপর গেল আভিনিয়নে, পোপীয় মহান জাগতিক বিচারালয়ে।...... সব স্থানেই ক্যাথরিন প্রথম এবং প্রধান, তথা প্রিয় এবং রহস্যময়ী।...... ও থেকেই বোঝা যায়, তার রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপটি কেমন ছিল।......'

চমৎকার আবরণ!

পোপের প্রত্যাগমনের জন্যে পুরো এক বছর সে লড়েছে। ১৩৭৭ সালে পূর্ণ হল তার মনস্কামনা। রোম আবার রোম হয়ে উঠলো। আবার ক্ষমতা ফিরে এলো পোপের হাতে।

ক্যাথরিনের সারল্যের কথা লোকে যত জোর গলাতেই প্রকাশ করুক, তার রাষ্ট্রনৈতিক কাজে দিব্যদর্শনের দোহাই যত বড় করেই

দিক, আসলে তারা ক্যাথরিনের মতন অমন একটি রাষ্ট্রনৈতিক অস্ত্রকে এমনই ফুল-লতা-পাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছে যে তার আসল রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। হতে পারে, দিব্যদর্শনকে প্রমাণের আওতায় আনা যাবে না, কিন্তু যে সব ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তার দ্বারা সাধিত হয়েছে, সে সব তো প্রমাণ করা যাবে। সেগুলো সত্যিই এমন কিছু, যাদের আমরা বুঝতে পারবোই, নেহাত যদি না কেউ আমাদের চোখ দুটো অন্ধ করে দেয়।

* * *

তারপর সেই চাষার মেয়ে অর্লেয়াঁর জোন (জোন অব আর্ক), রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ওস্তাদ এবং দিব্যদর্শনের ব্যাপারে যে 'বিশ্ব-তারকা'। পূর্ব ফ্রান্সের মোয়েজ নদীর তীরে দঁরেমী গ্রামে তার জন্ম ১৪১০ থেকে ১৪১২ সালের ভেতর। আজ দঁরেমীর নাম, 'দঁরেমী লা পুয়েসেল' (লা পুয়েসেল=কুমারী), লোকসংখ্যা প্রায় ২৮০। তাদের গ্রামের বিখ্যাত সন্ন্যাসিনী যে বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, পর্যটকদের সে-বাড়ি দেখাতে তারা সবাই উৎসুক।

সাহিত্যে যে 'জঁা দ্য আর্ক, 'সন্ত জোন' অথবা 'অর্লেয়াঁর কুমারী', বহু নাটকের মধ্যমণি—দঁরেমীর সেই চাষার মেয়ে নাসিকা প্রবেশ করিয়েছে, ইউরোপের বড় বড় রাজনৈতিক ব্যাপারে। তার দাবি, অলৌকিক প্রত্যাদেশ।

জোন প্রথম প্রত্যাদেশ পায়, যখন তার বয়স সবে তেরো। মামলায় প্রদত্ত বীরাঙ্গনার সাক্ষ্য আজো রক্ষিত আছে, 'রয়াল লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপিসমূহের ভেতর' (১৯)।

> আমার বাবার বাগানে একদিন একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, তখন আমার বয়স তেরো। সে কণ্ঠস্বর এসেছিল গির্জার দিক থেকে, তার সঙ্গে দেখেছিলাম এক অপূর্ব উজ্জ্বল আলো। প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু তার

পরেই বুঝেছিলাম, সে কণ্ঠস্বর কোন দেবদূতের। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সে দেবদূত আমার নিত্যসঙ্গী, তাঁরই কাছ থেকে পেয়েছি নানা নির্দেশ। তিনি মাইকেল। সন্ত ক্যাথরিনকেও দেখেছি আমি (সিয়েনার !), দেখেছি সন্ত মার্গারেৎকে। তাঁরা কথা বলেছেন আমার সঙ্গে, উদ্বুদ্ধ করেছেন আমাকে, পথ দেখিয়েছেন আমার সব কাজে। কথা শুনেই আমি বুঝতে পারি, কে আমার সঙ্গে কথা বলছেন—কোন সাধু-সন্ত, না কোন দেবদূত। তাঁদের কণ্ঠস্বর যখন শুনতে পাই, তখন প্রায়ই একটা আলো দেখতে পাই। তাঁদের কণ্ঠস্বর মিষ্টি, বন্ধুর মত। দেবদূতেরা আমাকে দর্শন দিয়েছেন, সাধারণ মানুষের রূপে। তাঁদের আমি দেখেছি, আজো দেখতে পাই এই চর্মচক্ষে।.........

তার বছর পাঁচেক পরে জোন একদিন গরু চরাচ্ছে, এমন সময় শুনতে পেলো, কে যেন তাকে বলছে, 'ঈশ্বর ফরাসীদের উপরে করুণাপরবশ, তুমি গিয়ে তাদের রক্ষা কর'। সে-কথা শুনে সে যখন কাঁদতে লাগলো তখন সে-কণ্ঠস্বর তাকে আদেশ করলো, 'তুমি ভাঙ্কুলিয়রে যাও, সেখানে এক সেনাপতিকে দেখতে পাবে, সে তোমাকে বিনা বাধায় রাজার কাছে নিয়ে যাবে'।

"সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যা করেছি, সবই, হয় দিব্যদর্শন, না হয় প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই করেছি, এমন কি, আমার এই বিচারেও যা বলতে আদিষ্ট হচ্ছি, তা-ই বলছি।'........

অর্লেয়াঁর অবরোধের সময়ে সে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, নগর জয় হবে এবং তার বুক চিরে রক্তপাত ঘটবে। পরদিন প্রভাতে সত্যিই একটা তীর এসে তার কাঁধে লেগে ছ'ইঞ্চি বসে গিয়েছিল।

অলৌকিক কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগের কারণে, হপ্তায়

দুতিন বার তাকে রাজনৈতিক কাজে মন দিতে হয়েছে। ১৪২৮ সালের শেষাশেষি সে-নির্দেশ আরো স্পষ্ট। ওইটুকু মেয়েকে তার দেশবাসীর সাহায্যে হাত বাড়াতে হবে, অর্লেয়াঁর ওপর থেকে ইংরেজদের অবরোধের অবসান ঘটাতে হবে।

দৈববাণী মারফত হুকুমজারি না হয় হল, কিন্তু সেই রাষ্ট্রীয় কর্তব্যকে কার্যে পরিণত করা কি চাট্টিখানি কথা, সেই সামান্য চাষার মেয়ের পক্ষে? ফ্রান্স যে তখন দু'দলে বিভক্ত—একদিকে দুর্বল দোফ্যাঁর নেতৃত্বে অর্লেয়াঁ দল (ফরাসী সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর উপাধি, দোফ্যাঁ) জোন যাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিল র‍্যাঁস নগরে ১৪২২ সালে, অভিহিত করেছিল রাজা সপ্তম শার্ল্ নামে, আর একদিকে পঞ্চম হেনরির নেতৃত্বে ইংরেজ-অনুগামী বুর্গনিয়া দল।

মেয়েটিকে যেন তার দেবতারা খাটিয়ে নিয়েছে নাকে দড়ি দিয়ে, তারা যেন রোমক পুরাণের ফিউরিদের মত (রোমক পুরাণের তিনটি প্রতিহিংসাপরায়ণা দেবী, ফিউরি বা দাইরি। দোষীকে ধাওয়া করে শাস্তি দেওয়াই ছিল তাঁদের কাজ)। চাষী মেয়ের ছেঁড়া পোষাকেও জাঁদরেল রাজপুরুষদের ঘায়েল করতে জোনের অসুবিধে হয়নি, তার কারণ তার চোখা বুদ্ধি। তারপর, সেই বুদ্ধির জোরেই হাজির হয়েছে, প্রায় নাবালক দোফ্যাঁর সামনে। তাঁকেও সে কথার তোড়ে এমনি কাবু করেছে যে দোফ্যাঁ তাকে তাঁর Chef de Guerre করতে পথ পাননি।

৪০০০০ সৈন্যের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে জোন ইংরেজদের হটিয়ে দিয়েছে অর্লেয়াঁ থেকে। এই জয় থেকেই ইঙ্গ-ফরাসী শত-বর্ষ যুদ্ধ মোড় নিয়েছে ভিন্ন পথে। জোনের শেষ বাসনা পুনরৈকবদ্ধ ফ্রান্স—ঐকবদ্ধ অর্লেয়াঁ এবং বুর্গনিয়া দল যে ইংরেজদের ধ্বংস করতে পারতো,—কিন্তু তা হল না, দুর্বল রাজার জন্যে সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

সাহসিনী আবার একবার যুদ্ধে নাবলো, কিন্তু বুর্গনিয়া দল তাকে বন্দী করলো কঁপোনিয়ার কাছে। তার মূর্খ রাজা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল তাকে। বুর্গনিয়রা তাকে বেচে দিলো ইংরেজদের কাছে বেশ চড়া দামে। (সাধু-সন্তদেরও দাম আছে বৈকি !) ইংরেজরা এমনি ফ্যাসাদে পড়েছিল, এমনি অপ্রীতিকর হয়েছিল তাদের অভিজ্ঞতা যে টাকার পরোয়া না করে তারা জোনকে হাতে পেতে চেয়েছিল রাষ্ট্রনৈতিক ধুয়ো তুলে। তারা বুঝেছিল, জোন এবং জোনের দৈববাণী (!) না থাকলে ফ্রান্সের আর ঐকবদ্ধ হবার শক্তি থাকবে না। যুদ্ধ-বন্দিনী জোনকে ওরা মনে করতো, মায়াবিনী। নিরাপত্তার কারণে মেয়েটিকে ওরা অবরুদ্ধ করলো লৌহ পিঞ্জরে !

বিচার শুরু হল ১৪৩১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, পাদ্রী বোভের এজলাসে। নথিপত্র থেকে দেখা যায় সাক্ষের একটা বড় অংশ ছিল জোনের দিব্যদর্শন এবং দৈববাণী।

স্থান—রুওয়াঁর একটি দুর্গ। কাল—২২শে ফেব্রুযারি ১৪৩১ সাল।

জেরা কবে তুমি প্রথম দৈববাণী শুনেছিলে ?

জোন আমার বয়স তখন তেরো, একদিন দৈববাণী হল, শুনলাম, ন্যায়ের পথে চলতে তিনি আমায় সাহায্য করবেন।

জেরা তুমি কি প্রায়ই দৈববাণী শুনতে পেতে ?

জোন হপ্তায় দু'তিন বার শুনতে পেতাম, বলতেন, 'গ্রাম ছাড়িয়া ফ্রান্সে যাও'।

জেরা আর কী শুনতে ?

জোন বলেছিলেন, অর্লেয়াকে অবরোধ-মুক্ত করতে হবে······

এ বাণীতে জোনের ওপর যে কাজ অর্পিত হয়েছিল, সে কাজ পুরোপুরি রাজনৈতিক ! ২৮শে মার্চ ওরা যখন তাকে অত্যাচারের ভয়

দেখিয়ে বলেছিল, ধর্মবিরোধী বলে তাকে দণ্ডিত করা হবে, তখন সে দিব্বি গেলে বলেছিল, দিব্যদর্শন সে পায়নি।

জোন ধর্মসভা যখন দাবি করছেন, আমার দিব্যদর্শন লাভ এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি প্রমাণ সম্ভব নয়, তখন আর তা নিয়ে জোর করতে চাই না।

যে কথা তাকে জোর করে বলানো হয়েছিল, ২রা এপ্রিল সে কথা সে অস্বীকার করলো।

পাদ্রী বৃহস্পতিবারের পরে কি তুমি সন্ত ক্যাথরিন এবং সন্ত মার্গারেতের বাণী শুনেছো?

জোন মহিমান্বিতা রমণীদ্বয় মারফত ঈশ্বর আমায় বলেছেন, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মিথ্যা বলায়, জঘণ্য অপরাধ করেছি।

১৭৩১ সালের ৩০শে মে খৃস্টান বিচারকদের নীরব সম্মতিতে, অযাজকীয় ঘাতকেরা চিতায় অগ্নিসংযোগ করলো। জোনের শেষ নিঃশ্বেস পড়লো, 'যিশু, যিশু' বলে চিৎকার করতে করতে।

কুড়ি বছর পরে বিচারালয়ের এক সহকারী সাক্ষী দেবার সময় বলেছিল, জোনের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার হৃৎপিণ্ড ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত।

ধোঁয়াটে কিম্বা কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার সন্ধান করা বাতুলতা, কিন্তু একথা সত্যি যে দিব্যদর্শনের মাধ্যমে যাঁরা দেখা দিয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বর্গের দেবতাদের কী ধরনের স্বার্থ জড়িত ছিল?

১৪৫৬ সালে ধর্মসভাব ইচ্ছে হল, সন্ন্যাসিনী এবং বীরাঙ্গনাকে 'ঘরে তুলতে'। যে-রায় একদিন তাঁদেরই সমধর্মিনীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল চিতার আগুনে, সে-রায়কে তাঁরা নাকচ করলেন। ১৮৯৪ সালে জোনের 'স্বর্গপ্রাপ্তি' ঘোষণা করলেন এবং তাকে সন্ত শ্রেণীভুক্ত করা হল ১৯২০ সালে!

বার্নাড শ তাঁর 'সেন্ট জোন' নাটকের পরিশিষ্টে সপ্তম শার্লের স্বপ্নের দৃশ্যে বিংশ শতাব্দীর ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে বলেছেন,

> প্রতি মে মাসের তিরিশ তারিখে, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রিয়তমা কন্যার তিরোধান দিবসে প্রতিটি ক্যাথলিক গির্জায় একটি বিশেষ প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হবে, তাঁর স্মরণসভা রূপে। আর, একটি আইনসম্মত কাজ হবে, তাঁর নামে একটি করে গির্জা উৎসর্গ করা। উৎসর্গীকৃত প্রতিটি গির্জার বেদীর উপরে তাঁর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে আইনসম্মতভাবেই। ধার্মিক মানুষ সে মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করবে এবং 'অনুগ্রহ সিংহাসনের' উদ্দেশে তাঁর মারফত তাদের প্রার্থনা প্রেরণ করা বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে পরিগণিত হবে তো বটেই, সম্পূর্ণ আইনসম্মতও হবে।

সরকারী ভাষণকে শ আক্ষরিকভাবে ব্যবহার করেছেন। এই ধরনের ব্যাপারেই ধর্মসভা আপনার মৌলিক পরিবর্তন সহ্য করেন, বিশেষ করে যখন দেখেন সাধু-সন্তরা স্রেফ সাধু-সন্তই নন, রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁরা সক্রিয় কারক-শক্তিও বটেন। তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হবার সেই তো সুবিধেমত সুযোগ।

* * *

আগেই বলেছি, রোমান ক্যাথলিক ধর্মের দাবি, তাঁদের ধর্মসভায় যে অলৌকিক 'খাঁটি' বলে পরিগণিত হবে, সে ঘটনা ছাড়া অন্য কোন দিব্যদর্শন অথবা দৈববাণীকে তাঁরা খাঁটি বলে মানবেন না। এরই নাম জুলুম, কারণ আরো তো অনেক সম্প্রদায় আছে, যাদের ধর্মবিশ্বাস ওই পুরাতন এবং নূতন নিয়মের ভিত্তির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। কোটি কোটি সেই খৃস্টানদের কেউ তো কারুর চেয়ে আপনাকে ছোট বলে মনে করে না। তাদের সম্প্রদায়ের ভেতরও আলোকদর্শনের সত্যতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

রোমান ক্যাথলিক ধর্মের এই একগুঁয়েমি, আবার বলি, সমস্ত যুক্তি-তর্ক বিরুদ্ধ। মেথডিস্ট, ব্যাপটিষ্ট ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায় সেই একই নিয়ম-নীতি মেনে চলে, ক্যাথলিকদের নিয়ম-নীতি তাদের থেকে কোন অংশে আলাদা নয়, তাহলে এমনতর এক একগুঁয়েমি কেন ?

*　　*　　*

পয়গম্বর যোসেফ স্মিথ (১৮০৫-১৮৪৪) মর্মন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮২৩ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর রাত্রে তিনি এক দিব্য-দর্শন লাভ করেছিলেন।

> আমি ঈশ্বরের আরাধনায় নিমগ্ন ছিলাম, তখন আমার গৃহে একটি আলোক দেখিতে পাইলাম। সেই আলোকের দীপ্তি বৃদ্ধি পাইতে পাইতে দিবা দ্বিপ্রহরের দীপ্তির ন্যায় প্রখর উজ্জ্বল হইল। অতঃপর আমার শয্যা পার্শ্বে এক দেব-দূতের আবির্ভাব হইল। তিনি বাতাসে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহার পদদ্বয় ভূমি স্পর্শ করে নাই। তাঁহার পরিধানে অতিশুভ্র এক শিথিল বহির্বাস ছিল। ওইরূপ শুভ্র এবং উজ্জ্বল পার্থিব কোন বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহার বাহু এবং হস্ত উন্মুক্ত ছিল, পদদ্বয়েও গুল্‌ফ পর্যন্ত কোন আবরণ ছিল না, দেহে কোন অন্তর্বাসও ছিল না, কেননা তাঁহার বক্ষ উন্মুক্ত দেখিয়াছিলাম। তিনি আমার নাম ধরিয়া বলিলেন, তিনি মারোনি, ঈশ্বর তাঁহাকে দূত-রূপে প্রেরণ করিয়াছেন।......তিনি বলিলেন, সুবর্ণপত্রে লিখিত একখানি পুস্তক রক্ষিত আছে, তাহাতে এই মহাদেশ-বাসীদিগের উৎপত্তি এবং ইতিবৃত্তসংক্রান্ত সমস্ত তথ্য বিধৃত আছে, তদ্‌ব্যতীত সেই পূর্ব অধিবাসীদিগকে ঈশ্বর যে

সমস্ত উপদেশবাণী দান করিয়াছিলেন, তাহাও তাহাতে লিখিত আছে।……বার্তা ঘোষণা সমাপ্ত হইলে দেখিলাম সেই পুরুষের চতুর্দিকস্থ আলোকের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাইতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট ব্যতীত সমগ্র গৃহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অতঃপর দেখিলাম, সেই দেবদূত একটি আলোকরশ্মিতে আরোহণ করিয়া আকাশে অদৃশ্য হইয়া গেলেন এবং স্বর্গীয় আলোকের সেই দূত আবির্ভূত হইবার পূর্বে আমার গৃহ যেরূপ অন্ধকারমগ্ন ছিল, পুনরায় তদ্রুপ অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল।……

যে সব দিব্যদর্শন রোমান ক্যাথলিক ধর্মসভার অনুমোদনধন্য, তাদের থেকে এ দর্শনটির তফাত কোনখানে ? আরো দর্শন যোসেফ স্মিথ পেয়েছিলেন, সোনার পাতগুলো তাঁকে দেখান হয়েছিল, যা দেখে তিনি মর্মন পুঁথি, তথা মর্মন বাইবেল লিখেছিলেন ১৮৩০ সালে।

খৃস্টান মর্মন সম্প্রদায় যুক্তরাষ্ট্রের উটা প্রদেশের সল্ট লেকের ধারে বসবাস শুরু করে। তার আগে দীর্ঘদিন তারা মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর স্থাপন করেছে উটার মর্মন অঞ্চলের মধ্যমণি, সুজলা-সুফলা সল্ট লেক সিটি। আজ মর্মন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রায় সার্ধনিযুত। পৃথিবীর সর্বত্র তাদের বাস। তাদের আপন খৃষ্টীয় ন্যায়-নীতিই তারা মেনে চলে। সম্প্রদায় হিসেবে তারা এত ছোট নয় যে তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা চলে।

যোসেফ স্মিথের অলৌকিক সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাকে ভগবৎ প্রেরণা, তথা দিব্যদর্শন ছাড়া, বিশ্বাসযোগ্য আর কোন্ অভিধা দেওয়া যাবে ? কোন্ সে-অজ্ঞাত পর্বত কন্দরে স্বর্ণ পত্রে লিখিত মর্মন পুঁথি যোসেফ স্মিথ খুঁজে পেয়েছিলেন, তার হদিস এফ.বি. আই-ও (Federal Bureau of Investigation) জানে না,

অন্য কোন সুদক্ষ শ্যেন-চক্ষুরও তা অগোচর থেকে গেছে। কোন পুরাবিদ্‌ও সেখানে কোদালের একটা ঘাও দিতে যাননি। দিব্যদর্শন মারফতই স্মিথ পেয়েছিলেন সে গুপ্তধনের সন্ধান, যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল তাঁর ধর্ম। কেউ তার খবর জানতো না, তাঁর আগে কেউ যায়ওনি সেখানে যে সেই সতেরো বছরের ছেলেটিকে মানসিক শক্তি দিয়েও পথ দেখাতে পারে। তবু যুক্তিসংগতভাবেই বলা যেতে পারে, কোথাও কেউ একজন সে গোপন স্থানের খবর রাখতো, হয়তো সোনার পাতগুলিকে সে-ই রেখেছিল সেখানে। অজ্ঞাত সেই মহাপুরুষ তো স্মিথের সমসাময়িক ছিলেন না, তাই ও জায়গায় খোঁজার প্রেরণা এসেছিল, নিশ্চয় আমাদের গ্রহের বাইরের কোন মানুষের কাছ থেকে। হতে পারে, সে হয়ত এসেছিল এ পৃথিবীতে বেড়াতে কোন দূর অজানা অতীতে। তাছাড়া, আর কী ভাবে, আর কোথা থেকে আসবে সে প্রেরণা ? স্মিথের দিব্যদর্শনের রশ্মিজাল যারা নিক্ষেপ করেছিল দূরেক্ষণের ছবির মতন, ও-পাহাড়ে তারা নিশ্চয় কোনদিন পদক্ষেপ করেছিল। অন্ততঃ তারা তো তাদের জানাকে জানতে আমাদের প্ররোচিত করতে পারে, কারণ আজ 'ওব্দি আমরা যেটুকু জেনেছি আমাদের মনুষ্যজাতির সম্পর্কে, যেটুকু আবিষ্কার করেছি গোপন জ্ঞান সম্পর্কে, তারা যে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী জানে। স্মিথ ছিলেন গ্রহান্তরের মানুষের হাতের যন্ত্র মাত্র। এ ব্যাপারে যদি আর কোন ব্যাখ্যা আর কেউ দিতে পারেন, তাঁর কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকবো।

যে মর্মন পুঁথির উৎস দিব্যদর্শন, সে-পুঁথিতে ঘটনা, নাম এবং ভৌগোলিক তথ্যের যে বিরাট ঐতিহাসিক সত্য লিপিবদ্ধ আছে, তা সতেরো বছরের একটা নাবালকের জানার কথা নয়।

সব দিব্যদর্শনের মত এ-দর্শনেও 'কিছু' একটা ছিল। সেই

'কিছু'টারই অনুসন্ধান প্রয়োজন। সেই 'কিছু' নিশ্চয়ই নারকীয় শক্তির প্রদর্শন নয়, কারণ তার পরিণতি যে বাস্তব। আর তাহলে, পাদ্রীমশাইদের কথায়, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হত যে।

* * *

কুব্‌তি (Coptic) সম্প্রদায় মিশরের জাতীয় খৃস্টান ধর্মসম্প্রদায়। তার সভ্যসংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশি। আটষট্টি সালের ২রা এপ্রিল কাইরোর কাছে সাইতুনের কুব্‌তি গির্জের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পথিকরা দেখলো, গির্জের গম্বুজের ওপরে গোটাকতক সাদা পায়রার মত কিছু ভাসছে। তাদের দেহরেখা যেন হাওয়ার তৈরী, যেন আবছা কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে। সে-কুয়াশার ভৌতিক রূপান্তরণের ভেতর থেকে ফুটে উঠলো একটি মনুষ্যমূর্তি। মূর্তির ঔজ্জ্বল্য এত বেশি যে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। চোখ না কুঁচকে তার পানে চাইতে পারে না তারা। মূর্তিটিকে ঠিক অমনভাবেই দেখা গেল, পর পর আরো কয়েকটি সন্ধ্যায়।

কুব্‌তি প্রধান পুরোহিত, ষষ্ঠ কাইরিল্লস সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পুরোহিত, পণ্ডিত এবং সাধারণ সভ্যদের নিয়ে একটি সভা ডাকলেন। সে-সভায় যোগদানকারী হাজার হাজার মানুষ—কুবৎ, মুসলমান, হিন্দু, নানা সম্প্রদায়ের খৃস্টান, সব্বাই একবাক্যে বললো, গির্জের গম্বুজের ওপরে ঊর্ধ্ব আকাশে তারা একটি 'অপরূপ রূপবতী রমণী মূর্তি' দেখেছে, দেখেছে তাঁর দেহ হতে আলোক বিচ্ছুরিত হতে। সে আজ ছ'বছর আগেকার কথা। ১২ই এপ্রিল রোমাঞ্চ-সন্ধানী মিশরী আলোকচিত্রশিল্পী, ওয়াগিহ্ রিজ্‌ক্ মাত্তা আকাশে ভাসমান মেরীর মূর্তির প্রথম ছবি তুললেন। ১৪ই এপ্রিল সেই ছবি সাংবাদিক সম্মেলনে দেখালেন প্রধান পুরোহিত। তাতে দেখা গেল, অনির্ণেয়, অবর্ণনীয়, অত্যুজ্জ্বল এক শুভ্র মূর্তি গির্জের ছাদের ওপর দিকে তিনটে গম্বুজের সামনে ভাসছে। অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শী বললেন, 'অপরূপ

রূপবতী রমণী মূর্তি' তাঁরা দেখেছেন। সেই সংক্রান্ত একটি দলিলে তাঁরা সইও দিলেন।

*　　*　　*

আমি লূর্দ এবং ফাতিমায় গেছি। সারা মহাদেশ জুড়ে ঘোরবার সময় প্রতিটি তীর্থক্ষেত্র দেখেছি, সমালোচকের মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি সে সব তীর্থক্ষেত্রের পরিবেশ, পর্যালোচনা করেছি সেখানকার ইতিহাস। কিন্তু কোথাও কোন দিব্যদর্শন লাভের সুযোগ হয়নি, এমনকি, দিব্যদর্শনধন্য কোন পুরুষ অথবা রমণীর সঙ্গেও আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়নি। ইতিমধ্যে মামা রোজার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত নানা লেখা আমার টেবিলে জমতে শুরু করেছে। মামা রোজা নাকি দিব্যদর্শন লাভ করেছেন। আমার জ্ঞানের গলদ মেটাবার কি একটা সুযোগ মিললো?

চুয়াত্তর সালের ২২শে মার্চ ঈশ্বর-পরিত্যক্ত সান দামিয়ানোয় গেলুম। জায়গাটা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। রাস্তায় কোথাও পথনির্দেশক কোন চিহ্ন নেই। কীই বা দরকার তার? কোয়াত্রিনি পরিবারের বাড়ি সবাই চেনে। মামা রোজার বাস এবং ক্রিয়াকলাপ সেইখানেই (সান দামিয়ানো পিয়াচেন্‌ৎজার দক্ষিণে এবং মিলানের দক্ষিণে পিয়াচেন্‌ৎজা)। সব দেশের তীর্থযাত্রীর ভিড় এখানে। পাশের মাঠে গাড়ির গাঁদি আর তাদের নম্বর দেখলেই বোঝা যায়, হেন দেশ নেই যেখানে থেকে গাড়ি আসেনি। স্তোত্রপাঠের অবিশ্রান্ত একটানা সুর ভেসে আসছে একটা খোলা জানালা বেয়ে। তীর্থযাত্রীদের কণ্ঠেও সেই সুরের প্রতিধ্বনি।

দক্ষিণের দেয়ালটা উৎসর্গ-ফলকে ছাওয়া। 'মা মেরীর দয়া পেয়েছি', 'কঠিন রোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি', 'আবার আমি সুস্থ মানুষ', 'মাকে আমার শতকোটি প্রণাম', 'আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি'—যতগুলো ভাষা জানি, তার সব কটাতেই রয়েছে প্রার্থনা

পূরণের কথা। অলৌকিক সম্পাদনে মামা রোজা নিশ্চয়ই সিদ্ধহস্ত। আমি তাহলে ঠিক জায়গাতেই এসেছি!

উঠোনের একধারে দীর্ঘ সারিতে থাকে থাকে সাজানো লাল প্রদীপের আলো কাঁপছে। তাদের পেছনে একটা টেবিলে বড় বড় প্লাস্টিকের বোতলে ভরা সান দামিয়ানোর 'অলৌকিক বারি'। সে-বারি বিতরিত বিনাপয়সায়। মামা রোজার থানে কোন কিছু বিক্রি হয় না। গ্রামের দোকানে বিক্রি হয় কিছু স্মারক আর পূজোর সামগ্রী।

পাথরের বেদীর ওপরে মেরীর করুণাঘন পবিত্র মূর্তি, ফুলের মালা দিয়ে সাজানো, দুহাতে দুটি গোলাপ, দুষ্প্রাপ্য কোন জীবের মত লোহার জাফরি দিয়ে ঘেরা। ডানদিকে, আশ্রমের পেছনে পূজারীর সংরক্ষিত আসন। প্লাস্টিকের একটা নলের ভেতর খৃস্টের অন্তিম যন্ত্রণার প্রতীক চোদ্দটি ক্রুশ। এইখানে এবং মেরীর মূর্তির সামনে তীর্থযাত্রীরা নতজানু হয়ে বসে।

একটি মহিলা, পরনে বেঢপ পোষাক বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, আমার সামনে এলেন। ছবিতে যেমন দেখেছি, তাতে মনে হল, তিনি মামা রোজার বোন। বললুম, 'মাফ করবেন, আমি দূর সুইৎসার্ল্যাণ্ড থেকে আসছি, মামা রোজাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে'। 'না, না, সে এখন হতে পারে না, মামা রোজার এখন প্রার্থনার সময়।' 'তাতে অসুবিধে হবে না, আমি বরং দু'এক ঘণ্টা অপেক্ষা করি, কিম্বা যদি বলেন, আমি কাল সকালে আসতে পারি। আমি লেখক, দিব্যদর্শনসম্পর্কে আমার একটু কৌতূহল আছে, মানে, মামা রোজা যে ধরনের···।' ভদ্রমহিলা ঝাঁঝিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মামা রোজা কথা বলতে পারবেন না, তিনি অসুস্থ, সত্যিই তিনি অসুস্থ···'। আমি না-ছোড়। ঝট করে মনে হল, কিছু টাকা দিলে কেমন হয়। টাকায় তো ইতালির সব দরজা

খুলে যায়! না, টাকা দিতে যাইনি, অলৌকিক ঘটনার স্থলে কি ঘুষ কবুল করা চলে! কিন্তু—উপায়ও তো কিছু করতে পারছি না।

ওখানে যাবার আগে কাগজ-পত্তোর (২৩) পড়ে জেনেছি, সান দামিয়ানোতে কী ঘটতে পারে এবং অলৌকিকে বিশ্বাসী মানুষের কাছে মামা রোজার আকর্ষণ কেন?

· ১৯৪১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর। শ্রীমতী রোজা কোয়াত্রিনি বিছানায় শুয়ে যন্ত্রনায় ছটফট করছে, বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মত। পরের দিন তার হার্নিয়ায় অস্ত্রোপচার করা হবে। ইতিমধ্যে তার তিনটি ছেলে হয়েছে, তিনটিকেই বের করা হয়েছে পেট চিরে। বড়টি পিয়াচেন্‌ৎজার পাঠশালে পড়ে, ছোট দুটির দেখাশোনা করে পিসি আদিলি।

ঘরে চিরকালের অর্থাভাব। সেদিন অনেক কষ্টে হাজারখানেক লিরা জোগাড় হয়েছে। পিসি আদিলি রান্নাঘরে ব্যস্ত। সামান্য উপকরণ, তা দিয়েই শেষ করছে সেদিনকার রান্নাবান্না, এমন সময় এক তরুণী দরজায় ঘা দিলো, বললো, 'অলৌকিক-কর্মা পিতা পিও থাকেন সান গিওভান্নি রোতোন্দার সান্তামারিয়া দেল্লা গ্রাৎসিয়া গির্জেয়। সেখানকার জন্যে মুক্ত হস্তে দান করুন'। দুনিয়ার সব গরীব মানুষের মত পিসি আদিলির কাছেও টাকাকড়ি অতি 'পবিত্র বস্তু', তাই গেল রোজার মত নিতে। রোজা নির্দ্বিধায় আদ্দেক টাকা দিয়ে দিলো। রোগিনীকে কৃতজ্ঞতা জানাতে অপরিচিতা মেয়েটি এগিয়ে গেল রোজার বিছানার পাশে, বললে, 'উঠে দাঁড়াও না!' তারপর নিজেই তাকে টেনে নাবিয়ে দিলো বিছানা থেকে। দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, 'মা, তোমার রোগ সেরে গেছে'। রোজার মনে হল, তার ব্যথা যেন ফুসমন্তরে উবে গেল। অস্ত্রোপচারের আর প্রয়োজন হল না।

তরুণী তাকে পিতা পিওর কাছে যেতে বললে। অমন অলৌকিক নিরাময়ের পর সে খুশি হয়েই চললো পিতা পিওর কাছে, সান গিওভান্নি রোতোন্দায়। পিতা নাকি দূর থেকেও রোগ নিরাময় করতে পারেন। রোজাকে বললেন, 'সংসারের কাজের ফাঁকে যেটুকু অবসর পাবে, সেইটুকু সময় ব্যয় করো রুগ্নের সেবায়'। তারপর, সান দামিয়ানোর খামার বাড়ির জীবনের তিনটে বছর বয়ে গেল গতানুগতিক ধারায়।

চৌষট্টি সালের ১৬ই অক্টোবর শ্রীমতী কোয়াত্রিনি বাগানে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে গপ্পো করছিল, দুজনেই 'হঠাৎ' দেখলো, (হঠাৎই তো দেখবে !) একখণ্ড ছোট্ট অদ্ভূত মেঘ, যেন কুয়াশার একটা আস্তরণ কুলগাছের ডালপালা ঢেকে দিলো, তারপর অদ্ভুত সেই মেঘ ভাসতে লাগলো নাশপাতি গাছের ওপরে আর তার ভেতর থেকে দেখা দিলো উজ্জ্বল এক দিব্যমূর্তি, দুহাতে দুটি গোলাপ (থাকতেই হবে) আর মাথায় মুকুট। বায়বীয় সে-মূর্তি যেন ঘন হতে লাগলো ধীরে ধীরে, তারপর মূর্তি বললেন, 'আমি পৃথিবীকে সাবধান করে দিতে এসেছি, মানবজাতির শেষ-বিচারের দিন আসন্ন, অতএব তোমরা প্রার্থনা কর'। রোজা চালাক মেয়ে, জিজ্ঞেস করলে, 'আমার মত দীন-দরিদ্র মেয়েকে কে বিশ্বাস করবে, মা' ? মা পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন, 'ভয় নেই, আমি সংকেত পাঠাবো, নাশপাতি গাছে অসময়ে ফুল ফোটাবো' ! মূর্তি মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

অক্টোবর মাসেও গাছে এক ঝুড়ি নাশপাতি, কিন্তু কুঁড়ি ছিল না একটিও কোত্থাও। তবু গাছে ফুল ফুটলো, তাও একটা একটা করে নয়, সহসা যেন মুহূর্তে গাছ ভরে গেল ফুলে। পরের দিন আবার সেই অলৌকিক কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি, কুলগাছটাও ফুলে ফুলে ফুলঝুরি !

শরতের সেই ফুল ফোটার পর থেকে রোজা কোয়াত্রিনির কপালে

অলোকদর্শনের ঘাটতি ঘটেনি একদিনের তরেও। প্রায় প্রতি বৃহস্পতিবারেই মামা রোজা মা মেরীর সঙ্গে কথা বলে, পায় প্রত্যাদেশ। তাতে কখনও থাকে বিশেষ কোন ভাগ্যবানের মঙ্গল চিন্তা, কখনো বা কোন অবিশ্বাসীর অমঙ্গলের পূর্বাভাষ।

বেড়া ঘেরা ফলের বাগানে এবং বাইরের উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খামারবাড়ির বাতায়ন পথে ভেসে আসছে প্রার্থনার বাণী, 'ধন্য তুমি নারীকুলে, ধন্য তোমার গর্ভের সন্তান!' জাফরির সামনে দুটি ফরাসী পুরোহিত বসে আছেন সাড়ম্বরে, নতজানু হয়ে, যেন মা মেরীর মূর্তি পাহারা দিচ্ছেন।

পোপের দৃষ্টিতে মামা রোজার ক্রিয়াকলাপ কিছু সহজ নয়। প্রত্যক্ষস্বরূপ যে সব বাণী মেরীর কাছ থেকে সে পায়, তা পরস্পর-বিরোধী, সরল, কখনো বা পীড়াদায়ক, কখনো বা ত্রাসজনক। নথিপত্তর পড়ে মনে হয়, রোজার বাকচাতুরীর সবটাই ভগবৎ প্রেরণা-প্রসূত হতে পারে না। তবে, শোনা যায়, সান দামিয়ানোতে অলৌকিক নিরাময় ঘটে। আর শত শত লোক দুবার সেখানে সৌর-অলৌকিক দেখেছে।

যাজকসম্প্রদায় এ ব্যাপারে এখনো নীরব। সত্তর সালের নভেম্বরের ১৬/১৭ তারিখের 'ওসারভাতোরে রোমানো' পত্রিকায় পিয়াচেন্‌ৎজার পুরোহিত নিম্নলিখিত ঘোষণাটি প্রকাশ করেছিলেন,—

> প্রত্যক্ষস্বরূপ বাণী, প্রত্যাদেশ, দিব্যদর্শন এবং অলৌকিক ঘটনানিচয়ের কোন অতিপ্রাকৃত ভিত্তি নাই।…… রোজা কোয়াত্রিনি তাহার পুরোহিতকে মান্য করিতে অস্বীকার করিয়াছে। আমরা এতদ্বারা রোজা কোয়াত্রিনিকে বিধিমত জ্ঞাত করাইতে বাধ্য হইতেছি যে অতঃপর সে পবিত্র প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইবে এবং গির্জায় প্রবেশাধিকার পাইবে না।…সান দামিয়ানোর ভূতপূর্ব

> পুরোহিত, এদগার্দো পেল্লাচিনিকে পদচ্যুত করিবার সময় ধর্মীয় বিচারালয় আদেশ দিয়াছেন, তিনি যেন সান দামিয়ানোর তথাকথিত অলৌকিক ঘটনাবলীর সহিত সংস্পর্শ না রাখেন।...উপরন্তু, যাজক, অযাজক নির্বিশেষে সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে তাঁহারা যেন মা মেরীর দর্শন এবং বাণীসংক্রান্ত কোন সংবাদ প্রচার না করেন এবং ওই স্থানে গমনের কোন ব্যবস্থা না করেন, অন্যথায় আমরা তাহাদিগকে গির্জায় প্রবেশাধিকার হইতে এবং পবিত্র প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইব। অমান্যকারী পুরোহিতগণকে আরো সতর্ক করা যাইতেছে যে ধর্মের নামে তাঁহারা পদচ্যুত হইতে পারেন।

ছিপছিপে গড়ন একটি কাপুশিন সন্ন্যাসী আঙিনায় পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। অনেকক্ষণ থেকে তাঁর দিকে চেয়ে আছি, একসময় চোখে চোখ পড়ায় একটু মুচকে হাসলেন।

'আভে মারিয়া'র সম্মোহনী সুরের হাওয়ায় খামারবাড়ির আকাশ প্লাবিত।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করলুম। তখনো আশা, একবার মামা রোজার দেখা পাবো। মনে ভাবি, সন্ন্যাসী হয়তো সাহায্য করতে পারবেন। দেখে তো মনে হচ্ছে, উনি ঘরের লোক। 'না, শ্রীমতী কোয়াত্রিনির সঙ্গে আপনার দেখা হবে না, এখন ওঁর প্রার্থনার সময়। কোন্ কাগজে লেখেন আপনি? কী নাম বললেন আপনার?...না, কেউই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে না, কাউকেই উনি দেখা দেন না, মাদোন্নার সঙ্গে উনি কথা বলছেন।' আমি বললুম, 'রোম তো সান দামিয়ানোকে বেশ এড়িয়ে যাচ্ছে'। সন্ন্যাসী এমন ভাবে মাথা নাড়লেন যে মনে হল, বলতে চান, 'তা বটে তবে...'। অর্থাৎ বলতে চান, 'ওইটেই তো রোমের স্বাভাবিক রীতি, সব বলা, সব

কওয়ার পরেও অপেক্ষা করতে হবে বছরের পর বছর, কত বছর কে জানে’।

তাহলে যাজকীয় পর্যবেক্ষক এখানে বসে কী করছেন? অনেকক্ষণ থেকে তো তাঁকে দেখছি। বললেন তো, ভদ্রমহিলা মেরীর সঙ্গে কথা কইছেন, কিন্তু কী থেকে, কার কাছ থেকে, তিনি তাঁকে রক্ষে করছেন? ভদ্রমহিলার চারদিকে পাহারা।···শেষ পর্যন্ত দেখা করার আশা যখন ত্যাগ করলুম, তখনো শুনতে পাচ্ছি প্রার্থনার একটানা একঘেয়ে সুরে প্রাঙ্গণের আকাশ বাতাস মথিত।

পুরো দুঘণ্টা ধরে সে বাণী উচ্চারিত হয়ে চলেছে অবিরাম অবিশ্রান্ত, যেন ঘূর্ণমান কোন প্রার্থনা চক্র থেকে নিসৃত হয়ে চলেছে সে-প্রার্থনাবাণী।—হঠাৎ একটা কটু চিন্তা ভেসে উঠলো মনের পটে, কেউ কি টেপ বাজিয়ে চলেছে এক নাগাড়ে?

কাপুশিন সন্ন্যাসী ঠিকই বলেছেন, অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘ সুদীর্ঘ কাল ধরে, শতশত বর্ষ ধরে। তারপর আসবে সান দামিয়ানোর মামা রোজার স্বীকৃতি, উন্নীত হবেন, অভিষিক্ত হবেন মামা রোজা সাধু-সন্তদের সারিতে।

সাধু-সন্তদের নামের যদি কোন তালিকা থাকে তাহলে সে-তালিকার পাতার পর পাতা আমি উল্টে যাবো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, তারপর হয়তো···হয়তো দেখতে পাবো উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে মামা রোজার পূত পবিত্র নাম!

*　　　*　　　*

ঐতিহাসিক এবং সাধু-জীবনী লেখক ওয়ল্টার নিগ-এর (২৪) মত যাজকীয় পণ্ডিতবর্গ সাধু-সন্তদের উন্মেষ এবং অলৌকিক সংঘটনের উপযুক্ত জমি তৈরী করেছেন,—

> খৃষ্টীয় অস্তিত্বকে মূর্ত করেন সাধু-সন্তরা। ঈশ্বরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক তাঁরাই এবং ধর্মের পথে

> তাঁরাই আমাদের চালিত করেছেন। তাঁদের চেয়ে প্রাণবন্ত, তাঁদের চেয়ে সক্রিয়, প্রাণরসে পরিপূর্ণ আর কিছু নেই। তাঁরাই আদর্শস্বরূপ, ঈশ্বরকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন সর্বক্ষণ।

দিব্যদর্শনের বৈশিষ্ট্যমূলক ঘটনাবলীর সার সংক্ষেপ করেছি, তাদের শক্তি এবং সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে। লূর্দ সম্পর্কিত উপন্যাস 'বের্নাদেতের গান'-এর লেখক ফ্রান্‌ৎস ভের্ফেলের সঙ্গে এক মত হব কি? ভের্ফেল বলেছেন, 'বিশ্বাসীর কাছে ব্যাখ্যা দেওয়া অবান্তর আর অবিশ্বাসীর কাছে ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব'। সত্যিই কি তাই ?

একা খৃস্টান দেশসমূহেই এত দিব্যদর্শনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরই শতাব্দীতে এতগুলোকে নথিভূক্ত করা হয়েছে যে নানা পণ্ডিতের ওপর তাদের প্রভাব এবং তাদের সম্পর্কে পণ্ডিতকুলের যে বিচার তাতে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। প্রথম কথা, যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে, যা সংজ্ঞাতীত, অপরিমেয়, যার বাস্তব নথিভূক্তি অসম্ভব, তার অস্তিত্ব নেই। যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাপারটা যেন একটা অর্থহীন শ্রদ্ধার বস্তু, যার কথা কেউ উচ্চারণ করে না। মানুষের উচিত নয়, ব্যাপারটাকে এত সহজ করে নেওয়া। পাহাড়প্রমাণ নথিপত্তর ঘেঁটে বুঝেছি যে আধ্যাত্মিকভাবে দিব্যদর্শন ঘটেছে। আজ ১৯৭৪ সালের ১৭ই এপ্রিল আমি যখন লিখছি ঠিক এইক্ষণটিতেই পৃথিবীর কোথাও কেউ হয়তো দিব্যদর্শন লাভ করছে।

ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপগত কারণে কল্পনার ক্রিয়াশীলতা, পারিপার্শ্বিক, বংশমর্যাদা এবং জাগতিক প্রভাবসমূহসম্পর্কে অনুসন্ধান প্রয়োজন। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি যাঁদের, অপরিমেয় সবকিছুকে যাঁরা নস্যাৎ করেন, আধুনিক কালের গবেষণার সঙ্গে তাঁদের মত ঐকবদ্ধ নয়।

অলৌকিক সম্পর্কে অনেকে উৎসাহী হন, বোঝবারও চেষ্টা করেন,

কিন্তু সে শুধু ছুটো বুকনি দেবার জন্যে। গবেষণার প্রয়োজনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, দিব্যদর্শনসংক্রান্ত নবতর ঘটনা এবং সমস্যার উপস্থাপন, দৃঢ়তর মনের কাজ, আমার নয়।

অনুসন্ধান এবং যুক্তিসম্মত চিন্তাই দিব্যদর্শনের অনুমানাত্মক ব্যাখ্যা যোগাতে পারে, কিন্তু একটি জিনিস আমরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পারি, সে হল, দিব্যদর্শনের কোন্ কোন্ কারণগুলি পরিত্যজ্য। বাইবেল দিয়েই সে কাজের সূচনা হোক।

বাইবেলের ভেতরে কার কণ্ঠস্বর শুনি ?
সে কি সত্যিই ঈশ্বরের বাণী ?

নিজেদের খৃস্টান বলেন, পৃথিবীতে এমন লোকের সংখ্যা সহস্র-কোটিরও বেশি। কী সে বস্তু, ধর্মের গণ্ডির ভেতর যা তাঁদের বেঁধে রেখেছে ? এর জন্যে প্রয়োজন একটি সাধারণ ভিত্তির। সে-ভিত্তি বাইবেল, আগেও ছিল, এখনো আছে।

'বাইবেল' শব্দটির উৎপত্তি, গ্রীক 'তা বিব্লিয়া' শব্দ থেকে, তার অর্থ, 'পুস্তক'। আভিধানিক অর্থ, 'মহান পুস্তক, পবিত্র পুঁথিসংগ্রহ, খৃস্টানধর্মস্বীকৃত ঈশ্বরের প্রকাশ সম্পর্কিত পুঁথিসমূহের সঙ্কলন, ঈশ্বরের বাণী, এবং যাহা ধর্ম এবং জীবনের বন্ধন······'।

সে-পুঁথিসমূহের উপযুক্ত বিচার বাদ দিয়ে ধর্মসভা ঘোষণা করেছেন, বাইবেল 'ঈশ্বরের বাণী'।

বিনয়ী খৃস্টানের সরল মনে এবং কানে ব্রহ্মবাদীদের তৈলাক্ত মসৃণ জিহ্বানিসৃত এ ঘোষণা থেকে মনে হয়েছে, বাইবেল ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রেরণাপ্রসূত এবং/অথবা তা তাঁর সাক্ষাৎ বাণীরূপ। আর 'নূতন নিয়মের' ক্ষেত্রে তাকে বিশ্বাস করানো হয়েছে, নাজারেথের যিশুর সঙ্গীরা যিশুর বাণী, তাঁর জীবনের রীতি-নীতি, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী, সব টুকে নিয়েছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, তারপর লিখেছেন সে সবের পূর্ণ বিবরণ। বাইবেলকে তাই খৃস্টানরা মনে করে, প্রামাণ্য তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদনসমূহের সঙ্কলন। গয়েটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নূতন নিয়মের' অধ্যাপক, হান্স কন্ৎসেল্মান স্বীকার মানেন যে খৃস্টান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এখনো বজায় থাকার কারণ বাইবেলের সমালোচনামূলক সমীক্ষাসমূহের বেশির ভাগই তাদের অজানা। ব্যাপারটা খাঁটি খৃস্টান-নীতিসম্মত নয় বটে, কিন্তু কথাটা সত্যি।

বাইবেলকে যার প্রতিরূপ বলে বলা হয়, বাইবেল তা নয়. এমনকি ঈশ্বরের তৃতীয় বিভূতিকে (Holy Ghost) আগে যা মনে করা হত, এখন আর তাও মনে করা হয় না। আমি জানি, আমার ব্রহ্মবাদী সমালোচককুল অবাক মেনে বলবেন, 'আরে, ও কথা তো আমরা ভালো করেই জানি, ব্রহ্মবিদ্যাসংক্রান্ত বই-পত্তর খুললেই তো দেখতে পাওয়া যাবে'।

তাঁদের কথা ঠিক। কিন্তু ছোট, বড় সব গির্জেই সর্বসাধারণের এবং সর্বসাধারণের দ্বারাই পরিচালিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে-গির্জে তার নিত্যসঙ্গী। জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষণে তার অনুষ্ঠানাদির কারণে গির্জে 'অপরিহার্য'। ক্ষমতা প্রয়োগ করে গির্জে তার আপন সিন্দুক ভরে তোলে প্রকাশ্যে, তাই একথা বলা একান্ত অন্যায় যে (স্বীকৃত) বাইবেলীয় ধর্মমতের সমস্ত ত্রুটি (নিতান্ত সত্য বলে যা সাধারণ্যে প্রচারিত) ব্রহ্মবিদ্যা সংক্রান্ত সব গ্রন্থাগারের গ্রন্থনিচয়ে পাওয়া যাবে। তাছাড়া, সহস্রকোটি খৃস্টানের কজন সে সব গ্রন্থাগারের চৌকাঠ মাড়ান ?

*　　*　　*

মার্বুর্গের ফিলিপ্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, য়োয়াখিম কাল (১) বলেছেন,

> বেশির ভাগ খৃস্টানের অজ্ঞতার বড় কারণ হচ্ছে, ব্রহ্মবিৎ এবং যাজকীয় ঐতিহাসিকেরা সামান্য তথ্যই তাদের কাছে পরিবেশন করেছেন। তাঁদের গ্রন্থের অন্তর্গত লজ্জাজনক ঘটনাবলীকে তাঁরা দুভাবে ঢাকতে জানেন। হয় বাস্তবকে দুমড়ে মুচড়ে অবাস্তব করে দেখান, না হয়, তা গোপন করেন।

আমি বলি, দুটো পদ্ধতিরই উদ্দেশ্য, সরল বিশ্বাসীকে প্রবঞ্চনা করা।

ভুল ধর্মমত থেকে মুক্তি পাবার অধিকার সাধারণ মানুষেরও আছে। সে-মত যে অনেক কাল আগেই বাতিল হয়ে গেছে। ঈশ্বরের নামে এসব হয় বলেই সে দাবি করতে পারে, ব্রহ্মবিদ্যাগত জটিলতা এবং হেঁয়ালি বাদ দিয়ে সহজ, সরল, বোধ্য ভাষায় সত্য প্রকাশ করা হোক।

অখৃস্টান ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে ধর্মসভার সংবিধানে এবং ষষ্ঠ পোপ পাউলের ধর্মমতে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে,—

অব্যর্থ সত্য ঘোষণা করে একমাত্র ক্যাথলিক ধর্ম,
মুক্তির জন্য প্রয়োজন ক্যাথলিক ধর্ম,
ঈশ্বরীয় প্রতিশ্রুতির একমাত্র উত্তরাধিকারী ক্যাথলিক ধর্ম,
খৃস্টের আত্মার একমাত্র অধিকারী ক্যাথলিক ধর্ম,
অভ্রান্ত শিক্ষাদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে একমাত্র ক্যাথলিক ধর্মকে,
পরম সত্য একমাত্র ক্যাথলিক ধর্মের।

১৯৬৫ সালের ১৮ই নভেম্বরে ক্যাথলিক ধর্মসভা আনুষ্ঠানিকভাবে এবং একান্ত-আধিকারিকভাবে ঘোষণা করেছেন যে,—

ঈশ্বরই বাইবেলের 'স্রষ্টা',
বাইবেলের 'সমস্ত অংশ' পবিত্র,
বাইবেলের 'সমস্ত অংশের' রচনা ঈশ্বরের তৃতীয় বিভূতির প্রেরণা-প্রসূত,
বাইবেলের প্রত্যাদিষ্ট-প্রণেতাগণ 'যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার সমস্তই' ঈশ্বরের তৃতীয় বিভূতির দ্বারা লিখিত বলিয়া মানিতে হইবে এবং যে শিক্ষা বাইবেলে দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'সত্য, যথাযথ এবং নির্ভুল' বলিয়াও মানিতে হইবে।

ব্রহ্মবাদীরা, অর্থাৎ যাঁরা বাইবেল গবেষণার ফলাফল নিয়ে মাথা

ঘামান না, তাঁরা যাতে বিশ্বাসীদের কাছে তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিটি রক্ষে করতে পারেন, তার জন্যে নির্ভর করেন প্রচারক, যিশুশিষ্যবর্গের বাণী এবং পবিত্র পুঁথিসমূহের অলৌকিক 'মূল পাঠের' ওপর।

কিন্তু ভগবদ্বাণীর প্রচারকদের কেউ যিশুর সমসাময়িক ছিলেন না এবং তাঁর সমসাময়িক কেউই প্রত্যক্ষ সাক্ষীর বিবরণও লিপিবদ্ধ করে যাননি। ৭০ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট টাইটাস (৩৯-৮১খৃঃ) কর্তৃক জেরুসালেম ধ্বংস হবার আগে পর্যন্ত যিশু এবং তাঁর অনুচরবর্গ সম্পর্কে কিছুই লেখা হয়নি। এবং ৩০ সালকেই যদি ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যুবৎসর ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বাইবেলের প্রথম লেখক মার্ক তাঁর 'সুসমাচার' লিখেছিলেন, যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার অন্ততঃ ৪০ বছর পরে। বাইবেলের আধুনিক সংস্করণের সহ-অনুবাদক, ডাঃ য়োহান্নেস লেমান এ বিষয়ে বলেছেন,

> ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারকেরা ব্যাখ্যাকার, তাঁরা জীবনীকার নন। কালের প্রবাহে যা আবছা হয়ে এসেছে, তাতে তাঁরা আলোকপাত করেননি, বরং পরিষ্কার যেটুকু ছিল, সেটুকুকেও তাঁরা ঝাপসা করে ফেলেছেন। তাঁরা ইতিহাস লেখেননি, ইতিহাস রচনা করেছেন। ঘটনার প্রতিবেদন তাঁরা পেশ করতে চাননি, চেয়েছেন ঘটনার যাথাযথ্য প্রমাণ করতে।

ব্রহ্মবিদ্যাগত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজনে 'মূল পুঁথিসমূহ' হামেশা ওল্টানো হয়, কিন্তু মূল পুঁথির তো অস্তিত্বই নেই। কী তাহলে আমাদের হাতে আছে? আছে প্রতিলিপি, ব্যতিক্রমহীন ভাবে বলা যায়, যাদের উৎপত্তি চতুর্থ থেকে দশম শতাব্দীর ভেতরে। আর সে-প্রতিলিপি, যাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০, তারা প্রতিলিপিরও প্রতিলিপি, কেউ কারুর সঙ্গে মেলে না। গুণে দেখা গেছে,

৮০,০০০(!)-এরও বেশি অমিল আছে। মূল পুঁথিতে এমন একটি পাতাও নেই, যাতে অমিলের অভাব আছে। প্রতিটি বিভিন্ন প্রতিলিপিতে শ্লোকসমূহের বিভিন্ন অর্থ করেছেন দরদী লেখকেরা এবং সে-অর্থ হয়েছে সমকালীন প্রয়োজনমত।

বাইবেলের মূল পুঁথিসমূহে সহজে প্রমাণসম্ভব হাজার হাজার জানা ভুল আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা সিনাইটিকাস পুঁথি তার বড় প্রমাণ। ভাতিকানাস পুঁথির মত তাকেও পাওয়া গিয়েছিল সিনাই মঠে। তার ভেতর সংশোধন আছে ১৬,০০০ আর সংশোধকের সংখ্যা মনে হয়, অন্ততঃ সাতজন। অনেক জায়গায় তিনবার বদলানো হয়েছে, চতুর্থবারে সব কেটে দিয়ে চতুর্থ 'মূল পাঠ' বসানো হয়েছে। হিব্রু অভিধান প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর ফ্রীদরিখ দেলিৎশ্ (৩) দেখিয়েছেন, 'মূল পাঠে' নকলের ভুল আছে ৩০০০।

'মূল পুঁথির' এই কারবার ব্রহ্মবিদ্যাগত বর্ণনাশৈলীর একটি মহান লক্ষণ। 'মূল পুঁথি' বলতে, প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষ বোঝে সর্বপ্রথম অনুবাদটিকে, যা তর্কাতীত, অবিসম্বাদিত। যদি গির্জের চূড়ো থেকে ঘোষণা করা হয় যে ওই অর্থে মূল পুঁথির অস্তিত্ব নেই, তাহলে খৃস্টান অজ্ঞ-সাধারণ কী বলবেন?

বাইবেল 'ঈশ্বরের বাণী', এমন রূপকথাটি যে কেমন করে এতকাল, চললো, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।—সাত হাজার বছরের মানবেতিহাসে এর আর তুলনা নেই। যে-মূলপুঁথি পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে এবং মিথ্যাচারে ভরা, তাকে আজো চালানো হচ্ছে 'ঈশ্বরের বাণী' বলে। কী বলবো একে, চিত্তবিভ্রম? আমি জানি, মিথ্যাচার কথাটা কটু, কেননা মিথ্যাচারের অর্থ, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পথনির্দেশ ছাড়া আর কিছু নয়। খৃষ্টীয় সম্বতের সূচনায় ধর্মীয় নায়কেরাও স্বীকার মেনেছেন যে দোষীদের

সঙ্গে ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট করলেও 'মূল পাঠে' মিথ্যাচরণ করা হয়েছে। প্রক্ষেপ, নীতিচ্যুতি, কলুষ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নিশ্চিহ্নকরণ সম্পর্কে আজো তাঁরা খোলাখুলি আলোচনা করেন,—কিন্তু ওসব তো চুকে গেছে বহুকাল আগে, তবু সেদিনের মত আজকের চুলচেরা বিচারেও মিথ্যা যেমনআছে তেমনিই থেকে যায়, তার আর নড়চড় হয় না।

মিথ্যাচার সম্পর্কে কেউ কথা বলুক, খৃস্টান ব্রহ্মবাদীরা স্বাভাবিকভাবেই তা চান না। জালিয়াতদের তাঁরা আপন ডানার আড়ালে নিয়ে আলোচনায় বসেন 'সজ্ঞান পরিবর্তন' সম্পর্কে, তারপর তাদের মাথায় আশীর্বাদের গঙ্গাজল ছিটিয়ে, তুলসী পাতায় ঢেকে বলেন, ওরা যা করেছে, তা ঈশ্বরের সত্যবাণীর স্বার্থেই করেছে।

জুরিখের ডাঃ রর্বেৎ কেল (৪) এই মিথ্যাচার সম্পর্কে লিখেছেন,

> প্রায়ই দেখা যায় একই অংশের 'সংশোধন' একজন করিয়াছেন একটি বিশেষ অর্থে, তাহার পরেই আর একজন তাহার 'পুনঃ সংশোধন' করিয়াছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। এই সকল সংশোধন ঘটিয়াছে, আপন আপন সম্প্রদায়ের প্রয়োজনানুসারে, ফলে বিশুদ্ধ প্রথম পাঠের স্থান দখল করিয়াছে, নিখুঁত জগাখিচুড়ি এবং সেচ্ছায়, সজ্ঞানে, উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে যে সকল 'সংশোধন' করা হইয়াছে, তাহাদেরই কারণে বেশি পরিমাণে সৃষ্টি হইয়াছে এমন বিভ্রান্তিকর বিশৃঙ্খলার।

আর, পুরোহিত, জীন শোরের্ (৫), বহুকাল যিনি জেনিভার সন্ত-পিয়েরে গির্জের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁর সিদ্ধান্ত, বাইবেল যে ঈশ্বর-প্রেরণাপ্রসূত এবং তা যে ঈশ্বরপ্রণীত, এমন ধারণা যুক্তিসিদ্ধ নয়। সুস্থ মানুষের যুক্তিতে সে ধারণা তীব্র আঘাত

হেনেছে। খোদ বাইবেলেও সে ধারণা সম্পূর্ণ অসমর্থিত। সে ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকে অজ্ঞ ভগবদ্বাণী-প্রচারকেরা আর আঁকড়ে থাকে শিক্ষা-দীক্ষাহীন মূর্খ একদল মানুষ।

* * *

জুরিখ সংস্করণের মত বাইবেলের আরো কয়েকটি সাম্প্রতিক সংস্করণে অন্ততঃ স্বীকার করা হয়েছে যে পরবর্তীকালে কিছু সংযোজন ঘটেছে। কিন্তু যে প্রকাণ্ড ওলটপালট করা হয়েছে, তার কাছে এই সামান্য দ্বিধাপূর্ণ স্বীকৃতি কিছু নয়। বাইবেলের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে, ডাঃ রর্বেৎ কেল তাঁর 'আধুনিক মানুষের ধর্ম' (৬) নামক গ্রন্থে তার কিছু হদিস দিয়েছেন। নিচের উদ্ধৃতিটি থেকে তার কিছু মালুম হবে।—

> বাইবেলে বিশ্বাসী বেশির ভাগ মানুষের সরল স্বাভাবিক ধারণা এই যে আজিও তাহারা যাহা পড়ে তাহার সকলই বুঝি আবহমান কাল হইতে বিদ্যমান। তাহাদের বিশ্বাস তাহাদের আপন বাইবেলটিতে যত পরিচ্ছেদ, যত পংক্তি আছে, চিরকাল বুঝি তাহা সবই ঠিক এমনটিই ছিল। তাহারা জানে না, অবশ্য বেশির ভাগ মানুষ জানিতেও চায় না, যে প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া খৃস্টানদের 'পুরাতন নিয়ম' ব্যতীত অন্য কোন ধর্মপুস্তক ছিল না। 'পুরাতন নিয়ম'এর অনুশাসনগুলিও প্রাচীন খৃস্টানদের কালে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 'নূতন নিয়ম'এর লিখিত অনুবাদের প্রকাশ ঘটিয়াছে ধীরে ধীরে, কিন্তু 'নূতন নিয়ম'এর পুঁথিগুলিকে যে ধর্মপুস্তক হিসাবে লইতে হইবে, এমন কথা বহুকাল যাবৎ কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। তাহার পরে উপাসকমণ্ডলীর সম্মুখে সেই সব পুঁথির পাঠ ধীরে ধীরে প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু তখনও কেহ উহাকে

> ধর্মপুস্তকের মর্যাদা দেয় নাই, ভাবেও নাই কেহ যে 'পুরাতন নিয়ম'এর সহিত তাহাদিগকে সমমর্যাদার আসন দিতে হইবে। সমমর্যাদা দানের চিন্তা তখনই জাগিয়াছে যখন বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায় লিপ্ত হইয়াছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, স্বমত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে চাহিয়াছে একটি বাঁধাধরা নিয়ম। ধর্মপুস্তক হিসাবে বাইবেলে তাহাদের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়াছে এই ভাবে, প্রায় দ্বিতীয় শতক হইতে।

অস্যার্থঃ, কোন আত্মার প্রেরণায় বাইবেল রচিত হয়নি, এমনকি ঈশ্বরের তৃতীয় বিভূতিরও তাতে কোন হাত ছিল না। 'ঈশ্বরের বাণীর' আবির্ভাব ঘটেছে যেন কোন গোপন ষড়যন্ত্রের ভেতর দিয়ে। ওইটিই ঘটনা। তার চেয়ে ভাল হত, জগৎজোড়া যে সমস্ত সংগঠন, চরম এবং পরম সত্যের রক্ষক বলে নিজেদের প্রচার করেন, তাঁরা যদি ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বিচারকে শুধু ভাষাগত খুঁটিনাটির ভেতর সীমাবদ্ধ না রেখে, সাধারণ্যে দুর্বোধ্য বস্তুনিচয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হতেন। তাঁদের পক্ষে উচিত কাজ হত, পয়লা সারির একটা জন-সংযোগ সংস্থার সাহায্য নিয়ে 'সাধারণ মানুষের' কাছে সহজ-বোধ্য ভাষায় প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করা! তাঁদের প্রত্যয়ের মূলে কি সাহসের বনেদ নেই? নাকি, তাঁদের 'ব্যাবসার' ভিত্তি নড়ে যাবে? অথবা, প্রমাণিত সূত্র অনুযায়ী বাইবেল ঈশ্বরের মুখনিসৃত বাণী হতে পারে না বলে স্বীকার মানলে তাঁদের 'সীমাবদ্ধ সংঘের' মূলধনে ঘাটতি দেখা দেবে? ধর্মীয় মাতব্বরেরা আর কতকাল এ ভুল পথ মাড়াবেন? ধার্মিক মানুষকে কতকাল আর খৃস্টান বিনয় এবং সারল্যের আওতায় আটকে রাখতে পারবেন? ভগবৎ-প্রেরণা, মুক্তি ইত্যাদির বুলি আউড়ে অসঙ্গতি এবং মিথ্যাচারকে কতকাল আর ভগবদেচ্ছা বলে চালাবেন? সত্যকে যদি এইভাবে ঢেকে রাখা হয়, তাহলে জ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার কী সম্পর্ক? এতৎ সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে

শিক্ষার একটি বিশেষ বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা এবং সে-বিভাগ পরিচালিত হয় করদাতাদেরই পয়সায় আর, সে করদাতারা নিজেদের খৃস্টানই বলে থাকেন। আমার ধারণা, এসব বিভাগে ব্রহ্মবিদ্যার ছাত্রদের বিজ্ঞানসম্মত বিশুদ্ধ জ্ঞানই পরিবেশন করা হয়। কিন্তু তত্ত্বগত শিক্ষা এবং মন্দিরের বেদীর ওপর থেকে দেওয়া শিক্ষার মাঝে আসল বস্তুটির কী পরিণতি ঘটে ? মস্তিষ্কধৌতি কোথায় ঘটে, যার ফলে ঘটনা ডুবে যায় স্মৃতির অতলে আর বাইবেলের পুরোন স্তোত্র হয় বেদীর ওপর থেকে ঈশ্বরের বাণীরূপে ধ্বনিত ?

* * *

এ সবের শুরু প্রবীণ যাজকদের ধর্মীয় রীতি-নীতি সংক্রান্ত আলোচনা সভায়। যাজকশ্রেণীতে ভর্তি হবার প্রাথমিক শর্ত, যাজকপদপ্রার্থীকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন হতে হবে। অতএব, এমন সব বিশিষ্ট সদস্য যে সভা অলঙ্কৃত করেন, সে সভায় ঈশ্বরের সর্বব্যাপী সক্রিয় তৃতীয় বিভূতির উপস্থিতিও অবধারিত।

প্রাচীন খৃস্টান দুনিয়ার প্রথম পাঁচটি সার্বভৌম ক্যাথলিক ধর্ম-সভায় নতুন ধর্মের নীতি এবং নিয়ম নির্ধারিত হয়েছিল। আজো প্রচলিত সেই প্রাচীন ধর্মমত ঘোষিত হয়েছিল, নাইসিয়াতে ৩২৫ সালে, কনস্তান্তিনোপলে ৩৮১ সালে, এফিসাসে ৪৩১ সালে, কালসিদনে ৪৫১ সালে এবং আবার কনস্তান্তিনোপলে ৫৫৩ সালে। সে সব সভার উৎপত্তি, তাদের উদ্দেশ্য এবং কেমনতরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হত সেখানে, সে সব এক নজর দেখে নিতে মন্দ লাগবে না।

প্রথম সার্বভৌম ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় নাইসিয়াতে। সে সভা আহ্বান করেছিলেন সম্রাট কনস্তান্তিন। (বেচারা মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করার আগে রাজ্যে অভিষিক্ত হতে পারেননি।) সে সভা আহ্বান করার কারণ, রোম সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করার জন্যে তিনি

চেয়েছিলেন, দ্রুত বর্ধমান এবং প্রভূত সম্ভাবনাময় খৃস্টান ধর্মকে কাজে লাগাতে। সভার জন্যে কনস্তান্তিন যখন ৩১৮ জন যাজককে আহ্বান করেন, তখন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিগত শক্তির লড়াই, সেখানে ধর্মালোচনা ছিল নেহাতই গৌণ ব্যাপার। এমন কি 'ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন' যাজকদেরও সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, কেননা সে সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন সম্রাট নিজে এবং পরিষ্কার কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছাই ধর্মীয় বিধান। সম্রাট মুকুটহীন হওয়া সত্ত্বেও প্রবীণ যাজকেরা তাঁকে মেনে নিয়েছিলেন 'বিশ্ব পুরোহিত' বলে এবং ধর্মমত প্রণয়নে তাঁকে ভোটদানের অধিকারও দিয়েছিলেন, অযাজকীয় রাজা হিসেবে। অমন বিস্ময়কর জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সমন্বয় সেই দূর অতীতেও ঘটেছিল তো!

যিশুর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে কনস্তান্তিন কিছুই জানতেন না। তিনি ছিলেন 'মিত্রের' ধর্মে বিশ্বাসী (মিত্র=ইরানীদের আলোকের দেবতা, সূর্য দেবতা)। সেকালের মুদ্রায় অঙ্কিত থাকতো সূর্যদেবতার মূর্তি, নিচে লেখা থাকতো 'অজেয় সূর্য'। মিত্রপূজা খৃস্টধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার অনেক কাল পরেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীক শহর বাইজান্তিয়ামকে পরিবর্তিত করে স্বনামে কনস্তান্তিনোপ্‌ল নাম দিয়ে যখন রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে রূপান্তরিত করলেন, তখন নগর উদ্বোধনের স্মৃতিতে বিশাল একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন। স্তম্ভশীর্ষ শোভিত ছিল, সম্রাট এবং অজেয়-সূর্যের মূর্তি দিয়ে, খৃস্টান বিনয়ের নামগন্ধও কোথাও ছিল না। তাঁর সম্মানে ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায় সেদিন শহরের বাতাস কুয়াশাচ্ছন্ন, মশালের আলোয় আলোকিত নগরের পথ-ঘাট মানুষের মিছিলে প্লাবিত। 'আপন প্রতিবেশীকে ভালোবাসো' নীতি অনুযায়ী ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ করার পরিবর্তে সম্রাট ঘোষণা করেছিলেন, কোন ক্রীতদাস খাবার

চুরির দায়ে ধরা পড়লে, সীসে গলিয়ে তার গলায় ঢালা হবে আর, প্রয়োজনে বাপ-মায়েরা ছেলে-মেয়ে বিক্রি করতে পারবে।

ধর্ম এবং রাজনীতির কোন্ কোন্ সিদ্ধান্তে সম্রাটের হাত ছিল, সে কথা জানা দরকার।

নাইসিয়া-সভার আগে পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ার আরিউসের মতবাদই প্রচলিত ছিল এবং সর্বজনমান্য ছিল। সে মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর এবং যিশু এক নন, তবে এক রকম। কনস্তান্তিন ধর্মসভাকে ঘোষণা করতে বাধ্য করান যে ঈশ্বর এবং যিশু একই আত্মার প্রকাশ। ধর্মমতের অমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন সাধিত হয়েছিল রাজাজ্ঞায়। অমনি করেই যিশু এবং ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন হয়েছেন। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই যাজকেরা 'নাইসীয় মতবাদকে' সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন।

অখৃস্টান কনস্তান্তিন খৃস্টধর্মের আর একটি বড় উপকার করেছেন। সেই দিনটি পর্যন্ত কেউ জানতো না, যিশুকে কোথায় সমাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু 'ঐশ্বর প্রেরণাপ্রাপ্ত', ঈশ্বরের সঙ্গে সম্প্রতি একাত্ম সম্রাট আবিষ্কার করে ফেললেন যিশুর সমাধি ৩২৬ সালে। (৩৩০ সালে কনস্তান্তিন প্রতিষ্ঠা করেন 'পবিত্র সমাধির গির্জা'।) কিন্তু অমন অত্যাশ্চর্য পবিত্র আবিষ্কারের পরে, ওই বছরেই কয়েকটি অতি নিকট আত্মীয়ের রক্তে হাত রাঙাতে দ্বিধা করেননি তিনি। স্ত্রী ফাউস্তিনা এবং পুত্র ক্রিসপাসকে ফুটন্ত গরম জলে চুবিয়ে মেরেছিলেন, শ্বশুর মাক্সিমিয়নকে করেছিলেন কারারুদ্ধ, বাধ্য করেছিলেন আত্মহননে।

এই হল সম্রাট তথা ধর্মাবতারের আসল রূপ। নাইসীয় ধর্মমতের ইনিই 'ব্যবস্থাপক'। সভাশেষে একটি ঘোষণা-পত্রে তিনি সমস্ত খৃস্টান সম্প্রদায়কে জানালেন, ৩১৮ জন পুরোহিতের ঐকমত্য, 'ঈশ্বরেরই সিদ্ধান্ত'।

আর, হ্যাঁ, মহান কনস্তান্তিনকে সন্ত পর্যায়ভুক্ত করেছিল আর্মানী, গ্রীক আর রুশী ধর্মসভাত্রয় !

দ্বিতীয় অখিল ক্যাথলিক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় কনস্তান্তিনোপলে। আহ্বায়ক ছিলেন সম্রাট প্রথম থিয়োডোসিউস। নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে তিনি কনস্তান্তিনের চেয়ে কমতি ছিলেন না। ইতিহাস বলে, দরিদ্র পীড়নে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি, সাধারণ মানুষের মাথায় করের যে বোঝা চাপাতেন, তা অসহনীয় তো ছিলই, উপরন্তু সে কর আদায় করতে তাঁর তসিলদারেরা যে অত্যাচার চালাতো, তাকে পাশবিক ছাড়া আর কিছু বললে কম বলা হবে। তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেনি এমন লোককে আশ্রয় দিলে, গোটা গ্রামটাকেই কোতল করে ফেলতেন। এমনি ছিল রাজাজ্ঞার বহর। ৩৯০ খৃস্টাব্দে, অর্থাৎ ধর্মসভার দশ বছর পরে থেসালোনিকার রাজপথে ভয়াবহ এক রক্ত-গঙ্গা বইয়েছিলেন তিনি, সাত হাজার বিদ্রোহী নাগরিককে নির্মম ভাবে হত্যা করে। সে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, সেই যে বছর গির্জেয় গির্জেয় 'হালেলুইয়া' (ধন্য ঈশ্বর) ধ্বনি চালু হয়। খৃস্টান ধর্মমতকে থিয়োডোসিউস রাষ্ট্রধর্ম বলে ঘোষণা করেন, আমব্রোসিউসকে মিলানের পাদ্রী নিযুক্ত করেন এবং অখৃস্টান সমস্ত মন্দিরকে করেন ধূলিসাৎ। যিশু যদি দরিদ্র এবং নিপীড়িত জনগণের কাছে আনন্দের বাণী প্রচার করে থাকেন, তাহলে কিন্তু বলতে হয় থিয়েডোসিউস নিজে প্রকৃতিগতভাবে যিশুবিরোধী। তা হোক, তবু তিনিই আহ্বান করেছিলেন দ্বিতীয় ধর্মসভা কনস্তান্তিনোপলে।

সে-সভায় কী হয়েছিল জানেন? পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার সমন্বয়ত্রয়ীকে খৃস্টান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সেখানে। ধর্মের সঙ্গে এই ভাবে যুক্ত ত্রিত্ববাদ আজো সম্মানিত।

তৃতীয় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় এফিসাসে, আহ্বায়ক ছিলেন পূর্ব এবং পশ্চিম রোমের সম্রাটদ্বয়, দ্বিতীয় থিয়োডোসিউস এবং তৃতীয়

ভালেন্তিয়ান্নুস। ধম্মকম্মো নিয়ে কোনকালে তাঁরা মাথা ঘামাননি, তাঁদের ধম্মো ছিল অষ্টাদশ ব্যসন, তাই সে সভাকে একবার দর্শন দিয়েও ধন্য করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় থিয়োডোসিউস ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, নিজের মজলিস-মহফিল আর নিষ্ঠুর অত্যাচারে আদায় করা খাজনা নিয়েই তিনি খুশি। ফলে তাঁর ক্ষমতালোভী বড় বোন, পুলকেরিয়া যে তাঁকে পুরোপুরি কব্জা করে রাখবেন, এ আর বেশি কথা কি। কিছুকাল তিনি ভায়ের প্রতিনিধিত্বও করেছেন। সর্বত্র গর্ব করেছেন নিজেকে কুমারী বলে, লোকে অবশ্য আড়ালে হাসাহাসি করেছে, কিন্তু তাতে কি ? তারপর আবার, তাঁরই পবিত্র ভৎর্সনায় তাঁকে সন্ত পর্যার্যভুক্তও করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর ভায়ের মৃত্যুর পর ভায়ের সার্থক এবং উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, ক্রিসোফিউসকে হত্যা করাতেও তাঁর পূত পবিত্র, সন্ত-হস্ত কুণ্ঠিত হয়নি। আর পশ্চিম রোমের সম্রাট ভালেন্তিয়ান্নুস তো ছিলেনই তাঁর মা, গাল্লা প্লাসিদিয়ার হাত-তলায়, পরে খুনও হয়েছিলেন।

এফিসাসের ঘটনা।

এফিসাসের ধর্মসভা ঘোষণা করেন, মেরীকে যিশুর মা বলে পূজো করতে হবে। থিয়োডোসীয় পুঁথির অন্তর্ভুক্ত করে সে সিদ্ধান্তকে রাজকীয় আইনে পরিণত করা হয়। এমনি করে একটির পর একটি ঘটে গেছে, এবং সর্বত্র নাকি উপস্থিত থেকেছেন ঈশ্বরের তৃতীয় বিভূতি।......

চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কালসিদনে, আহ্বায়ক ছিলেন বাইজান্তিয়ামের সম্রাট মার্সিয়ান্নুস (৩৯৬-৪৫৭), কিন্তু ঠিক মত বলতে গেলে, সে সভা আহ্বান করেছিলেন কুমারী পুলকেরিয়া। থিয়ো-ডোসিউসের মৃত্যুর পর তিনি সম্রাট মার্সিয়ান্নুসের গলায় মালা দিয়েছিলেন। তার প্রয়োজন যে কী ছিল, তা পুরোহিতদের চেয়ে

তিনিই ভালো জানতেন। ব্রহ্মবিৎ, এডুয়ার্দ্ শ্ভার্ৎস্‌এর (৭) সিদ্ধান্ত বহু খৃস্টান সম্প্রদায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে পুলকেরিয়া সভার কাজ পরিচালনা করেছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় হস্তে।

কালসিদনের ঘটনা।

পোপ প্রথম লিও তাঁর ধর্মমত-সংক্রান্ত পত্রে (Epistolia Dogmatica) ধর্মমত সম্পর্কীয় যে সূত্রের অবতারণা করেন, তাতে বলেছেন, যিশুর তুটি প্রকৃতি ছিল। সভা ঘোষণা করে যে যিশুর ভেতরে মানব এবং দৈব প্রকৃতি বিশুদ্ধ এবং অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল। 'কালসিদনীয় মতবাদ' নামে পরিচিত সেই দ্বৈতপ্রকৃতি আজো স্বীকৃত। আর সবচেয়ে বড় কথা, সে-মতবাদ রক্ষার ভার অর্পিত হয়েছিল পোপের হাতে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রোমের প্রাধান্য। ভবিষ্যৎ শক্তির ভিত্তিকে আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা এমনিভাবেই দেওয়া হয়েছে। পোপীয় প্রাসাদের মানুষদের আজ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত অশুচি পুলকেরিয়ার কাছে, কেননা কালসিদনের মহাসভায় তাঁর চক্রান্ত সফল না হলে আজ এমনটি হত না।

পঞ্চম মহাসভা বসলো আবার কনস্তান্তিনোপলে। আহ্বায়ক ছিলেন পূর্ব রোমের সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ানুস (৪৮৩-৫৬৫ খৃঃ)। শাসক হিসাবে তিনিও কম স্বৈরাচারী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও, না বলে বলি, সেই কারণেই পত্নী থিয়োডোরার খেয়ালের পুতুল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। রাজকার্যে স্বামীর প্রতিনিধি, সার্কাস কর্মচারীর কন্যা, থিয়োডোরা, স্বামীর মঙ্গলই চেয়েছিলেন। 'নিকা'র বিদ্রোহের কালে, সম্রাটের অত্যাচারে মানুষ যখন ক্ষেপে গিয়েছিল, তখন সিংহাসন সামলে ছিলেন ওই থিয়োডোরাই। অমন একটি বিরাট কর্ম সম্পাদনে কৃতকার্য হওয়া বড় কম কথা নয়। এর পর তিনি তাঁর খেয়ালের লাগাম আরো ঢিলে করেছেন, উদ্বৃত্ত অখৃস্টান

সম্প্রদায়গুলির উচ্ছেদ-সাধন মানসে। এ কাজে সভার প্রধান পুরোহিতকুল তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন, সাহসও জুগিয়েছেন।

পঞ্চম মহাসভায় পুরোহিতকুলের করণীয় কিছুই ছিল না। সম্রাট জাস্টিনিয়ানুস মনের সব সাধই পূরণ করে নিয়েছিলেন অনেক আগেই, সরকারী ঘোষণা এবং আইন মারফত। ব্রহ্মবাদী পুঁথিপত্রে যে সে-সভাকে 'সম্বর্ধনা সভা' বলা হয়েছে, সে কিছু কম ঠাট্টা করে নয়।

পোপ ভিজিলিউসকে (৫৩৭-৫৫৫ খৃঃ) জাস্টিনিয়ানুস ডেকে পাঠালেন কনস্তান্তিনোপলে। ভিজিলিউস এবং পুরোহিতসমাজ সম্রাটের রাজনৈতিক ইচ্ছের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। অমন মানুষও ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছেন! কারণ অবশ্য একটা আছেই, সে-কারণ বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে তাঁর আইন প্রণয়ন। যে-কেউ খৃস্টান ধর্মমত অস্বীকার করেছে, সে-ই, তন্মুহূর্তেই চিহ্নিত হয়েছে, বিরুদ্ধমতবাদী বলে এবং তার বরাতে জুটেছে পৈশাচিক নিগ্রহ, মৃত্যুও জুটেছে কখনও কখনও! একদল কর্মচারীর কাজই ছিল ঘুরে ঘুরে বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের খুঁজে বের করা, তারপর রাজার আদেশ মত তাদের গরু-তাড়ানো করে নিয়ে গিয়ে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা।

বাইজান্তিয়ামের অধিবাসী, ঐতিহাসিক প্রোকোপিউস (৪৯০-৫৫৫ খৃঃ) জাস্টিনিয়ানুস সংক্রান্ত, 'পারসিক, ভাণ্ডাল এবং গথদের বিরুদ্ধে জাস্টিনিয়ানুসের যুদ্ধ' নামক গ্রন্থের প্রণেতা। আরো একটি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছিলেন, জাস্টিনিয়ানুসের প্রাসাদসমূহ সম্পর্কে। ওইটুকুই সব নয়, আরো একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, জাস্টিনিয়ানুস এবং তদীয় পত্নী, থিয়েডোরার গুণাবলী ব্যক্ত করে। সম্ভবতঃ প্রোকো-পিউস তাঁর সম্রাটকে ভাল করেই চিনতেন, তাই জাস্টিনিয়ানুসের বর্ণনা দিয়েছেন, দম্ভী, কপট, পাপিষ্ঠ, নিষ্ঠুর এবং রক্তপিপাসু বলে।

ইতিহাসের খৃস্টান ব্যাখ্যাকারেরা প্রোকোপিউসের বর্ণনাকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে যান। তা তো যাবেনই, খৃস্টধর্ম যে সম্রাট কনস্তান্তিন এবং থিয়োডোসিউসের মত তাঁকেও মহিমান্বিত করেছে!

সে সভার ঘটনা।

গ্রীক খৃস্টান লেখক, অরিগেন ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার নবদীক্ষিতদের পাঠশালার শিক্ষক। প্রাচীন খৃস্টানদের ভেতর তিনি একজন খুব বড় ব্রহ্মবিৎ এবং বাইবেল সমালোচকদের পুরোধা পুরুষ। তাঁর খাঁটি আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুণে, রূপকের মাধ্যমে ব্যাখ্যার সাহায্যে ধর্মপুস্তকগুলো তবু একটু বোধ্য হয়েছে, হয়েছে সংস্কৃত। প্রচলিত ধারা থেকে যেখানেই তিনি সরে গেছেন, ধর্মসভা সেখানেই তাঁর নিন্দে করেছেন, বলেছেন অরিগেনের বাইবেল ব্যাখ্যা প্রচলিত ধারাবিরোধী। ভবিষ্যৎ প্রচলিত ধারা কী হবে, কেমন হবে, অবিসম্বাদিতভাবে তা ঠিক করে দিয়েছেন ঈশ্বরের তৃতীয় বিভূতি-প্রণোদিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। মহাসভা যখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন অরিগেনের অগণিত শিষ্যই শুধু নির্যাতিত হননি, 'খেদাড়েরা' বিরুদ্ধবাদীদের খুঁজেও ফিরেছে সর্বত্র।

(সেই সময় থেকে পুরোহিতেরা যে আংটি পরেন, সে-আংটি ধর্মের সঙ্গে তাঁদের 'মিলনের' অভিজ্ঞানস্বরূপ। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের তৃতীয় বিভূতির এ এক বিচিত্র 'বিবাহ'।)

* * *

বাইবেল 'ঈশ্বরের বাণী' নয়। তাছাড়া প্রথম পাঁচটি মহাসভায় কয়েকজন ধর্মধ্বজী সম্রাটের উদ্ভাবিত ধর্মমত ঐশ্বর-প্রেরণাপ্রসূতও নয়,—সম্রাটেরা নাকি ঐশীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন,—তা সত্ত্বেও নয়। ধার্মিক মানুষের কাছে এ সংবাদ তীব্র আঘাতসম কারণ সে তো এর জন্য প্রস্তুত নয়। কী রইলো তাহলে?

যিশু সম্পর্কে সত্যি কথাটা তাহলে কী? তিনি কি সত্যিই

ছিলেন কোন কালে ? আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সত্যিই কি তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত মৃত্যু বরণ করেছিলেন ? 'নূতন নিয়মে' লিপিবদ্ধ বাণী কি সত্যিই তিনি প্রচার করেছিলেন ? যদি সে-বাণী তাঁর মুখনিঃসৃত না হয়, তাহলে 'মূল পুঁথির' প্রতিলিপির ১৫০০ প্রতিলিপির উৎস কোথায় ? কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছিল। যতজন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের ভেতর মাত্র একজনের এতবড় ব্যক্তিত্ব সম্ভবে না। এর পেছনে অনেক চতুর মস্তিষ্ক কাজ করেছে।

নাজারেথের যিশু সম্পর্কে হাজারো বই আছে। আধুনিকতম গবেষণার ভিত্তিতে যিশু সম্পর্কিত নতুন কাহিনী প্রকাশ করেছেন য়োহান্নেস লেমান (৮), জোয়েল কার্মাইকেল (৯) এবং রুদল্ফ আউগস্তাইন (১০)। যিশু সম্পর্কিত এই সব প্রচলিত ধারাবহির্ভূত ব্যাখ্যাতাদের ব্রহ্মবাদীরা স্বভাবতঃই ভালো চোখে দেখেননি, প্রতিবাদও করেছেন। কিন্তু আউগস্তাইনের 'মনুষ্যপুত্র যিশু' নামক গ্রন্থ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রুদল্ফ পেশ্ এবং গুয়েন্তের স্তাখেল (১১) যে সমস্ত অপহ্নুতি ঘটিয়েছেন, সে সব বিশ্লেষণ করলে চিরাচরিত ধারাটিকেই চিনতে পারা যায়, য়োআখিম কালের ভাষায় তা 'ছদ্মবেশ'।

খৃস্টান ব্রহ্মবাদীরা যিশুর ধর্মমতকে মেনে নিয়েছেন অবিসম্বাদিত সত্য বলে, অপ্রমাণিত বিবৃতি (১২) বলে। আমার কাছে তা অসঙ্গত ঠেকলেও মেনে নেওয়া যায়, কারণ যিশুর নামে না চালালে যে সারা দুনিয়ার হাজার হাজার গির্জের হাজার হাজার পাদ্রীর চাকরী যাবে, ব্যর্থ হয়ে যাবে তাদের আপন অস্তিত্বের প্রশ্ন। সত্যি কথা বললে প্রার্থনা সভার শেষ সারির শেষ মানুষটিকেও তাঁদের বলতে হবে, নাজারেথের যিশু 'ঈশ্বরের পুত্র' নয়, বলতে হবে, যিশু নিজেও কোনদিন অমন কথা বলেননি। কিন্তু গির্জের কর্তাদের

কাছে অমন ঘোষণা আশা করা আর আকাশের চাঁদ চাওয়া,, এক কথা। তাহলে আসল যিশুর পরিচয়টা কী?

রুদল্‌ফ্‌ আউগ্‌স্তাইন প্রশ্ন করেছেন, '...যিশু যা ছিলেন না, তাঁকে সেইভাবে চিত্রিত করার কী অধিকার খৃস্টান ধর্মের আছে? যে ধর্মমত তিনি প্রচার করেননি, কোন্‌ অধিকারে তাকে তাঁর ধর্মমত বলে প্রচার করেন? কোন একটি মাত্র সংস্থাকে তিনি যে উত্তরাধিকার দেননি এবং ঈশ্বরেও যিনি তাঁর পিতৃত্ব আরোপ করেননি, কোন্‌ অধিকারে ধর্মীয় প্রধানেরা সে উত্তরাধিকার দাবি করেন, দাবি করেন সে অসত্যকে সত্য বলে?

দীক্ষিতদের কাছে আমার এ সব কথা কিছু নতুন কথা নয়। আমার এ নিবেদন অজ্ঞ-সাধারণের কাছে, ব্রহ্মবিদ্যার দুর্বোধ্য বাগাড়ম্বরের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন, বোঝেনও না তার অর্থ। সাধারণ-বোধ্য ভাষায় পেশাগত অনুবাদের ভার আর একবার আমার কাঁধে তুলে নিয়েছি। জানি, কী পরিমাণ কড়া চাবুক খৃস্টান পণ্ডিতেরা এ কারণে আমার পিঠে হাঁকড়াবেন, তা হাঁকড়ান, পিঠ আমার যথেষ্ট চওড়া। অবনতমস্তকে মেনে নেওয়া আমার স্বভাবে নেই।

ব্রহ্মবিৎদের জ্ঞানের কথা হাজার হাজার বইয়ে ছাপা হয়েছে, পৃথিবীর নানা গ্রন্থাগারে সে সব পাওয়া যাবে। আমার কথা যাতে পাঠক বুঝতে পারেন তাই গোড়া থেকেই শুরু করছি।

* * *

আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর আগে জীবনের পথে বয়ে নিয়ে চলবার জন্যে খৃস্টানের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এক অসহনীয় বোঝা। সে বোঝা 'আদি পাপের' বোঝা। জন্মমুহূর্ত থেকেই সে ভার চেপেছে তার দুর্বল স্কন্ধে। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন সীমাহীন শক্তিশালী এক মুক্তিদাতার।

বাইবেলের ভেতরে কার কণ্ঠস্বর শুনি ?

গির্জেয় আর পাঠশালে জেনেছি, সর্ববস্তুর প্রারম্ভেও ঈশ্বর, অন্তেও ঈশ্বর। শুরু এবং শেষ তিনিই। সর্বশক্তিমান, অসীম মঙ্গলময় তিনি, ন্যায়ের অধীশ্বর তিনি, সর্বত্র বিরাজমান, অনন্ত, সর্বজ্ঞ তিনি।

এ পর্যন্ত ঈশ্বর-কল্পনা নিখাদ, নির্দ্বিধায় মেনে নিই সবটুকু। কিন্তু ঈশ্বর যদি অনন্ত হন, তাহলে তিনি কালাতীতও বটেন। সর্বত্র বিরাজমান, অনন্ত ঈশ্বরকে তাঁর কৃতকর্মের পরিণতির প্রতীক্ষায় থাকার প্রয়োজন নেই। তাঁর কাজের ফল কী হচ্ছে, তা জানার দরকার তাঁর নেই, কেননা পরিণতির কথা তো তাঁর আগে থেকেই জানা আছে।

ক্যাথলিক পাঠশালায় বসে বসে শুনতুম, ঈশ্বরের অপার করুণার কথা। যে স্বর্গে আনন্দ ছাড়া নিরানন্দের ছায়াটুকুও নেই, সেই স্বর্গে তিনি থাকতে দিয়েছিলেন, তাঁর প্রিয় আদম আর ইভকে। কোন অভাব তাদের ছিল না, ছিল না প্রয়োজন, কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষাও ছিল না তাদের। প্রিয়তম জীবদের ওপর শুধু একটি মাত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন তিনি,—জ্ঞানবৃক্ষের ফল তারা খাবে না। 'নিষিদ্ধ এলাকা'র দৃষ্টান্ত বোধ হয় এইটিই প্রথম!

সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের ওই কঠিন নিষেধাজ্ঞায় হতবাক্ হয়ে যাই। কেন তিনি অমন আজ্ঞা জারি করলেন? পৃথিবীর প্রথম মানুষের শিশু-উদ্যানে কি তিনি একটু মজা দেখছিলেন? মহত্তম, সর্বোত্তম তিনি, তিনি কি মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ভাগ নিতে পারতেন, যে আনন্দ, যে উচ্ছ্বাস আদম আর ইভ উপভোগ করতো স্বর্গোদ্যানে? কেন তিনি তাঁর প্রথম সৃষ্ট মানুষের কাছ থেকে জ্ঞানকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন?

ব্রহ্মবিৎদের পকেটে এর একটা জবাব আছে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন তাদের 'প্রেমদান করতে', চেয়েছিলেন তারা তাঁর রাজ্যের 'অংশীদার হোক'। দোহাই ধর্ম! ওই ব্যাখ্যায় মনে হয়,

ঈশ্বর হয়তো ভালোবাসার কাঙাল ছিলেন···নিশ্চয় তাঁর খুব একলা লাগতো। কিন্তু আমার ধারণা, অমন 'লাগা' ঈশ্বরে মানায় না, কারণ সর্বশক্তিমান তিনি, তাঁর চেয়ে সীমাহীন আনন্দের অধিকারী আর কে আছে? 'একটু ভালোবাসা পেলে বেশ হত', কিংবা 'একলা একলা আর ভাল্লাগে না, একটা সঙ্গী পেলে মন্দ হত না' গোছের চিন্তা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বর সম্পর্কে অসম্ভব।

এরও জবাব আছে ব্রহ্মবিৎদের আস্তিনের আড়ালে! আদম আর ইভকে প্রলোভনে ঠেলে দিয়ে ঈশ্বর তাদের পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় ভদ্রমহোদয়গণের জ্ঞাতার্থে বলি, ও কথাও ধোপে টেঁকে না। ঈশ্বর সম্পর্কে কেমনতরো হীন ধারণা তাঁরা পোষণ করেন? 'প্রলোভন,' 'পরীক্ষা' ইত্যাদি তো নেহাত খেলো লোকের কাজ, প্রলোভনের পরিণতির কথা, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের আগেই জানার কথা। ধরা যাক, ছেলে-মেয়ে দুটি প্রলোভনে পা দিলো না,— আপেল খেলো না। যদি লজ্জাকর নগ্নতা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান না জন্মাতো এবং সেই সঙ্গে যদি না জাগতো সন্তানোৎপাদনের চিন্তা, কেমন হত তাহলে? ঈশ্বর কি তাহলে একের পর এক মানুষ তৈরী করে যেতেন কলের মতন? কে এমন স্বাধীন চিন্তাসম্পন্ন মানুষ আছে, যে ঈশ্বরের নিষেধ সত্ত্বেও জ্ঞানের অন্বেষণে সচেষ্ট হবে না? ঈশ্বরের হিসেবে এ 'পতন' স্বাভাবিক ভাবেই ধরা ছিল, তিনি যে সর্বজ্ঞ। না হলে, অতিপ্রজতার কারণে পৃথিবীর এমন ফেটে পড়ার অবস্থা হত না।

আদম এবং ইভ হঠাৎ আপেল পাড়েনি, পাড়তে প্রলুব্ধ করার লোক ছিল সেখানে (শয়তান অথবা সাপ)। কিন্তু সমস্ত সৃষ্ট-বস্তুই তো এসেছে ভগবানের হাত থেকে। অন্ততঃ, সেই কথাই তো আমরা শিখেছি। অতএব, ন্যায়সঙ্গতভাবে শয়তানও (অথবা সাপ) ভগবানের সৃষ্টি। আমাদের মঙ্গলময় ঈশ্বর কি এমনই নীচ যে, দুটো নিষ্পাপ

অজ্ঞানকে প্রলোভিত করার জন্য শয়তান অথবা সাপকে সৃষ্টি করবেন ? এবং সেই নিরামিষ ফলটি ভক্ষণ করায় ঈশ্বর এমনই ক্ষুব্ধ হলেন যে সেই থেকে তাঁর পৃথিবীর মানুষের মাথায় চাপিয়ে দিলেন এক অনপনেয় কলঙ্কের বোঝা ? আবার বলি, তিনি তো আগেই জানতেন কী ঘটবে।

ব্রহ্মবাদীরা আমার হাত চেপে ধরে বলবেন, না, না, ব্যাপারটা অমনতরো হয়নি ! ঈশ্বরের রাজত্বে শয়তান, লুসিফার ছিল ধর্মত্যাগী। স্বর্গরাজ্যে ধর্মত্যাগী ? যে-স্বর্গ সুখের আকর (আমাদের তো সেই কথাই বলা হয়েছে), সেখানে তো বিরোধী, বিদ্রোহী অথবা ধর্মত্যাগী থাকতে পারে না। যদি থাকে, স্বর্গ তাহলে সুখের আকর নয়। ঈশ্বরের রাজ্যে যদি নিখাদ সুখের প্রতিশ্রুতি থাকে, তাহলে লুসিফারের সেখানে ঈশ্বরকে অমান্য করার মতলব নিশ্চয় জাগতে পারে না। আর, যদি সেখানে পরম সুখ না থাকে, তাহলে তেমন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার মত সর্বশক্তিমত্তা ঈশ্বরের ছিল না। ব্রহ্মবাদী-দের এ সিদ্ধান্তেও কিছু গলদ আছে। হয়, তাঁরা ঈশ্বর এবং শয়তানের বিবাদের কথা বাদ দিতে পারেন না, না হয়, তাকে ন্যায়সঙ্গত বলে চালাতেও পারেন না। লুসিফার স্বর্গবাসী আদম এবং ইভকে প্রলুব্ধ করতে যাবার আগে ঈশ্বর নিশ্চয় জানতেন যে তার শয়তানি কার্যকর হবে। আর, আদম-ইভের 'স্বাধীন ইচ্ছা'র ব্যাপারটা ভগবানের এক ধরনের কারসাজি হয়েই থাকছে, এমন কি লুসিফারের অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও, সাপ, আদম, ইভ সবাই চালিত হয়েছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছেয় এবং নির্দেশে।

মানুষ যা শিখেছে, তাকে যদি সেই মতই ধরে নেয়, ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াবে এই রকম। —ঈশ্বর পুরোপুরি পরিণত স্বর্গে বাস করতেন না, কারণ সেখানে একটা বিরোধীদল ছিল। স্বর্গে নষ্টামি শুরু করে লুসিফার প্রলুব্ধ করেছিল আদম এবং ইভকে পাপ করতে।

ঈশ্বর জানতেন, কী ঘটতে চলেছে। তারপর, আপেল খাওয়া হল। এরপর ব্যাপারটা উঠলো চরমে। (সর্বজ্ঞ) ঈশ্বর এত ক্রুদ্ধ হলেন যে রাগের চোটে বিবাহিত প্রথম নর-নারীর নিরীহ, নিষ্পাপ সন্তান-সন্ততিদের অভিশপ্ত করলেন চিরতরে, দেগে দিলেন এমনভাবে, যে বংশ বংশ ধরে 'আদি পাপের' জঘন্য উত্তরাধিকার তাদের বয়ে বেড়াতে হবে। তারপর থেকে যত মানুষ জন্মেছে, সবাই বয়ে নিয়ে চলেছে 'আদি পাপের' সেই দুর্বহ বোঝা জন্মমুহূর্ত থেকে।

সে বোঝা থেকে কেমন করে মুক্তি পাবে বেচারা দুর্বল মানুষ? বাইবেল বলছে, 'ঈশ্বর পৃথিবীকে এত ভালোবাসতেন যে তাকে তিনি দান করেছিলেন তাঁর একমাত্র ঔরসকে।.....'

যদিও একটি সপরিবার একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের কল্পনা করা একান্ত দুঃসাধ্য, তবু বড় রকম সমালোচনায় না গিয়ে মানুষ মেনে নিয়েছে এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা পুত্রটিকে। অমন একটি পুত্রকে হিংসে করতে ইচ্ছে হয়। অমন করুণাময় স্বর্গাধিপ যাঁর বাপ, তাঁকে হিংসে করবো না তো করবো কাকে? অন্ততঃ সেই কথাই মনে হয়, কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আদি পাপের ভারে জর্জরিত মানুষের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁর পার্থিব ভ্রাতা-ভগ্নীদের তিনি ভার-মুক্ত করতে পারেন। ঈশ্বরের সেই পুত্রকে রক্তাক্ত মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে অসীম যন্ত্রণায়। 'একমাত্র ঔরসের' মৃত্যুর পর আবার ঈশ্বর তৃপ্ত হয়েছেন! এ গল্পের, এ বীভৎস গল্পের উৎস নিশ্চয় নিষ্ঠুর বর্বরের ধর্মচিন্তা। প্রায়শ্চিত্তের এই ধারণা, আমার মনে হয়, আদিম ধর্মে প্রত্যাগতি, যে ধর্মে ক্রুদ্ধ দেবতার সন্তুষ্টি বিধান করতে রক্ত দান করতে বাধ্য হত সে ধর্মের অনুগামীরা।

ব্রহ্মবাদীরা আশ্বাস দেন, ক্রুশে বিদ্ধ করার ব্যাপারটাকে প্রতীক হিসেবে ধরতে হবে। বেশ তো, তাহলে সে কথা পরিষ্কার করে শেখানো হয় না কেন? আমার মেয়ে লীলা তার পাঠশালে শেখে

(আবহমান কাল থেকে যা শেখানো হয়ে আসছে), রক্ত-মাংসে গড়া ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যিশুও মানুষের মতন সমস্ত যন্ত্রণা (গুরুভার আদি পাপ) ভোগ করেছেন। মানুষের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার বিরুদ্ধে মানুষেরই মতন সংগ্রাম করেছেন, মৃত্যুও বরণ করেছেন মানুষের মতন। কিন্তু, আদম আর ইভের পাপের কারণে (যে পাপের সংঘটন ঈশ্বর আগেই বন্ধ করতে পারতেন অনায়াসে) জেনে-শুনে আপন পুত্রকে যন্ত্রণা ভোগ করালেন কেন ? আর, অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে সে-পুত্রকে যারা হত্যা করেছে, তাদের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন ঘটে কেমন করে ? (এ গল্পের ওই ভয়ঙ্কর পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই আদি পাপের চির-নির্বাসন হওয়া উচিত ছিল এ পৃথিবী থেকে। কিন্তু তা হয়নি. সে পাপের পূর্ণঘট আজো বসানো রয়েছে একই ভাবে।)

ব্রহ্মবিৎদের মগজ অনেক কল্পনার আকর, দার্শনিক বিচার-বিবেচনাতেও তাঁরা যথেষ্ট পটু এবং সঙ্কট এড়াতেও সম্প্রতি তাঁরা একটি পথ আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে পথও শেষ হয়েছে একটা কানাগলিতে।

আজ তাঁরা বলেন, পরমেশ্বর পৃথিবীকে এত ভালোবাসেননি যে তার জন্যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে বলি দিয়েছেন, আসলে যিশু নিজেই আত্মোৎসর্গ করেছেন, স্বেচ্ছায়, মানুষকে ভালোবেসে। দুঃখের বিষয়, ভোল পাল্টেও সুবিধে বিশেষ হল না।

পরমেশ্বর এবং যিশু, পিতা এবং পুত্র, এক এবং অভিন্ন, অচ্ছেদ্য, পরম পবিত্র। এই হল খৃস্টান ধর্মমত (নাইসীয় এবং কালসিদনীয়), তাই এঁদের কে কী করলেন, তাতে কিছু যায় আসে না। যে দিক থেকেই দেখা হোক, আত্মবলি অর্থহীন। প্রচলিত ধর্মমত অনুযায়ী, পিতা এবং পুত্র গোড়া থেকে এক ছিলেন এবং এখনো আছেন। অতএব, একটি বিশেষ সময়ে কী ঘটবে, তা তাঁরা দুজনেই জানতেন।

কিন্তু, যেহেতু অসঙ্গতি এতে দূর হয় না, তাই ধর্মগুরুরা একটি—শেষ (?) ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। যিশু মানুষকে দেখাতে চেয়েছিলেন, কেমন করে, কী ভাবে, তারা পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান করবে।

এ ব্যাখ্যা কি আবার আমাদের সেই আদি বিন্দুতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না? সমগ্র মানবজাতিরই যদি 'ঈশ্বরের প্রিয়' হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, তাহলে তো তাঁর আপন ইচ্ছা মোতাবেক একটা পরিকল্পনা করা উচিত ছিল, যাতে আমাদের আদি পিতামাতা, আদম এবং ইভ সেই রকমই হয়। সে কাজ তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন ছিল না। তাই নয় কি?

আদি পাপ এবং তার প্রায়শ্চিত্ত সত্যিই একেবারে ভিত্তিহীন, যুক্তির ধোপে নিশ্চয়ই টেঁকে না।

খৃস্টান ধর্মের স্বার্থেই বলি, রক্তদান এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মুক্তি লাভ, ধর্মমত হিসেবে বিপজ্জনক। প্রথম যুগের ধর্মসভাগুলিকৃত ধর্মমত ধর্মবিরোধীদের চরম দণ্ড দিতেই কাজে লেগেছে, সেইগুলোই হয়েছে ধর্মীয় বিচারসভার অনুষ্ঠেয় আচরণবিধি। এ আজো আছে। গুপ্ত সম্প্রদায়সমূহের মুক্তিকামী সভ্যদের বলি দিয়ে, তথা জঘন্যভাবে হত্যা করে তাদের পুরোহিতকুল ভাবে, 'ভগবানকে তুষ্ট করলুম'।

* * *

যিশু ছিলেন ইহুদি। জন্ম-তারিখ অজ্ঞাত। জন্ম-তালিকার কোন নথিতে তাঁর নাম নেই, তবু খৃস্টান প্রতীচী তার পঞ্জিকা গড়ে তুলেছে যিশুর একটা মন-গড়া (এবং স্বীকৃত) জন্মবৎসর থেকে। যিশুর নাম প্রথম পাওয়া যায় প্রচারক সন্ত পলের চিঠি-পত্রে, নতুন সম্বতের প্রায় ৫০ সাল নাগাত।

সন্ত ম্যাথু এবং সন্ত লুকের 'সুসমাচার'-মতে, যিশুর জন্ম বেথলিহেমে। সন্ত মার্ক কিন্তু বলেছেন, তাঁর জন্মস্থান নাজারেথ।

মুক্তিদাতার জন্মকাল থেকে বিভ্রান্তি এবং বিরুদ্ধমতের কারণে বাইবেল পাঠ বিপজ্জনক।

যিশুর মা বলে মেরী সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর পিতা, সূত্রধর যোসেফ তাঁর জনক নন, কেননা ঈশ্বরের তৃতীয় বিভূতির সহায়তায় মেরী ঈশ্বরের বীজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তারই কারণে তাঁর 'নিষ্পাপ গর্ভসঞ্চার' ঘটেছিল। এই হল প্রচলিত খৃস্টান-বিশ্বাস। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে এমনতরো গর্ভসঞ্চারের ব্যাপার বোধগম্য হয় না। তাই বিশেষভাবে আলোকপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদেরা অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে বোঝান, 'নিষ্পাপ গর্ভসঞ্চার' কী বস্তু।

প্রচলিত জীবনীগ্রন্থ, 'নূতন নিয়ম' অনুযায়ী জন্মের পরমুহূর্ত থেকে শিশু-যিশু বেপাত্তা। তারপর একেবারে বারো বছর পরে হঠাৎ দেখা যায়, এক কিশোর মঠে বসে পণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্মসম্পর্কিত উত্তপ্ত আলোচনায় মত্ত। দুঃখের বিষয়, আজ আমাদের জানবার কোন উপায় নেই, কোন্‌টি সত্যিই ঠিক আর কোন্‌টি ভুল, কোন্‌টি আসল ঘটনা আর কোন্‌টি কূটকৃৎদের আবিষ্কার।

তা যদি সত্যি হয়, অবশ্য সত্যি বলেই ধরে নিচ্ছি যে বারো বছরের ছেলেটি যদি মঠের পণ্ডিতদের মুগ্ধ করে থাকে, তাহলে সেই অকালপক্ক বালকটিকে সমসাময়িক কোন টোলে নিশ্চয় 'পুরাতন নিয়মে' অভ্যস্ত করে তোলা হয়েছিল।

কিন্তু কেমনতরো টোলে সে গিয়েছিল, ইতিহাস খুঁজে দেখা যাক, কোন হদিস পাওয়া যায় কি না।

আজ যাকে 'নিকট প্রাচ্য' বলি, সে জায়গা সে সময়ে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দামাস্কাস অধিকার করেছিলেন বিখ্যাত অধিনায়ক, পম্পেইউস মাগ্নাস ৬৪ খৃস্টপূর্বাব্দে, জেরুসালেম অধিকৃত হয়েছিল ৩৭ খৃস্টপূর্বাব্দে এবং মিশর রোমের অধিকারে আসে ৩০ খৃস্টপূর্বাব্দে। সেই শতাব্দীতে ওই সব বিজিত এবং অধিকৃত

স্থানসমূহে কেইউস জুলিয়াস সীজারের বরাতে যা ঘটেছিল, তা কারুর অজানা নয়, ইতিহাসের কুয়াশার আবরণে সে সব ঢাকা পড়েনি। বিজয়ী সেনারা বোধ হয় সব কালেই ওইরকম। যাই হোক, রোমবাসী তাদের আপন রীতি-নীতি, সংস্কৃতি চালিয়েছিল অধিকৃত অঞ্চলসমূহে। রোম-সেনারা কিছু সাধু-মহাপুরুষ ছিল না। গ্রীকদের কাছ থেকে নেওয়া কাব্য, সঙ্গীতের চর্চা করেছে তারা, তাদের যৌবনের দেবতা আপোলোর পূজো করেছে, বাক্কাসের স্মরণে উজাড় করেছে সুরাপাত্র। লক্ষ্মী, ফর্চুনার দ্বারস্থ হয়েছে সৌভাগ্য কামনায়, করুণা প্রার্থনা করেছে বজ্র, বিদ্যুৎ এবং ন্যায়ের দেবতা জুপিটারের কাছে, বরুণদেব নেপচুনের কাছে কামনা করেছে বৃষ্টি, ভক্তিগদগদ চিত্তে নতজানু হয়েছে সূর্যদেবতা সলের সামনে। যে কোন গোঁড়া ইহুদির কাছে এ সবই ঘৃণ্য, জঘন্য!

চারশো বছরেরও বেশিকাল ইহুদিদের জীবনধারা পরিচালিত হয়েছে মোজেসের অনুশাসন, 'পেন্টাটুক' এবং 'তোরা' অনুযায়ী ('পুরাতন নিয়ম' এবং 'তালমুদে'র অন্তর্গত সমগ্র ইহুদি ন্যায়-নীতির সংকলন, পেন্টাটুক এবং তোরা)। 'তোরা' সংকলিত করেছিলেন এজরা, সুদূর ৪৪০ খৃস্টপূর্বাব্দে। গোষ্ঠীপতি মোজেস তাঁর অনুশাসনে বলেছেন,

আমা ব্যতিরেকে তোমার অন্য কোন দেবতা না থাকুক।

তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না।

উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না।

তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না এবং তাহাদের সেবা করিও না, কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর। —(যাত্রাপুস্তক ২০, ৩-৫)।

মোজেস ছিলেন একেশ্বরবাদী। ইহুদি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ১২৩০

খৃস্টপূর্বাব্দ নাগাত যখন তিনি ইস্রায়েলীদের মিসর থেকে প্যালেস্টাইনে ফিরিয়ে নিয়ে যান, তখনি তিনি বিধি-বিধান সমন্বিত পৌরাণিক ফলকনিচয় সিনাই পর্বতের ওপরে স্থাপন করেছিলেন। অতএব, রোম যখন বহু-ঈশ্বরবাদ প্রচার শুরু করে, ইহুদিদের ভেতর এক ঈশ্বরের পূজো এবং একেশ্বরবাদ তখনি একটি প্রচলিত প্রথা।

ইহুদিরা তখন নিরুপায়, রোমের প্রচারের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি তারা। সশস্ত্র দখলদার রোমবাহিনীর সঙ্গে একসঙ্গে বাস করতে তারা বাধ্য হয়েছে দাঁতে কুটো নিয়ে। অবশ্য, আমার ধারণা, ইহুদিদের তারা বলেওনি, বাধ্যও করেনি, তাদের দেবতাদের পূজো করতে বরং তারা বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল, ইহুদিদের খানিকটা স্বায়ত্তশাসন দিয়ে। অবশ্য একথা সত্যি যে মঠের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল রোমসেনাদেরই হাতে, কিন্তু তার পরিচালন ভার ন্যস্ত ছিল ইহুদিদের হাতে। মঠের সম্মুখ প্রাঙ্গণে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ভালোভাবেই চলতো, দোকান-পশার সবই ছিল সেখানে।

এত কথা বলার কারণ, রোমের আধিপত্যের কালে, তথা যিশুর কালেও 'তোরা'-ই ছিল ইহুদিদের একমাত্র ধর্মমত, আর সে মত প্রচলিত ছিল ৪৪৩ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে।

মোজেসের বিধানের রক্ষক এবং শিক্ষক ছিল রক্ষণশীল দল (Sadducee)। যিশু হয়তো তাদেরই কোন পাঠশালায় পড়েছিলেন।...সাদ্যাসিদের বিরোধী ছিল ফারিসিরা, তথা প্রগতিশীলরা। মোজেসের বিধানের মূল সূত্রের তারা অনুসারী হলেও, তাদের শিক্ষায় মৃতের পুনরুত্থানে এবং দেবদূতদের অস্তিত্বে তারা বিশ্বাস করতো। শাস্ত্রব্যাখ্যাতা এবং ধর্মগুরু হিসেবে যিশুর কালে বিধান-বিদ্যালয় সমূহের ওপর এবং ধর্মের ওপর তারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যিশুর শিক্ষার দ্বিতীয় সম্ভাব্য বিদ্যালয় এদের মাঝে হওয়াও বিচিত্র নয়।

যিশুর উপদেশগুলি অনুধাবন করলে দেখা যায়, তিনি রক্ষণশীল অথবা প্রগতিশীল, কারুর সঙ্গেই একমত ছিলেন না। ইহুদি শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতাদের তিনি বরং ঠাট্টাতামাশাই করতেন। 'নূতন নিয়মও' বলে, তারাও সেই অকালপক্ক যুবকটিকে তাদের একজন বলে মানতো না। কিন্তু যিশু যদি রক্ষণশীল অথবা প্রগতিশীল দলের কোন বিদ্যালয়ের স্নাতক হতেন, তাহলে হয় তারা তাঁকে স্বীকৃতি দিতো, না হয় ধর্মত্যাগী বলে তাড়িয়ে দিতো, তাদের সম্প্রদায় থেকে। তেমন কোন খবরই আমরা পাইনি। ইহুদি লেখকদের কোন লেখাতেই বেথলিহেম অথবা নাজারেথের যিশুর কোন উল্লেখ নেই। বিতর্কিত যিশু সম্ভবতঃ আর কোথাও শিক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু, কোথায়? তৃতীয় কোন পাঠশালা কি ছিল? •ছিল, তবে তার কথা অনেককাল আগেই মানুষ ভুলে গেছে।

৬৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কট্টর গোঁড়া 'এসীন' সম্প্রদায় (প্যালেস্টাইনের এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়) ইহুদিদের পূজো-পাঠ থেকে নিজেদের স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত মঠ-জীবনে। সে মঠ ছিল মরুসাগর তীরের পাহাড়ের এক ফাটলে, খির্বেৎ কুমরানে। সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রাচীনতম প্রতিবেদন পাওয়া যায়, আলেকজান্দ্রিয়ার ফাইলো জুদাইউসের (২৫ খৃঃ পূঃ—৫০ খৃঃ) নিবন্ধ থেকে (১৪)। নিচের উদ্ধৃতিটি সেখান থেকেই নিয়েছি,—

> প্যালেস্টিনীয় সীরিয়ায় নানা ইহুদি জাতের এক বিরাট সম্প্রদায়ের বাস। তাহাদের মধ্যে প্রায় চারি সহস্র লোকের এক সম্প্রদায়ের নাম 'এসীন'। আমার ধারণা, শব্দটি গ্রীক শব্দোদ্ভূত না হইলেও, 'পবিত্রতা' শব্দের সহিত ইহার যোগ আছে। এই সম্প্রদায়টি ঈশ্বরের উপাসনায় বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু তাহারা পশু বলি দেয় না। তাহারা ভগবচ্চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতে ভালোবাসে।...স্বর্ণ-

রৌপ্যের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নাই, লাভের নিমিত্ত বৃহদাকার কৃষিকর্মেও তাহাদের লোভ নাই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনও তাহারা করে না। মনুষ্যসমাজে বোধ করি তাহারাই স্থাবর-অস্থাবর কোন প্রকার সম্পত্তিবিহীন। তৎসত্ত্বেও তাহারা আপনাদের ধনী বলিয়া গণ্য করে, কারণ প্রয়োজনানুগ পর্যাপ্ততা এবং সর্ববিধ সুব্যবস্থাকেই তাহারা প্রকৃত প্রাচুর্য বলিয়া জ্ঞান করে। ···যাহা কিছু লোভের উদ্রেক করে তাহা তাহারা সযত্নে পরিহার করে। একটি ক্রীতদাসও তাহাদের কাহারও নাই, তাহারা প্রত্যেকে স্বাধীন এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে।···তাহাদের ভগবৎ-প্রেমের কথা, অর্থ এবং যশের প্রতি তাহাদের ঘৃণার কথা, এবং বিলাস-ব্যসনে তাহাদের বিমুখতার কথার শত-সহস্র উদাহরণ বর্তমান।·· তাহাদের সকলের নিমিত্ত আছে একটি মাত্র কোষাগার, গোষ্ঠীগত ব্যয়ের প্রয়োজনে, আর আছে একটি সাম্প্রদায়িক ভোজনাগার।···যৌথপরিবারের এরূপ দৃষ্টান্ত, জীবন-নির্বাহের এরূপ সমতা, তথা ইহা অপেক্ষা সুষ্ঠু, সজীব সাম্যবাদ অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না।······

এসীন সম্প্রদায়ের প্রকৃতির এই বিচিত্র বিস্ময়কর দিকটি ইহুদি ঐতিহাসিক এবং সেনানায়ক, ফ্লেবিয়াস যোসেফাসের (৩৭-৯৭ খৃঃ) নজরেও পড়েছিল। তাঁর 'ইহুদি যুদ্ধ' এবং 'ইহুদি পুরাবৃত্ত' নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাদের কথা লিখে গেছেন। 'ইহুদি যুদ্ধ' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের সপ্তম পরিচ্ছেদে সে-ধর্মসম্প্রদায়ের যে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন, তার একটি যথাযথ উদ্ধৃতি পেশ করছি, পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে,—

ইহুদিদের মধ্যে তিনটি ধর্মীয় গোষ্ঠী বর্তমান, যথা, রক্ষণশীল (Sadducee), প্রগতিশীল (Pharisee) এবং এসীন। এসীনগণ কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনে বিশ্বাসী। জন্মসূত্রে তাহারা ইহুদী, কিন্তু তাহারা একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল।...উদ্বাহবন্ধনে অনীহার কারণে তাহারা অন্যের অপাপবিদ্ধ, নির্মলহৃদয় শিশু গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে আপন আদর্শে শিক্ষা দান করিয়া গঠন করে। সম্পদে তাহারা বীতস্পৃহ, সেই হেতু নবীন দীক্ষার্থীকে তাহার সমস্ত সম্পত্তি সম্প্রদায়কে সমর্পণ করিতে হয়।...অন্য কোন স্থান হইতে এসীনপন্থী আসিলে তাহাদের আপনজনের মত সেই ব্যক্তিও সম্প্রদায়গত সম্পত্তির অংশভাক্ বলিয়া পরিগণিত হয়।......বসনে, ভূষণে, বক্তিগত আকৃতিতে তাহাদিগকে কঠিন নিয়মনিষ্ঠ গুরুর শিষ্যের ন্যায় দৃষ্ট হয়। পরিচ্ছদ এবং পাদুকা জীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাহার পরিবর্তে নূতন সামগ্রী প্রদত্ত হয় না।...আহারের পূর্বে পুরোহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন তাঁহার করুণার জন্য। আহারান্তে পুনরায় প্রার্থনা করেন।......দুটি মাত্র ব্যাপার তাহাদের আয়ত্তগত—স্বাবলম্বন এবং পরহিত।......তাহারা বিশ্বাসী এবং শান্তিকামী।......প্রাচীন পুঁথিপত্রে তাহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস, বিশেষতঃ যেগুলির সাহায্যে দেহ এবং আত্মার উন্নতি হয়, সেইগুলি তাহাদের বিশেষ প্রিয়।......তাহারা দৈহিক যন্ত্রণা জয় করে ইচ্ছাশক্তির বলে। এবং যদি মৃত্যুর আগমন ঘটে সসম্মানে, সে মৃত্যু তাহাদের নিকট উদ্দেশ্যবিহীন, ব্যর্থ জীবন হইতে শতগুণে বেশি কাম্য। রোমসৈন্যের সহিত যুদ্ধকালে তাহাদের মনোবল সম্যক পরীক্ষিত হইয়াছে। সে সময়ে কল্পনাসম্ভব সর্বপ্রকার

নিষ্ঠুর অত্যাচারে তাহাদের নিগৃহীত হইতে হইয়াছে, কিন্তু বিধায়কের (মোজেস) নিন্দা তাহাদিগকে দিয়া উচ্চারণ করান যায় নাই, অভক্ষ্যও ভক্ষণ করানো যায় নাই, অথবা তাহাদের চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রুও ঝরে নাই, তাহাদিগকে কোনরূপে বশ্যতাও স্বীকার করান যায় নাই। ······দেহ নশ্বর তাহা কলুষিত হইতে পারে, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর, তাহা নিষ্কলুষ, এই বিশ্বাস তাহাদের মজ্জাগত। ····· তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে এবং সে-ভবিষ্যদ্বাণী কদাচ নিষ্ফল হয়।···

এ কথাগুলি ফ্লেবিয়াস যোসেফাস লিখেছিলেন ৭৭ খৃস্টাব্দে। এসীনদের সম্পর্কে এত সব কথা তিনি জানতেন। তিনি লিখেছেন, এসীনদের মাঝে তিনি বাস করেছেন, পুরো তিন বচ্ছর। সম্ভবতঃ তিনি তাদের চামড়ায় লেখা ১০০ খৃস্টপূর্বাব্দের গোটানো পুঁথির কথাও জানতেন, যে পুঁথি বিদ্রোহের কালে তারা লুকিয়ে রেখেছিল মাটির জালায় ভরে, কাছাকাছি গুহার ভেতরে নষ্ট হওয়ার ভয়ে। দু'হাজার বছরের সময়-সলতে লাগানো ব্রহ্মবিদ্যার বোমাটি অ্যাদ্দিনে ফেটেছে। এসীনদের লুকিয়ে রাখা মূল পুঁথি ওয়াদি কুমরানের গুহা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে ১৯৪৭ সালে। ওই পুঁথিরই আধুনিক নাম 'মরুসাগরের গোটানো পুঁথি' (Dead Sea Scroll) (১৬)। কুমরান পুঁথির বিচিত্র কাহিনী শুনিয়েছেন হাইনরিখ আলেকজাণ্ডার স্টোল তাঁর 'মরুসাগরের গুহায়' (১৭)। এসীনদের (!) টীকা সম্বলিত অবিশ্বাস্য, অমূল্য উপদেশগ্রন্থ অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে, বহু বিশ্ব-বিদ্যালয়, বহু মঠের কাছ থেকে, তারপর সে-পুঁথি গেল বাস্তবপন্থী অধ্যাপক দ্যুপঁ-সমের (১৮) এবং অধ্যাপক মিলার বারোজের হাতে অনেক তর্ক অনেক বিতর্কের পর।

কুমরান পুঁথির অনুবাদ থেকে দেখা যায়, উপদেশাবলীর গুরুত্বপূর্ণ

অংশসমূহের উৎপত্তি এসীন-মতবাদ থেকে। যিশুর কর্মপদ্ধতি এবং জীবনধারা এসীনদের অনুরূপ। তাছাড়া যে সব নীতিকথা যিশু ব্যবহার করতেন শুধু সেইগুলোই নয়, তাঁর সমস্ত ধর্মোপদেশই এসীনরা শিক্ষা দিতো তাঁর অনেক কাল আগে।

'নূতন নিয়ম' এবং কুমরান পুঁথির তুলনামূলক বিচারে কোন পার্থক্য দেখা যায় না, ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতসমাজ সে কথা মানুন আর না-ই মানুন। তাঁদের চোখে এসীন সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে বেথলিহেমের অথবা নাজারেথের যিশুর শিক্ষাকে এক করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ! কিন্তু ও-কথা মানার বড় অন্তরায়, নাইসিয়ার ধর্মসভায় স্থিরীকৃত ঈশ্বরের সঙ্গে যিশুর একাত্মতা। এসীনরা ছিল সরল, নির্বিরোধ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী, তাদের ধর্মমত যিশুর চেয়ে অনেক পুরোন। যিশু অনুকারী? নৈবচ নৈবচ! যিশুর বিশুদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত খৃস্টানধর্মের রক্ষকদের পক্ষে একথা মেনে নেওয়া অসম্ভব। আল্‌বেৎ´ শ্‌ভাইৎসের তাঁর 'ঐতিহাসিক যিশুর সন্ধানে' (২০) গ্রন্থে যখন লিখেছিলেন, 'যিশুর অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা বর্জন করার বিষয়ে আধুনিক খৃস্টধর্ম স্বভাবতঃই সব সময়ে বিচার করবে,' তখন নিশ্চয় মনের ভাবটিকে বেশ পরিষ্কার করেননি, মনে হয়, কিছু যেন অনুক্ত রেখে দিয়েছেন।

এসীনদের শিক্ষা এবং যিশুর শিক্ষার ভেতর সুস্পষ্ট মিলের কিছু নিদর্শন তুলে দিচ্ছি,—

এসীনরা দীক্ষাপ্রার্থীকে পবিত্র বারি সিঞ্চনে অভিষিক্ত করতেন না। যিশুও করতেন না।

এসীনরা সমসাময়িক রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীলদের (সাড্যাসি এবং ফারিসি) সান্নিধ্য বর্জন করতেন। যিশুও তাই করতেন।

এসীনরা বলতেন ঈশ্বরকে খুশি করতে হলে নম্র হতে হবে, বিনয়ী হতে হবে। যিশুও সেই একই কথা বলতেন।

এসীনরা সাবধান করতেন, আসন্ন 'অগ্নিসহ শেষ বিচারের' বাণী প্রচার করে। যিশুও তাই করতেন।

এসীনরা বলতেন, প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে নিজের মত করে। যিশুর প্রতিটি কথার মাত্রা ছিল এসীনদের ওই কথাটি।

এসীনরা বলতেন, 'আলোকের পুত্রদের' কথা, 'তমসার শক্তির' সঙ্গে যারা সংগ্রাম করে। যিশুর বাণীতে এ সব রূপকের অস্তিত্ব কে অস্বীকার করবে ?

এসীনরা বলতেন 'সত্যনিষ্ঠার' কথা, বলতেন 'অনন্ত জীবনের' কথা। যিশুও তো ওই কথাই বলেছেন।

এসীনরা বলতেন 'নব শর্তের (New covenant) শরিকদের' কথা, বলতেন ঈশ্বরের তৃতীয় বিভূতির (Holy ghost) কথা। যিশু কি এ ছাড়া অন্য কথা বলেছেন ?

সম্প্রদায়গত পংক্তিভোজনে বসে এসীনরা ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করতেন। শেষ নৈশ ভোজে যিশুও তাই করেছেন।

চতুর্থ কুমরান গুহায় 'স্বর্গীয় সুখের' কথা সমন্বিত পুঁথি পাওয়া গেছে, তার প্রতিটি বাক্যের সূচনা 'সুখমস্তু' শব্দ দিয়ে। পর্বত শিখরে প্রদত্ত উপদেশাবলীর সূচনা যিশুও করেছিলেন ওই শব্দটি প্রয়োগ করেই।

এসীনদের সম্প্রদায়ে দীক্ষাপ্রার্থীকে তার পাপ কবুল করতে বলা হত, খৃস্টধর্মের ক্ষেত্রে তো ওইটিই কঠোরতম বিধান।

এত প্রমাণের পাহাড় থেকে যে প্রশ্নটি সন্দেহাতীতভাবে বেরিয়ে আসে সেটি হল, ঐতিহাসিক ফ্লেবিয়াস যোসেফাসের মত যিশুও কি কিছুকাল এসীনদের সঙ্গে বাস করেছিলেন ? উনিশটি খৃষ্টীয় শতাব্দী ধরে বুদ্ধিমান মানুষ ফ্লেবিয়াস যোসেফাসের প্রতিবেদন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, এসীনদের কথা কেউ জানতেন না। যিশুর উপদেশাবলীতে

তাদের কথা নেই, 'নূতন নিয়মেও' তাদের কথা বলা নেই। অস্তিত্বহীন কোন ধর্মসম্প্রদায়ের কথা নিয়ে কি ফ্লেবিয়াস যোসেফাস একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন? কিন্তু কুমরান পুঁথির আবিষ্কার প্রমাণ করেছে ঐতিহাসিক হিসেবে যোসেফাস ছিলেন নির্ভেজাল সত্যের ব্যাপারী।

তখন আমি ফ্রাইবুর্কের কঠোর নিয়মনিষ্ঠ ক্যাথালিক সেণ্ট-মিখেল কলেজের ছাত্র, সেখানেই প্রথম শুনি, শিষ্যদের কাছে যিশুর করুণ বিদায় অভিভাষণ, যে ভাষণে তিনি তাঁদের 'শেষ বিচারের' কথা জানিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঈশ্বর 'মেষদিগকে আপনার দক্ষিণে এবং ছাগদিগকে বাম দিকে রক্ষা করিবেন'—(ম্যাথু ২৫, ৩৩)।

> তখন রাজা আপনার দক্ষিণ দিকে স্থিত লোকদিগকে বলিবেন, আইস আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্রেরা জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে তাহার অধিকারী হও।
>
> কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম আর তোমরা আমাকে আহার দিয়াছিলে, পিপাসিত হইয়াছিলাম আর আমাকে পান করাইয়াছিলে, অতিথি হইয়াছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে, বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম আর আমাকে বস্ত্র পরাইয়াছিলে, পীড়িত হইয়াছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলে, কারাগারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার নিকটে আসিয়াছিলে।

* * *

কলেজের অধ্যক্ষ বলতেন, আমরা যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করি যাতে প্রতিটি মুহূর্তে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারি শুদ্ধসত্ত্ব, পবিত্র চিত্তে, কেননা কখনো আমরা তাঁর

বাণীতে সন্দেহ প্রকাশ করিনি, চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছি সর্বান্তঃকরণে, বাইবেলের কথাই পরম সত্য।

কলেজের সেই ধর্মোপদেশ শুনতে শুনতে বুঝেছি, আমাকে বাঁ-দিকেই দাঁড়াতে হবে, কারণ আমার মন সন্দেহে টইটম্বুর। ভাবতুম, কথাটা কেমনতরো ? অধ্যক্ষ কি ঠিক বলেছেন, যে বিশ্বাসীরা, তথা মনে যাদের সন্দেহের লেশমাত্র নেই তারাই শুধু পুরস্কৃত হবে ? প্রলোভন-বর্জিত হয়ে যারা বিশ্বাস করতে পারে, একমাত্র তারাই দাঁড়াবে ঈশ্বরের দক্ষিণে ? এ কথা সত্যি যে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ বাইবেলের ওপর চিরকাল নির্ভর করেছেন, কিন্তু তিনি তো কখনো স্বর্গীয় নির্বাচন পরিষদে বসেননি, কিম্বা বিশ্বাসীদের পুরস্কার দান-কালেও তো কখনও উপস্থিত থাকেননি! অধ্যক্ষ হয়তো ভুল বলেছেন!

আমার সমস্ত সন্দেহ সত্ত্বেও তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে ঈশ্বরের পুত্র যিশু স্বয়ং ওই মর্মস্পর্শী কথাগুলির স্রষ্টা। কিন্তু আজ জানি, কথাগুলি এসেছে তথাকথিত 'যোসেফের নিয়ম' (Testament of Joseph) গ্রন্থ (২১) থেকে। একটা উদ্ধৃতি দিই,—

> আমি ক্রীতদাসের ন্যায় বিক্রীত হইয়াছিলাম, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। আমি কারাগারে বন্দী হইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার দৃঢ় হস্ত আমার সহায় হইয়াছিল। আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলাম, ঈশ্বর আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম, আর ঈশ্বর আমাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন। আমি পীড়িত হইয়াছিলাম, কিন্তু সর্বেশ্বর আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়াছিলেন। আমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু ত্রাতা আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

যিশুর বাণী যে 'ঐশীশক্তি'প্রসূত নয়, সে কথা প্রমাণ করতে কি

আরো নজিরের প্রয়োজন ? এই কথাগুলি যিশুর অনেক আগে উচ্চারিত হয়েছে, ধর্মালোচনায়। (অদ্যাবধি প্রদত্ত নানা ব্যাখ্যার কোনটিতেও ব্যাখ্যাত হয়নি যে যিশুর সে-বাণী অচেতন মন-প্রসূত আদিরূপজ স্মৃতি [কার্ল গুস্তাফ য়ুঙ্]। কিন্তু তা যদি হয়ও, তবু বলা যাবে না যে তার উৎপত্তির উৎস ঐশীশক্তি।)

আমার বেশ মনে হচ্ছে, যিশু এসীনদের পাঠশালায় পড়েছিলেন এবং নাজারেথ অথবা বেথলিহেমের সেই ছেলেটি তাদের শিক্ষার বিশিষ্ট জ্ঞানটি বিশেষভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। এবং সেই জ্ঞান থেকেই, এসীন মনীষি-মস্তিষ্কপ্রসূত সেই জ্ঞানের শলাকাই প্রজ্বলিত করেছিল খৃস্টধর্মের দীপবর্তিকাটিকে। ব্যাপারটা কি এতই ভয়ঙ্কর ? তবে, ঈশ্বরের সঙ্গে যিশুর একাত্মতার কথাটিকে যদি খৃস্টধর্মের ভিত্তি-প্রস্তর করে রাখতেই হয়, তাহলে ভয়ঙ্কর বৈকি।

যিশুপন্থী জনতার বর্ধমান সংখ্যার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসিমুখে ভাবি, যুবসমাজের মন ধর্মের দিকে ফিরেছে। গির্জেয় আমরা 'তারকা শ্রেষ্ঠ যিশুখৃস্ট' ধরনের গান হতে দিই। কিন্তু 'আমার' ঈশ্বর যে সেজে-গুজে নাচ-গান-হল্লা করবেন, এ আমি দেখতে পারবো না। ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমত্তা সম্পর্কে আমার ধারণা অনেক বড়, একান্ত প্রাচীনপন্থী সে-ধারণা। সে-ধারণা অলঙ্ঘনীয়। এ অস্বাভাবিক ভণ্ডামীর প্রয়োজন হবে না, যদি ঈশ্বরের বাণীর, তথা বাইবেলের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা হয় এবং সে-সমাধান হয় সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে, আধুনিকতম গবেষণার ভিত্তিতে। আজ বিশ্বাসের চেয়ে উপলব্ধির দাম অনেক বেশি।

* * *

যিশু পৃথিবীতে এসেছিলেন কুমারী মেরীর জারজ সন্তানরূপে, কোন এক অজ্ঞাত, অখ্যাত স্থানে। মেরী ছিলেন দরিদ্র, কিন্তু ইচ্ছে ছিল, ছেলেকে সুশিক্ষা দেবার। তিনি জানতেন, কচি বয়স থাকতে

থাকতে এসীনরা পরের ছেলের ভার নেয়। ছেলেকে নিয়ে তিনি গেলেন মরুসাগরতীরের মঠের পাঠশালায়। রোমের বহুদেবতার পূজোকে এসীনরা বলতো অধার্মিকতা আর রোমের দখলদারদের সঙ্গে ইহুদিদের ভাই-ভাই ভাবও তাদের কাছে ছিল ঘৃণার্হ। দখলদারদের সঙ্গে একটা আধ্যাত্মিক প্রতিরোধ গড়ে তুলে তারা চেয়েছিল, ইহুদি জনগণের মনে দখলদারদের সম্পর্কে ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে তুলবে প্রচ্ছন্ন উপদেশ (রূপক) মারফত। সেই সময়ে বাগ্মী জনের (John the Baptist) নেতৃত্বে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল একটা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা। সে মরুভূমে যিশু ছিলেন উপযুক্ত শিক্ষার্থী। জনগণের মনের খবর তিনি জেনেছিলেন ধর্মপ্রচারক জনের কাছ থেকে।

তিরিশ বছর বয়সে এসীন-সম্প্রদায় ছেড়ে যিশু বেরিয়ে পড়লেন গ্রামে গ্রামে ধর্মপ্রচার করতে। সে কাজে তিনি বারোটি শিষ্য জুটিয়ে নিয়েছিলেন, তবে, 'নূতন নিয়ম' যেমন বলেছে, নিঃসন্দেহে তেমন সরল পথে নিশ্চয় নয়। শিষ্যরাও কিছু শান্ত সুন্দর, সরল সাধুপুরুষ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন স্থানীয় 'গেরিলাদের' সর্দার, তাঁদের ভেতর অন্ততঃ চারজনকে 'জীলট্' (রোম-বিরোধী জাতীয় দল, তথা বিদ্রোহী) বলে জানা গেছে (২২)। দেহরক্ষীর এই দল, এমন সুবিন্যস্ত, এমন বাগ্মী এবং ধর্মপ্রচারে এমন উৎসাহী ছিলেন যে তাঁদের নেতা হিসেবে যিশু নগর পরিক্রমার ঝুঁকি নিতে পারতেন। তাঁর বক্তৃতাগুলো বাস্তবিকপক্ষে ছিল রাজনৈতিক। পাছে রোম-সেনারা সে বক্তৃতার মর্ম বুঝতে পারে, তাই ধর্মের আবরণে ঢেকে দিতেন তাকে। কিন্তু সাদ্দুসি এবং ফারিসিরা বুঝতে পারতো, শঙ্কিত হয়ে উঠতো তারা। পাছে রোমের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ভ্রাতৃভাবে চিড় ধরে, তাই তারা ছিল যিশুর একান্ত বিরোধী। ইহুদি সমাজপতিদের সঙ্গে রোমের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের একটা অলিখিত

চুক্তি ছিল, কৃষি, বাণিজ্য এবং ঘুষ-ঘাষের ব্যাপার প্রচলিত পথেই চলতো। রোম শুধু একটা নজরানা নিয়েই খুশি, তবে, নজরানাটা ছিল বেশ মোটা গোছের খাজনা। সে যাই হোক, ইহুদি নেতারা এ ব্যবস্থায় ছিল মোটামুটি তৃপ্ত, এর নড়চড় তাঁদের নাপছন্দ। এমন সময় ঘটলো যিশুর আবির্ভাব জেরুসালেমের সবচেয়ে জনবহুল এলাকায়, শুরু করলেন তাঁর রক্ত গরম করা জ্বালাময়ী বক্তৃতা। ধর্মের বোরখায় সে-জ্বালা ঢাকা পড়ে না।

কিন্তু অশান্ত সেই পরিব্রাজক ধর্মপ্রচারকের হাত থেকে তারা নিস্তার পেলো কেমন করে?

ধরে নেওয়া যেতে পারে, নাগরিকরা জানতো, যিশু ছিলেন এসীন-সম্প্রদায়ভুক্ত, নিদেন তাদেরই একজন তিনি, যারা জানতো, কেমন করে তাদের নিয়ম-নিষ্ঠা-প্রীতি-বিনয়-তিতিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত জীবনবেদকে তাদের আপন রাজনৈতিক মতবাদের নামাবলী জড়িয়ে সুরক্ষিত রাখতে হয়। বহু দিন পর্যন্ত রোমের নজর সেদিকে পড়েনি। এসীন প্রচারকদের তারা মনে করতো 'নির্বিষ' পুরোহিত, যাদের বক্তৃতায় তাদের বাড়াভাতে ছাই পড়বার আশঙ্কা নেই। তার পর এক দিন রইসদেরই কেউ হয়তো দখলদারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে থাকবে। সেই দিন থেকেই যিশু গা ঢাকা দিয়েছিলেন।

'উপদেশাবলী' থেকে বোঝা যায় না, ঠিক কী ঘটেছিল। যিশুর বিরুদ্ধে হাত তুলতে রোমক শাসনকর্তা পন্তিয়াস পাইলেতের (২৬-৩৬ খৃস্টাব্দ) কাছে একখানা চিঠিই যথেষ্ট। ইহুদি প্রধান পুরোহিত কাইয়াফাস (১৮-৩৬ খৃস্টাব্দ) কি শাসনকর্তাকে কোন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন? পিলেতকে কি তিনিই বলেছিলেন, ধার্মিক ওই এসীনটি তাঁর নরম-নরম বক্তৃতা মারফত কী প্রচার করতে চাইছেন? জোয়েল কার্মাইকেল (২৩) তাঁর 'যিশুর মৃত্যু' গ্রন্থে বলেছিলেন, যিশু

মন্দির আক্রমণ করেছিলেন। কথাটা কি সত্যি ? সে যাই হোক, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই রাজনৈতিক, কেননা ইহুদিদের ধর্ম-জীবন নিয়ে রোম কোন দিন মাথা ঘামায়নি, কিন্তু এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে সেটা কোন গণ উত্থান, কিম্বা বিদ্রোহ অথবা রোমের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ঘটনা ছিল না। তা যদি হত, তাহলে ওদের ইতিহাসে সে কথা ফলাও করে লেখা থাকতো। ঘটনাটা নিঃসন্দেহে মারাত্মক কিছু ছিল না। তা না হোক, এ কথা প্রমাণিত সত্য যে শিষ্যবর্গসমেত যিশুকে হঠাৎ গা-ঢাকা দিতে হয়েছিল। কিন্তু কেন ?

'উপদেশাবলী' বলে, যিশু ছিলেন উপচিকীর্ষু ভদ্রলোক, তাঁর বক্তৃতার মূল বক্তব্য ছিল, পবিত্র জীবন যাপন। পীড়িতের রোগ-নিরাময়ে সাহায্য করতেন তিনি, মৃতকে করতেন জীবন দান। যিশু জানতেন, তাঁর জীবন বিপন্ন। তাই আগুন নিয়ে খেলা ছেড়ে সশিষ্য পালিয়ে গিয়েছিলেন, জেরুসালেমের উপকণ্ঠে কিদ্রন উপত্যকার পুবে ত্রিশৃঙ্গ অলিভ্স্ পর্বতে।

বাইবেলের সেই নাটকীয় বিবরণ সকলেরই জানা। স্থানীয় ইহুদিদের আশ-পাশের পথ-ঘাট, নদী-নালা, খানা-খন্দ সব নখদর্পণে। তাদের সাহায্যে রোমকরা সশিষ্য যিশুকে গরু-খোঁজা করতে লাগলো। কদিনের উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায় ক্লান্ত শিষ্যরা গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে তাদের গোপন আস্তানায়। একা যিশু বসে আছেন শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন, জাগর চোখ মেলে। ঘামের বদলে দেহ থেকে ঝরছে বিন্দু বিন্দু শোনিত। পাইনকাঠের মশালের আলোয় শ্মশানের ভয়াবহ স্তব্ধতা। হঠাৎ সৈন্যদের আবির্ভাব, অস্ত্রের ঝঞ্চনা, বিদ্রোহীকুল অবরুদ্ধ।

তারপর সেই পশ্চাদ্ধাবনকারী জনতার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো যিশু-শিষ্য যুদাস ইস্কারিয়ৎ। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল যিশুর পানে, চুম্বন করলো তাঁকে। (সেই থেকেই 'যুদাসের চুমুর' অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে, চরম বিশ্বাসঘাতকতা)।

মুহূর্ত চরম সঙ্কটাবহ। তবু মনে প্রশ্ন জাগে, কী কারণে যুদাস প্রতারণা করলো? লোকটি তো ছিলেন শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র, সবাই তো ভালোবাসতো তাঁকে। লোকের ভালো ছাড়া মন্দ তো কখনো করেননি তিনি। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, তিনি যা করেছেন, খোলাখুলিভাবে সবার চোখের সামনেই তো করেছেন। সাধারণ মানুষ, ধর্মগুরু, দখলদার রোম সেনা, সবাই তাঁকে জানতো, চিনতো ভালো করেই। শাসককুল তাঁকে গ্রেফতার করতে পারতো যে কোন দিন, ডেকেও আনতে পারতো জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে। যুদাসের তাহলে অমন সর্বজনপরিচিত লোকটিকে চুমু খেয়ে সনাক্ত করবার দরকার হল কেন? 'উপদেশাবলী' বলে, পুরোহিত এবং মোড়লদের নাকি যুদাস বলেছিল, 'যাহাকে আমি চুম্বন করিব, জানিবে সে-ই যিশু'। অমনভাবে চিনিয়ে দেওয়া থেকে কি মনে হয় না, যিশু মুখোশ পরে অথবা ছদ্মবেশে ছিলেন?

সে রাত্রের ঘটনা থেকে ওই কথাই মনে জাগে। 'নূতন নিয়মে' বলা আছে, 'তখন পিতরের নিকট তরবারি থাকাতে তিনি তাহা খুলিয়া মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া ফেলিলেন। সে দাসের নাম মল্ক' (যোহন—১৮, ১০)। শান্তিপূর্ণ ভ্রাতৃসঙ্ঘের সভ্য, পিতরের হাতে তাহলে তরবারি ছিল? সম্ভবতঃ গোটা দলটাই সশস্ত্র ছিল!

যিশু ছিলেন সে ঘটনার মধ্যমণি। তিনি বুঝেছিলেন, সেখানে বাধাদানের চেষ্টা বৃথা, তাই বললেন, 'তরবারি কোষবদ্ধ কর'। যিশুকে ধরে নিয়ে গেল। ডামাডোলের ভেতর অন্ধকারে শিষ্যেরা লুকিয়ে পড়লো ঝোপে-ঝাড়ে। শুধু গোঁয়ার পিতর রয়ে গেল প্রভুর পরিণতি দেখার জন্যে। ছদ্মবেশে থেকে গেল রোম-সেনাদের সঙ্গে মিশে, তাদের শিবিরের আশেপাশে।

পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং মহাযাজকের বাটীতে আনিল, আর পিতর দূরে থাকিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

পরে লোকেরা প্রাঙ্গণের মধ্যে আগুন জ্বালিয়া একত্র বসিলে, পিতর তাহাদের মধ্যে বসিলেন।

তিনি সেই আলোর কাছে বসিলে এক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, 'এ ব্যক্তিও উহার সঙ্গে ছিল'।

কিন্তু তিনি অস্বীকার করিয়া বলিলেন, 'না, নারি, আমি তাহাকে চিনি না'।

একটু পরে আর একজন তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'তুমিও তাহাদের একজন'। পিতর কহিলেন, 'ওহে, আমি নই'।

ঘণ্টাখানেক পরে আর একজন দৃঢ়রূপে বলিল, 'সত্য, এ ব্যক্তিও তাহার সঙ্গে ছিল কেননা এ গালীলীয় লোক'।

তখন পিতর কহিলেন, 'ওহে, তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারি না'। (লুক ২২, ৫৪-৬০)।

রোম-সেনাদের সঙ্গে আগুনের ধারে বসে অন্ততঃ দুটো ঘণ্টা পিতর কাটিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায় লোকটি কী পরিমাণ চতুর।

যিশুকে দুটো আদালতের সামনে হাজির করা হয়েছে। সেখানে তাঁর বিচার হয়েছে, উপহসিত হয়েছেন, অত্যাচারও হয়েছে তাঁর ওপর, তারপর ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছে। কার্মাইকেল (২৪) তাঁর 'যিশুর মৃত্যু' গ্রন্থে বেশ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন, ক্রুশে বিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দেবার পদ্ধতি রোমকদের। রোমক বিচারালয়ের রায় অনুযায়ীই সৈন্যরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। ব্রহ্মবিদেরা বলেন, যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন ৩২ খৃস্টাব্দ নাগাত। ক্রুশের ওপরকার

উৎকিরণ বলে, যিশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল 'রাজনৈতিক' অপরাধের কারণে, 'ইহুদিদের রাজা' হিসেবে (যোহন ১৯, ১৯-২২)।

*   *   *

এবার পাদপূরণ করতে বলি, যিশু ছিলেন সংবেদনশীল, শিক্ষিত মানুষ, ভেষজবিদ্যায় পারদর্শী এবং সুবক্তা। তাছাড়া, আরো একটি ঐশ্বর্য তাঁর ছিল, সে হল তাঁর পরামনোবিদ্যার জ্ঞান। তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি যে একজন অতি-সম্মানিত, অত্যন্ত ধর্মভীরু লোক ছিলেন, সে বিষয়ে কারুর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তিনি এসীন সম্প্রদায়ভুক্ত বলে, অথবা তাদের আচার-অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকায় তিনি তাদের শাস্ত্রীয় নির্দেশ, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, সংযম, উপচিকীর্ষা ইত্যাদি সর্বতোভাবে পালন করতেন। কিন্তু কুমরান পুঁথির আবির্ভাবের পর থেকে জানি, এসীন মতবাদের সমর্থকরা তাদের শান্তিপ্রিয়তা সত্ত্বেও রোমের ঘোর বিরোধী ছিল। তারা চেয়েছিল, তাদের পুণ্যভূমি থেকে ম্লেচ্ছ এবং অনধিকার হস্তক্ষেপকারীদের বিদেয় করতে, দূর করে দিতে তাদের বহু-ঈশ্বরবাদকে। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক স্বার্থের মিলন ঘটলে বিস্ফোরণ একটা ঘটবেই, তা সে যখনই হোক। ধর্ম এবং রাজনীতি কখনোই ভালো করে মিশ খায়নি।

রুদলফ আউগস্তাইনের বিশ্বাস, যিশু 'অনেকগুলি ব্যক্তি এবং সত্তার সুষ্ঠু সমন্বয়ে গঠিত একটি কাল্পনিক চরিত্র'। আমি অবশ্য অমন বির্তকের ভেতর যাবো না। কারণ অধ্যাপক গুয়েন্থের বোর্নকামের (২৫) কথা মানলে, 'ঐতিহ্যের খড়-মাটি ছাড়িয়ে ফেলার পর সন্দেহাতীতভাবে যে-ঐতিহাসিক অবশেষটুকু পড়ে থাকে, সেই কাঠামোর সঙ্গে 'উপদেশাবলীতে' বর্নিত কাহিনীর কোন মিলই প্রায় পাওয়া যাবে না'।

বাইবেলের ভেতরে কার কণ্ঠস্বর শুনি ?

আমি যে কথা বলতে চাই, তা হল যিশু ধার্মিক ছিলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের 'একমাত্র পুত্র' নন। গোঁড়া রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন বটে, তবে 'ত্রাতা' ছিলেন না। প্রমাণিত এ তথ্যে সরলপ্রাণ খৃস্টান ভীষণ আঘাত পাবেন কেননা সন্দেহ করা যে পাপ! কোটি কোটি খৃস্টানকে ধর্মের আদিম পর্যায়ে ফেলে রাখা হয়েছে দুহাজার বছর ধরে মিথ্যাশ্রিত ধর্মমতের আফিং খাইয়ে, অথচ পণ্ডিত ব্রহ্মবিদেরা সত্য কথা ঘোষণা করতে পারতেন অনেক কাল আগেই, কিন্তু করেননি। দুহাজার বছরের ভুল শিক্ষা—তাকেই আমি বলি ঐতিহ্য।

* * *

রোমান ক্যাথলিক পরিবারে আমার জন্ম, আমার কর্ম, আমি আলোচনা করছি যিশুকে নিয়ে, খৃস্টান শিক্ষামত যেমনটি সবাই মানে, কিন্তু জোয়েল কার্মাইকেলের কথায় বলি, 'আমাদের ঐতিহ্যের গণ্ডির মধ্যে আমরা এমনই আবদ্ধ যে উপদেশাবলী এবং নূতন নিয়মকে তাহাদের সামগ্রিকতায় সংস্কারমুক্ত মনে আমরা প্রায় কখনোই বিচার করিতে পারি না'।

বিশ্বাস বস্তুটা প্রমাণহীন একটা মানসিক সত্তা, একটা সহজাত প্রতীতি। অজ্ঞান মানুষের কাছে দোহাই পাড়ি, বলি, 'তর্ক কর না, বিশ্বাস কর'। বিশ্বাসের অর্থ আস্থা। সর্ব জীবের আদি এবং অন্ত সম্পর্কে, উচ্চতর কোন সত্তায় বিশ্বাস, তথা দুরুপলব্ধ অস্তি-নাস্তিতে আস্থাস্বরূপ এই আবেদন সৎ, শাশ্বত এবং প্রয়োজনীয়। এই বিশ্বাস সর্বকালে মানুষকে দিয়েছে সান্ত্বনা, শান্তি, স্বস্তি, দিয়েছে আশ্বাস। কিন্তু ধর্মের ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে এ বিশ্বাসের ক্ষীণতম সম্পর্কও নেই। যাজক এবং বাইবেল ব্যাখ্যাকার 'কুরু' এবং 'মা কুরু'র আদেশের বর্শা উদ্যত করে অন্তহীন বিশ্বাসের এক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। ঈশ্বরের বাণীর একমাত্র প্রচারক বলে নিজেদের জাহির করার কারণেই মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উদয় হয়।

অপরপক্ষে খৃস্ট ধর্মের বিরোধীরা যেমন বলেন, যে ধর্মই মানুষের জীবনে এনেছে দুঃখ, এনেছে কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা, যুদ্ধ, তাও সত্যি নয়। ধর্মান্ধদের তীব্র প্ররোচনা, বিশ্বাসী মানুষের মনে ঈশ্বরের কোন ছবি যদি ফুটিয়ে তুলতে না পারতো, তাহলে কোন ধর্মযুদ্ধ কখনো সংঘটিত হত না। ধর্ম কখনোই বিশ্বাসীর মনে চরম সত্য ঘোষণা করে না, তার যন্ত্রণায় প্রলেপও দেয় না, অথবা সর্ব অবস্থার উপযোগী সান্ত্বনার বাণীও বহন করে না।

কুমরান পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। খৃস্টান ব্রহ্মবাদীদের ধর্মালোচনায়—সে পুঁথি নতুন চিন্তার প্রবেশ ঘটাবার আগেও বাস্তববাদী সমালোচক মন, নির্ভেজাল জ্ঞানের কারবারী, খুঁজে পেয়েছ সমাধানের অসাধ্য কত অসঙ্গতি 'নূতন নিয়মের' অভ্যন্তরে! মানুষের স্থির বিশ্বাসে ফাটল ধরাবার প্রশ্নই উঠতো না, ঈশ্বরের বা যিশুর বাণীর ব্যাপারটা যদি এতে জড়িয়ে না পড়তো। পিতা-পুত্র যেহেতু 'অভিন্ন আত্মা' (কনস্তান্তিনোপলের দ্বিতীয় ধর্মসভার সিদ্ধান্ত), অতএব তাঁরা সর্বজ্ঞ, তথা অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী, সর্বত্র বিদ্যমান এবং ত্রুটিহীন,—এক কথায় অভ্রান্ত, অনন্ত। প্রত্যাদিষ্ট প্রণেতাদের এই সব বিশেষণই বাইবেল বিচারের মান সূচিত করে। কিন্তু এমন উচ্চমান কি যুক্তিসঙ্গত ?

ম্যাথু লিখিত সুসমাচারের শুরু যিশুর বংশতালিকা দিয়ে,— 'তিনি দায়ূদের সন্তান, আব্রাহামের সন্তান' (১)*। তালিকা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়েছে, শেষ হয়েছে, 'যাকোবের পুত্র যোসেফ, ইনি মেরীর স্বামী' বলে (১৬)। যোসেফ যদি যিশুর বাপই না হতে পারলো, তাহলে তার কী প্রয়োজন? ঈশ্বর কর্তৃক অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার অর্থ কিন্তু সরল ছুতোর বোঝেনি (মেরীর স্বামী যোসেফ ছুতোর ছিল), কারণ ছেলে হওয়ার ব্যাপারটা যে সে ভালো করেই

* বন্ধনীর অন্তর্গত সংখ্যা ম্যাথুর সুসমাচারের উদ্ধৃত স্তবক-সংখ্যা সূচিত করছে।

বুঝতো। 'আর তাঁহার স্বামী ধার্মিক হওয়াতে ও তাঁহাকে সাধারণের কাছে নিন্দার পাত্র করিতে ইচ্ছা না করাতে, গোপনে ত্যাগ করিবার মানস করিলেন' (১৯)। কিন্তু এক দেবদূত স্বপ্ন দিয়ে তাদের. বিবাহিত জীবনে ছেদ টানতে দিলেন না। 'ডেভিড-সন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মেরীকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে' (২০) যোসেফ দেবদূতের কথা মেনে নিলেন।

যোসেফের বংশ পরিচয় যতটা পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল, ততটা নয়, যিশুর পিতৃ পরিচয়ে সন্ত লুক কিছু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 'আর যিশু নিজে যখন কার্য আরম্ভ করেন, তখন প্রায় তিরিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন, তিনি (যেমন ধরা হইত) যোসেফের পুত্র, ইনি এলির পুত্র' (লুক ৩, ২৩)। লুক বলেছেন যোসেফের ছিয়াত্তর জন আদি পুরুষের কথা (ম্যাথু মাত্র বিয়াল্লিশ পুরুষেই তালিকা শেষ করেছেন)। তাই যোসেফ পর্যন্ত বংশ তালিকাটি ছকা নেহাত সহজ কাজ নয়।

আধুনিক ব্রহ্মবিদেরা বলেন (২৬), 'নিষ্কলঙ্ক গর্ভ' কথাটির অর্থ এ নয় যে যোসেফ কোন দিন তার মেরীকে স্পর্শ করেনি। ভগবৎ প্রেরণায় কি তাঁরা অর্থান্তর ঘটিয়েছেন, গোটা ব্যাপারটা ন্যায়সঙ্গত নয় বলে? ম্যাথু সেটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, 'যিশুখৃস্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মেরী যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হইলে, তাঁহাদের সহবাসের পূর্বে জানা গেল তাঁহার গর্ভ হইয়াছে পবিত্র আত্মা হইতে' (১,১৮)। এর চেয়ে সহজ ভাষ্য আর কিছু হতে পারে না।

ম্যাথু পরিষ্কার বলেছেন, জন যিশুকে দীক্ষিত করেছেন এবং কেমন করে তা করেছেন। '… …কিন্তু যিনি আমার পশ্চাতে আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান, আমি তাঁহার পাদুকা

বহিবারও যোগ্য নহি' (৩,১১)। জন যিশুকে বললেন, 'আপনার দ্বারা আমারই দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক, আর আপনি আমার নিকট আসিতেছেন?' (৩,১৪)। যিশুর দীক্ষার পর, 'স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন। আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইঁহাতেই আমি প্রীত"' (৩,১৭)। জন বুঝলেন, দীক্ষিতটি কে। স্বর্গ থেকেও বলে দেওয়া হল, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র, এর চেয়ে পরিষ্কার আর কিছুই হতে পারে না।

হেরোদ আন্তিপাস (খৃঃ পুঃ ৪ থেকে ৪০ খৃস্টাব্দ) জনকে বন্দী করেন এবং স্ত্রীর খেয়ালে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদের হুকুম দেন। কারাগারে জন হঠাৎ যিশুকে ভুলে গেলেন, দুজন শিষ্য পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, 'যাহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না, আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?' (১১,৩)। তাঁর সমস্ত ঐশীশক্তি দিয়ে যিশু তাঁর দীক্ষাকালে জনের ওপরে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, মনে হয়েছিল, সে খুব দীর্ঘস্থায়ী, তাই ভাবতে অবাক লাগে, কেমন করে তিনি তাঁকে ভুলে গেলেন।

গেনেসারেথ সাগরে রাজস্ব আদায়কারী (৯,৯) ম্যাথু, পরবর্তীকালে যিশুর শিষ্য এবং সম্ভবতঃ ভগবদ্বাণী প্রচারক, কী বলেন দেখা যাক। 'যিশু সমগ্র গালীলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তিনি লোকেদের সমাজগৃহসমূহে উপদেশ দিলেন' (৪,২৩)। সম্ভবতঃ সেকালে ওই সমাজগৃহেই পাঠশালা বসতো। সমাজগৃহ ছিল পুরোহিত এবং অধ্যাপকদের অধীন। যে কেউ সেখানে গিয়ে যে পড়াতে বসবে, তা হবার জো ছিল না। পড়াতে হলে, আগে অধ্যাপকদের কাছে পরীক্ষা দিতে হত, এবং তাদেরই একজন হিসেবে পরিগণিত হলে, তবে পড়াবার-অধিকার পাওয়া যেতো। যে-সমাজগৃহের দয়ায় তাঁর শিক্ষকতা নির্ভর করতো, সেই সমাজগৃহেরই

সমালোচনা করবার সাহস তাঁর কোথা থেকে এলো? তিনি বলেছেন, 'অধ্যাপক ও ফারিসিদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্মিকতা যদি অধিক না হয়, তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না' (৫,২০)।

ম্যাথ্ তাঁর সুসমাচারে যিশুর বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছেন। সে-বক্তৃতা থেকে তাঁর বিনয় সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। ঈশ্বরপুত্রের মুখনিসৃত একটি বক্তৃতায় আছে, '......আর যে কেহ বলে, রে মূঢ়, সে অগ্নিময় নরকের দায়ে পড়িবে' (৫,২২)। সব খৃস্টানই রেগে গিয়ে যদি অমন অভিসম্পাত করে, তাহলে তো নরকটা একটা বিশাল শ্মশানে পরিণত হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে ম্যাথ্ কয়েকটি উপদেশ, তথা বিধান উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলি দৈব-বিধান হওয়া সত্ত্বেও আমার জ্ঞানতঃ, আজ পর্যন্ত কেউ কোন কালে, এমন কি ধর্মপ্রাণ কোনও খৃস্টানও, ও-বিধান মানতে পারেননি। বিধানটি এই রকম,—'আর তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উপড়াইয়া ফেলিয়া দাও এবং দূরে নিক্ষেপ কর' (৩০)। '......যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও' (৩৯)। 'আর যে তোমার সহিত বিচার-স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙরাখা লইতে চাই, তাহাকে তোমার চোগাও লইতে দাও' (৪০)। 'আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে বাধ্য করে, তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও' (৪১)

আমার ভারি আশ্চর্য লাগে যখন দেখি, 'মানুষের দৈনন্দিন জীবনের' কাহিনীকে বিকৃত করে পণ্ডিতেরা সুবিধেমত জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলেন, 'ঈশ্বরের বাক্য'। এমন একটি প্রচারককেও আমি দেখিনি, যিনি কথাগুলোকে আক্ষরিক অর্থে ধরেছেন।

যিশু বারেবারে তাঁর শ্রোতাদের বলেছেন, তাদের যেন ঐকান্তিকতার অভাব না হয়, যেন তাদের মনে-মুখে তফাত না থাকে,—'কিন্তু তোমাদের কথা "হাঁ হাঁ, না না" হউক, ইহার অতিরিক্ত যাহা, তাহা মন্দ হইতে জন্মে' (৫,৩৭)। কিন্তু নিজেও যা বলতেন, নিশ্চয় তা করতেন না, করলে নিজের কথাকেই রূপকের তবকে মুড়ে দিতেন না। যেমন ধরুন, যখন তিনি একটি কুষ্ঠরোগীর গায়ে হাত বুলিয়েই তার রোগ সারিয়ে দেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'দেখিও, এই কথা কাহাকেও বলিও না' (৮,৪), আবার সেই সঙ্গেই বলেছিলেন, 'কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও', প্রথম আদেশটি তাহলে অর্থহীন, কেননা সেই অলৌকিক চিকিৎসার কালে যে সেখানে বিস্তর লোক উপস্থিত ছিল (৮,১)। যিশুর উপদেশে তাহলে গলদ ছিল বলতেই হয়।

যিশু দৃঢ়ভাবে বলেছেন, ন্যায়পরায়ণ যারা তাদের সঙ্গে তাঁর কোন কাজ নেই, যারা পাপী তাদের সঙ্গেই তাঁর কাজ। তিনি চেয়েছেন, তারা তাদের 'কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হোক, বলেছেন, 'আমি শাস্তি চাই না, চাই ক্ষমা'।

কিন্তু ম্যাথুর কথা শুনে মনে হয়, ক্ষমা নেহাত সস্তা ছিল না, কারণ তুচ্ছ অপরাধের ক্ষেত্রেও তিনি খড়্গহস্ত হয়েছেন, '……কিন্তু রাজ্যের সন্তানদিগকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, সেইস্থানে রোদন এবং অনুশোচনা হইবে' (৮, ২২)।

পরস্পরকে ভালোবাসো—প্রতিবেশীকে ভালোবাসো নিজের মত করে,—এ নীতিবাক্যের মাধ্যমে যাজক সম্প্রদায় তাঁদের ধর্মকে উপস্থিত করেছেন খৃস্টানের কাছে, সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত। বাইবেল পাঠক কেন বোঝেন না যে যিশুকে আদর্শ পুরুষ বলে ধরা যায় না, যে-উপদেশ, যে-বিধান তিনি দিয়েছেন, সে-উপদেশ, সে-বিধান তিনি নিজেই তো লঙ্ঘন করেছেন! বলেছেন, 'যে কেহ পিতা কিম্বা

মাতাকে আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয় এবং যে কেহ পুত্র কিম্বা কন্যাকে আমা হইতে অধিক ভালবাসে সে আমার যোগ্য নয়' (১০, ৩৭)। এই কথাগুলোকে কি 'ঈশ্বরের বাক্য' বলে মেনে নেওয়া যায়, নাকি ঈশ্বরের পুত্র ভালোবাসার কাঙাল ছিলেন ?

মনে হয়, কোরাসিন, বেথসাডা এবং কাপার্নেয়ামের লোকেরা সশিষ্য যিশুকে বিশেষ আমল দেয়নি, তাই বোধহয় শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তিনি তাদের অখণ্ড নরকবাসের অভিসম্পাত দিয়েছেন একান্ত অভদ্রভাবে (১১, ২০......)।

ঈশ্বরের পুত্রের জীবনের ঘটনাবলী নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে সম্ভবতঃ একই সঙ্গে ম্যাথু যিশুর জীবনের অসঙ্গতিগুলোও লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর দূতদের বাইরে পাঠাবার সময় পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিলেন, 'তোমরা সর্পের ন্যায় সতর্ক এবং কপোতের ন্যায় অমায়িক হও' (১০, ১৬)। ব্যাপারটাকে আমি বলি দুমুখো উপদেশ! এরপর তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন, বলেছেন, 'আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে' (১০, ২২), তবে মৃত্যুভয়ের কারণ নেই। যিশু তাঁর শিষ্যদের অমন ভয়াবহ পরিণতির কথা কেন বললেন ? তার অব্যবহিত পরেই তো তিনি জোর গলায় বলেছেন, '......আমার কাজ সহজ এবং আমার ভার লঘু' (১১, ৩০)। তাহলে, ও-কথা কেন ? সেকালেও, সেই ভড়ঙের যুগেও, ঈশ্বরের বাক্যকে একসুরে বাঁধা সহজ ছিল না।

ম্যাথু একটা জঘন্য অন্যায়ের বিবরণ দিয়েছেন, কী উদ্দেশ্যে ? 'যিশু আবার দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা কহিলেন (২২, ১), তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, স্বর্গরাজ্য এমন এক রাজার তুল্য, যিনি আপন পুত্রের বিবাহভোজের আয়োজন করিলেন' (২২, ২)। রূপকটিতে দুটো অদ্ভুত ব্যাপারের চমৎকার মিলন ঘটানো হয়েছে। বিয়ের ভোজ প্রস্তুত কিন্তু নিমন্ত্রিতের দেখা নেই। রাজা আবার দূত

পাঠালেন নিমন্ত্রিতদের ডাকতে, কিন্তু তারা তো এলোই না, বরং দু'পাঁচটা দূতকে মেরেও ফেললো। শেষে রাজা আদেশ জারি করলেন, 'তোমরা রাজপথের মাথায় মাথায় গিয়া যত লোকের দেখা পাও, সকলকে বিবাহের ভোজে ডাকিয়া আন' (২২, ৯)। রাস্তা থেকে গরু-তাড়ান করে লোক আনা হল ভোজসভায়। 'পরে রাজা অতিথিদিগকে দেখিবার জন্য ভিতরে আসিয়া এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, যাহার বিবাহ-বস্ত্র ছিল না' (২২,১১)। রাগে কাঁপতে কাঁপতে রাজা বললেন, 'উহার হাত-পা বাঁধিয়া উহাকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দাও, সেখানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে' (২২, ১৩)। এ রূপকের মাধ্যমে যিশু বলতে চেয়েছেন, 'আহুত হয় অনেকেই, কিন্তু মনোনীত হয় অল্পই' (২২, ১৪)। টীকা-টিপ্পনীর টেপাটেপিতে ঈশ্বরের এই বাণীটির একটি মনোমত রূপ নিশ্চয়ই দেওয়া যায়, কিন্তু আমার মত একটা সাধারণ মানুষের কাছে বাইবেলের এই কথাটি কুৎসিৎ একটি সামাজিক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। বাইবেল কেমন করে পড়তে হবে তার 'নির্দেশে' আমার প্রয়োজন নেই, পড়তে আমি জানি।

ম্যাথু বর্ণিত আর একটি গল্পেও কোন স্বর্গীয় রসের স্বাদ আমি পাই না। ২৫ পরিচ্ছেদের ১৪-৩০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রূপকটি সংক্ষেপে এই রকম। এক বড়লোক বিদেশে যাবার সময় তাঁর টাকাকড়ি রেখে গেলেন চাকর-বাকরদের কাছে। তারপর কর্তা একদিন ফিরে এলেন, পরিচারকরাও তাদের কাছে গচ্ছিত টাকার হিসাব দিল। একজন চাকরের ছিল পাঁচ 'তালেন্ত্' (১৫০০০ টাকা মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা), সে তাকে খাটিয়ে দশ তালেন্ত্ করেছে। অতীব প্রশংসনীয়! আর একজনের কাছে ছিল দু' তালেন্ত্, সেও তাতে আরো চার তালেন্ত্ যোগ করেছে। আরো ভালো! সবাই তাদের কাছে গচ্ছিত টাকাকে বর্দ্ধিত করেছে, করেনি শুধু একজন। বোঝাই যাচ্ছে, লোকটা পুঁজিবাদে বিশ্বাস

করতো না, চুরি যাবার ভয়ে টাকাটাকে সে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। মুদ্রাটি ফেরত দিলে প্রভু বললেন, 'দুষ্ট, অলস দাস, তুমি কি জানিতে না, আমি যেখানে বপন করি নাই, সেইখানে কাটি, এবং যেখানে ছড়াই নাই, সেইখানে কুড়াই ? (২৫,২৬) তবে পোদ্দারের হাতে আমার টাকা রাখিয়া দেওয়া তোমার উচিত ছিল, তাহা করিলে আমার যাহা তাহা সুদের সহিত পাইতাম (২৫, ২৭)। অতএব, তোমরা ইহার নিকট হইতে ঐ তালেন্ত লও এবং যাহার দশ তালেন্ত আছে তাহাকে দাও (২৫, ২৮), কেননা যে কোন ব্যক্তির নিকটে আছে, তাহাকে দিতে হইবে, তাহাতে তাহার বাহুল্য হইবে, কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে নিতে হইবে (২৫, ২৯)। আর তোমরা ঐ অনুপযোগী দাসকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দাও, সেইখানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে' (২৫, ৩০)।

যিশু-বিশ্বাসী মানুষের চিন্তায় পুঁজিবাদ-বিরোধী যিশুর সঙ্গে তো এ গপ্পো খাপ খায় না, তবু ঈস্টারের পর সপ্তম রবিবারে প্রত্যেক গির্জেয় এ গল্প পঠিত হয়। পৃথিবীর পুঁজিবাদী, ঈশ্বরের বাণীর মহিমা কীর্তন করুন ! আপনাদের অর্থের পরিবর্ধন সাধন করুন !

ম্যাথু বর্ণিত আর একটি ধাঁধা (২৮, ১৬-১৭)। যিশু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তাঁর এগারো জন শিষ্য (যুদাস বাদে) গালিলির কাছে পাহাড়ে উঠলেন। সেখানে তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁরা প্রণাম করলেন। 'কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করিল'। কিন্তু বাইবেল পড়ে একটা কথা বুঝতে পারিনি। যে মানুষটিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, সমাধিস্থও করা হয়েছে যাঁর দেহ, তাঁকেই সামনে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, কী সন্দেহ তাঁদের মনে উদিত হয়েছিল ? তাঁরা কি চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি, নাকি ভেবেছিলেন, ভূত দেখছেন ?

সন্ত মার্কও কয়েকটি চমৎকার গল্প বলেছেন। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, যিশুর আরো ভাই ছিল (৩, ৩১-৩২)। শিষ্য পরিবৃত হয়ে

তিনি যখন বসেছিলেন, তখন তারা এসেছিল তাদের মায়ের সঙ্গে। অলৌকিক-কর্মার আবির্ভাবের কথা জেনে, রাস্তার মানুষ অবাক চোখে দেখতে লাগলো। 'ইহা শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া লইতে বাহির হইল, কেননা তাহারা বলিল, সে হতজ্ঞান হইয়াছে' (৩, ২১)। তাদের কি মনে হয়েছিল, যিশু সাময়িকভাবে পাগল হয়ে গেছেন? (একালে এর সুব্যাখ্যা দিতে পারতো মনস্তত্ত্ব।) বাইরে প্রতীক্ষমান মা-ভায়ের সঙ্গে যিশু দেখা করতে চান না, তাদের সঙ্গে তাঁর যেন কোন সম্পর্কই নেই। তাদের বিদেয় দিয়ে দার্শনিকের মত প্রশ্ন করেছেন, 'কে আমার মা, ভাই-ই বা কে?' (৩, ৩৩), তারপর যে উত্তরটি দিয়েছেন, সেটি বড় সোজা নয়, বললেন, 'যে কেহ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা, ভগিনী ও মাতা!' (৩, ৩৫) অস্বস্তিকর পরিস্থিতির ভেতর অশেষ যন্ত্রণায় যে-মা তাঁকে পৃথিবীতে এনেছিলেন, তাঁর প্রতি যিশুর কোন কৃতজ্ঞতা বোধ দেখতে পাচ্ছি না।

জন তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন যর্দনে, বহু লোক তাঁকে সেখানে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সকলের উদ্দেশে তিনি বলেছেন,… 'অনুশোচনার প্রয়োজন পাপমোচনের নিমিত্ত' (১,৪)। পরে মার্কের সুসমাচারেই আছে, যিশু জনের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং দীক্ষাও নিয়েছেন তাঁর কাছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে স্বাভাবিকভাবেই, ঈশ্বরপুত্রেরও কি পাপ ছিল?

* * *

কালের দূরত্ব এবং পুঁথিপত্রের প্রাচীনতাজনিত অসঙ্গতি মার্জনীয়। কিন্তু একই সঙ্গে যদি একটা আর একটার ওপর টেক্কা দেয়, তাহলে তা ব্যাখ্যা করার জন্যে ব্রহ্মবিদ্যাগত ডিগবাজির একান্ত প্রয়োজন। মার্কের সুসমাচার অনুযায়ী, যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, 'ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, কিন্তু

ঐ সকল বাহিরের লোকের নিকট সকলই রূপক দ্বারা বলা হইয়া থাকে' (৪, ১১), অস্যার্থঃ, বন্ধুগণ, তোমরা আমার প্রত্যেকটি কথা বুঝতে পারো বটে, কিন্তু বাইরের লোকের কাছে কথাগুলোকে আমি রূপক দিয়ে ব্যাখ্যা করি। ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে তিনি রেগে গেছেন শিষ্যদের ওপরে, তারা রূপক বুঝতে পারেনি বলে, 'এই রূপকটি কি তোমরা বুঝিতে পার না? তবে কেমন করিয়া সকল রূপক বুঝিতে পারিবে ?'

শিষ্যরা যিশুর কথা কোন কালে ঠিকমত বুঝতে পেরেছিল বলে সন্দেহ জাগে। ম্যাথুর সুসমাচার অনুযায়ী (১৩, ১১), যিশু বলেছেন, '......স্বর্গরাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদিগকে জানিতে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই'। যারা বোঝে না, তাদের ওপরে স্থান দিয়েছেন তাঁর শিষ্যদের কারণ, 'ধন্য তোমাদের চক্ষু, কেননা তাহারা দেখে, এবং তোমাদের কর্ণ, কেননা তাহারা শুনে' (১৩, ১৬)। তাহলে বুঝতে পারি, তাঁর ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর ভেতর আদান-প্রদানে যে সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করতেন, তা তাদের সকলকারই বোধ্য ছিল। উঁহু, তা ছিল না! বিজ্ঞ পিতরকেও বলতে হয়েছে, 'এই রূপকটি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন' (১৫, ১৫)। যিশু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছেন, 'তোমরাও কি এখন পর্যন্ত অবোধ রহিয়াছ ?' (১৫, ১৬) ঈশ্বরের বাক্যের মর্ম কি তাঁরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, না, পারেননি? যতদূর মনে হয়, পারেননি, কারণ পুনরুত্থানের 'পরেও' যখন তাঁরা তাঁদের গুরুর কাছে আরো ব্যাখ্যা চাইতে পারলেন না, তখন জন বলেছেন, তাঁরা বুঝতে পারেননি।

মার্ক বলেছেন, জন যিশুকে বলেছিলেন, 'আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার নামে ভূত ছাড়াইতে দেখিয়াছিলাম, আর তাহাকে বারণ করিতেছিলাম' (৯, ৩৮)। যিশু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'তাহাকে বারণ করিও না, কারণ এমন কেহ নাই, যে আমার নামে অলৌকিক কার্য

করিয়া সহজে আমার নিন্দা করিতে পারে' (৯, ৩৯)। এই কথাটি ম্যাথুর সুসমাচারে আর এক ভাবে বলা হয়েছে। সেইখানে আছে, 'হে প্রভু, আপনার নামেই কি আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করি নাই? আপনার নামেই কি আমরা ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি আমরা অলৌকিক কার্য করি নাই?' (৭, ২২) তারপরই এসেছে খাঁটি জননেতাসুলভ উত্তর, 'তখন আমি স্পষ্টই তাহাদিগকে বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই, হে অধর্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও' (৭, ২৩)। পদ্ধতিটা 'মাকিদের' (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ফরাসী গুপ্ত সমিতি) উপযুক্ত হলেও হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে মানুষকে কাজ দিয়ে, পরে তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিতান্তই অশোভন!

* * *

'নূতন নিয়মের' নানা অসঙ্গতির জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ খুঁজে পাওয়া সাধারণ খৃস্টানের পক্ষে বড় সহজ কাজ নয়। ব্রহ্মবিদের কথা অবশ্য আলাদা, তাঁদের যোগাযোগ উর্ধ্বতম লোকের সঙ্গে। পাঠশালের পোড়ো এবং গির্জেয় জমায়েত, বিশ্বাসী মানুষ তাদের এবং তাদের সাকরেদদের মুখ থেকে শোনে, কেমন করে সব কথা বুঝতে হবে এবং কেমন করে সমস্ত তর্কের পথ এড়িয়ে চলবে। তবু যদি সব ব্রহ্মবিৎ এ বিষয়ে এক মত হতেন! তা না হয়ে, আপন আপন সম্প্রদায়গত মত নিয়ে চলে তাঁদের একের সঙ্গে চলে অপরের নিত্য চুলোচুলি, নিত্য খেয়োখেয়ি। আর যে সব কথাকে কোন একটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না, যাদের ব্যাখ্যা দেওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না, তাদের চাপিয়ে দেওয়া হয়, ধর্ম-বিশ্বাসের পরীক্ষা স্বরূপ ওই 'বাইরের লোকদের' মোটা মাথার ওপরে। কিন্তু এ কথাটিই বা কেমন? 'তোমাদের কথা "হাঁ, হাঁ, না, না" হউক'!

বাইবেলের ভেতরে কার কণ্ঠস্বর শুনি ?

বাইবেলের মতে যিশু নাকি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, আদালতে শুনানীর সময়ে সে কথা তিনি স্বীকারও করেছিলেন, বলে শোনা যায়। কিন্তু যিশুর উক্তির যথাযথ অনুবাদ আসলে, 'আমিই' (ঈশ্বরের পুত্র) নয়, যথাযথ অনুবাদ, 'আপনারা বলেন' (আমি ঈশ্বরের পুত্র)। এ হল, আসল কথাটাকে না বোঝাবার মতন করে মুচড়ে নেওয়া, তথা 'আমি এ দাবি কখনো করিনি, আপনারাই ও অভিধা আমাতে অর্পণ করেছেন'! মার্কের সুসমাচারে দেখি, 'যিশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ কেন বলিতেছ? একজন ব্যতিরেকে সৎ কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর' (১০, ১৮)। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, তিনি ঈশ্বর নন। তিনি অবশ্য জানতেন না, ধর্ম-মহাসভাগুলো তাঁকে কোন পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করাবে।

পিতা এবং পুত্র অভিন্ন, এই মতের বিরুদ্ধে যিশুর একটি সরল স্বীকারোক্তি আছে, 'কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন,' (মার্ক—১৩, ৩২)। পিতা এবং পুত্র এক হলে, অর্থাৎ ঈশ্বর এবং যিশু অভিন্ন হলে, দুজনেই তো সেই দূর ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা জানতেন।

প্রধান পুরোহিতেরা যিশুকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন, কারণ তিনি নাকি ঈশ্বরের 'নিন্দে' করেছেন। মহাযাজক জানতে চেয়েছেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র খৃস্ট কি না।

> ম্যাথু অনুযায়ী তাঁর জবাব, 'তুমিই বলিলে' (১৬, ৬৪)।
> মার্ক অনুযায়ী, 'আমিই সেই' (১৪, ৬২)।
> লুক অনুযায়ী তাঁর জবাব, 'তোমরাই বলিতেছ যে আমিই সে' (২২, ৭০)।

সুসমাচারের লেখকদের লেখায় এই বৈষম্যের হেতু বুঝতে অসুবিধে হয় না। তাঁদের কেউই বিচার সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তাঁদের প্রতিবেদন গুজবকে ভিত্তি করে।

জনের বিবরণ বরং আরো বিশদ। বিচার সভায় যিশু আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন, 'আমি সর্বদা সমাজগৃহে ও ধর্মধামে শিক্ষা দিয়াছি, যেখানে ইহুদিরা সকলে একত্রিত হয়। গোপনে কিছু কহি নাই' (১৮, ২০)। মনে হয়, কথাটা অর্ধসত্য—বিদ্রোহীর আত্মপক্ষ সমর্থন। ন্যায়বিরুদ্ধ তাঁহার কিছু কাজের কথা সম্ভবতঃ সভারও জানা ছিল। ম্যাথু তার কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন, 'আমি যাহা তোমাদিগকে অন্ধকারে বলি, তাহা তোমরা আলোতে বলিও এবং যাহা কানে কানে শুন, তাহা ছাদের উপর হইতে প্রচার করিও' (১০, ১৭)। ন্যায়বিরুদ্ধ কাজের জন্যে বিদ্রোহীরা সর্বকালে দণ্ডিত হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ বোধহয় এইখানেই খোঁজা উচিত।

সুসমাচারের লেখকরা সবাই একমত যে যিশুকে দণ্ড দেওয়া হয়েছিল অকারণে। বিচার-সভা এবং মহাযাজকেরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা খাড়া করতে যথাসাধ্য করেছেন, 'তখন প্রধান যাজকগণ ও বিচার-সভা যিশুকে বধ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না' (মার্ক ১০, ৫৫)।

আজ পর্যন্ত জানা যায়নি, কী অপরাধের সংবাদ বিশ্বাসঘাতক জুডাস দিয়াছিল। বিচারকালের কোন প্রতিবেদন সে রেখে যায়নি, শুনানীর সময়েও কখনো তাকে দেখা যায়নি। একটা কথা অবশ্য জানা যায় যে মাতব্বরেরা তাকে ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিল। কিন্তু কেন দিয়েছিল? দিয়েছিল, যে লোকটি সারা শহর চেনে, তাকেই সনাক্ত করবার জন্যে। কিন্তু সনাক্তকরণ-চুম্বন ব্যতীত যদি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের নিশ্ছিদ্র কোন প্রমাণ সে দিতো, তাহলে কি কর্তারা অমন অসহায় বোধ করতেন? তাই ওইখান থেকেই গোটা ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া মোটে ত্রিশ টাকার জন্যে জুডাস নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। আরো কিছু ছিল,

আরো কোন কারণ নিশ্চয়ই ছিল, যা আর কোনদিন আলোর মুখ দেখবে না। জুডাসকে টাকা দিয়ে হয়তো নিশ্চয় বশ করা যেতো, কিন্তু সে মোটে ত্রিশ টাকায় নয়। এসীনদের যেমন সম্প্রদায়গত একটা ধনভাণ্ডার ছিল, যিশুর দলের জন্যেও তেমনি হয়তো জুডাস টাকার ব্যবস্থা করেছে। না, বোধ হয় আরো কিছু ছিল।

যিশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং তাঁকে হত্যার কারণ অন্ধকারেই ঢাকা রইলো।

পন্তিয়াস পিলেতের হাতে যিশুকে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে তার নির্দোষ বলেই মনে হয়েছিল, তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে সে ক্রুশবিদ্ধ করেছে। রাজ্যপাল নিজের গা বাঁচিয়ে বলেছে, 'তোমরা আপনারা ইহাকে লইয়া ক্রুশে দাও, কেননা আমি ইহার কোন দোষ পাইতেছি না' (১৯, ৬)। রোমক শাসনকর্তার সে দেশে অনেক দিনের বাস, সে জানতো ইহুদিরা ক্রুশবিদ্ধ করবে না। ক্রুশে বিদ্ধ করে মারার পদ্ধতি রোমের।

ইহুদিরা বললে, 'আমাদের এক ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। কারণ সে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র করিয়া তুলিয়াছে' (১৯, ৭)। এসব কথা নিয়ে রোমকরা মাথা ঘামাবে কেন ? ধর্মীয় ঝগড়ায় তাদের উৎসাহ নেই। তা সত্ত্বেও জন বলেছেন, 'পিলেত যখন এই কথা শুনিলেন, তিনি আরও ভীত হইলেন' (১৯, ৮)। কিসের ভয় ? তার হাতে তো পুলিশ ছিল, তাছাড়া ছিল সৈন্য-সামন্ত এবং পুরো রাজনৈতিক ক্ষমতা। নীরব যিশুকে সে বলেছে, 'তুমি কি জান না যে, তোমাকে ক্রুশে দিবার ক্ষমতা আমার আছে এবং তোমাকে ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতাও আমার আছে ?' (১৯, ১০)। তাহলে পিলেতের ভয়টা কিসের ? শাসক হিসেবে পিলেত এমনই

অত্যাচারী ছিল যে রোম তাকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। যদি তার ধারণা হত যে যিশু সত্যিই নির্দোষ, তাহলে ইহুদিদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে তাকে ছেড়ে দিতে পারতো। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল বলেই মনে হয়। রাজনৈতিক কারণ একটা নিশ্চয় ছিল, আর এ তো জানা কথা যে রাজনৈতিক কারণের উল্লেখ নথিপত্রে বড় একটা থাকে না।

*　　*　　*

ঈশ্বরের বাণী, তথা বাইবেলে দেখি, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর শেষ কথাগুলি নানা জনের কলমে নানা রকম।

মার্ক (১৫, ৩৪) এবং ম্যাথুর মতে (২৭, ৪৬), 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?'

লুকের মতে (২৩, ৪৬), যিশু চিৎকার করে বলেছেন, 'পিতঃ তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি।'

জনের মতে (১৯, ৩০), তাঁর শেষ কথা, 'সমাপ্ত হইল'। পরে মস্তক অবনত করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।'

যিশুর সমাধিতে মেয়েদের যাওয়ার ব্যাপারেও চার লেখকের ভেতর মতভেদ আছে।

মার্ক বলেছেন (১৬, ১-৮), 'মেরী মগ্দলিনি জেমসের মা মেরী এবং সালোমী' যিশুর দেহে লেপনের নিমিত্ত গন্ধদ্রব্য কিনলেন। পথে যেতে যেতে তাঁদের চিন্তা হল, সমাধি-প্রস্তর তুলবেন কেমন করে। কিন্তু গিয়ে দেখলেন, পাথর খোলা এবং শুভ্রবস্ত্রমণ্ডিত একটি তরুণ সমাধিগহ্বরে উপবিষ্ট। তিনি বললেন, 'ভয় পাবেন না। যে যিশুকে আপনারা খুঁজছেন, তিনি পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন। একথা শিষ্যদের জানাবেন।' মেয়েরা কিন্তু ভয় পেয়ে ছুটে পালালেন। 'আর তাঁহারা কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কেননা, তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন।'

জন (২০, ১-২) বলেছেন অন্য কথা। 'সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে মেরী মগ্দলিনি কবরের নিকট যান, আর দেখেন কবর হইতে পাথরখানা সরান হইয়াছে। তখন তিনি দৌড়িয়া সিমোন পিতরের নিকটে এবং যিশু যাহাকে ভালবাসিতেন সেই অন্য শিষ্যদের নিকটে আসিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, লোকে প্রভুকে কবর হইতে তুলিয়া লইয়া কোথায় গিয়াছে জানি না।'

লুক (২৪, ১-৬) বলেছেন, স্ত্রীলোকেরা খোলা কবরের কাছে গিয়েছিলেন, কারুর নাম তিনি করেননি। ভারাক্রান্ত মনে তাঁরা ভাবছেন, যিশুর কী হল ? এমন সময়ে উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাঁদেরই বললেন, 'মৃতের মধ্যে জীবিতের অন্বেষণ কেন করিতেছ ? তিনি এখানে নাই, তিনি উঠিয়াছেন।'

ম্যাথু (২৮, ১-৯) গোটা ঘটনাটায় একটা বিরাট নাটকীয়তা আরোপ করেছেন। মেরী মগ্দলিনি এবং জেমসের মা মেরী বন্ধ কবরের কাছে গেলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তখনই একটা ভূমিকম্প শুরু হল এবং প্রভুর দূত স্বর্গ হতে নেবে এসে পাথরখানা সরিয়ে তার ওপর বসলেন। দেবদূতের মুখ বিদ্যুৎপ্রভা সদৃশ উজ্জ্বল এবং পরিচ্ছদ তুষারশুভ্র। তিনি তাঁদের দেখালেন যিশু কোথায় শুয়েছিলেন। বললেন, তিনি উঠে গেছেন। তারপর বললেন, তাঁরা যেন এক্ষুনি গিয়ে শিষ্যদের একথা জানান। যিশুর সঙ্গে তাঁদের পথে দেখা হওয়ার ঘটনাটা কিন্তু কবর দেখার সঙ্গে আর যুক্ত নেই।

বাইবেলের অসংখ্য সহ-লেখকদের কি উচিত ছিল না পুনরুত্থানের মূল ঘটনাটার বিবরণে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখা ? বোধাতীত কোন কারণে যদি ঈশ্বরের বাণীর কিম্বদন্তীগত মূল পাঠে বিবরণের অসঙ্গতি থেকেও থাকতো, তাহলে সাধারণ সরল বাইবেল পাঠকের কল্যাণে কেটে-ছেঁটে, জুড়ে সুসমঞ্জস করা উচিত ছিল। সে কাজ

করা হয়নি বলেই তারা চিরকাল প্রশ্ন করবে, ঘটনাটা আসলে কী ঘটেছিল ?

শিষ্যদের মনেও সেই বিস্ময়কর ঘটনার প্রতিক্রিয়া প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা মেয়েদের গল্পের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেননি। সে মেয়েদের দলে তুটি মেরী এবং যোয়ান্না থাকা সত্ত্বেও। 'এই সকল কথা তাঁহাদের কাছে গল্পতুল্য বোধ হইল, তাঁহারা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন না' (লুক ২৪, ১১)। জনও বেশ জোর দিয়ে বলেছেন, 'কারণ এ পর্যন্ত তাঁহারা শাস্ত্রের এই কথা বুঝেন নাই যে মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠিতে হইবে।' কথাটা সম্পূর্ণ তুর্বোধ্য। চারটে পুঁথির ভেতর সুসমাচারের লেখকরা আগাগোড়া যিশুর ঘোষণা ব্যক্ত করেছেন। সে ঘোষণার অর্থ, তাঁর মৃত্যু হবে এবং পুনরায় তিনি উত্থিত হবেন। তবু শেষ পর্যন্ত তাঁরা সে কথার একবর্ণও বোঝেননি।

এমনকি, চরম সত্যের স্বর্গীয় প্রেরণা ব্যতীত যিশুর স্বর্গারোহণের কাহিনীতে অসঙ্গতি বিগুমান।

ম্যাথুর কথা অনুযায়ী যিশু তাঁর শিষ্যদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন গালিলি পাহাড়ের কাছে, বলেছিলেন, সেখানেই ঘটবে তাঁর আবির্ভাব। শিষ্যরা তাঁকে দেখে প্রণাম করলো, 'কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করিলেন'। তখনো সন্দেহ ? স্বর্গারোহণ সম্পর্কে ম্যাথু কোন কথা বলেননি।

মার্ক (১৬, ১৯) শুধু একটি বাক্যে অমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবৃতি শেষ করেছেন, 'তাঁহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যিশু উর্ধ্বে স্বর্গে গৃহীত হইলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন'। সহজ, সরল কথা !

লুক (২৪, ৫০-৫১) বলেছেন, যিশু নিজে শিষ্যদের 'বেথানিয়ার সম্মুখ পর্যন্ত লইয়া গেলেন', তারপর তাঁদের আশীর্বাদ করতে করতেই 'তাঁহাদের হইতে পৃথক হইলেন এবং উর্ধ্বে স্বর্গে নীত হইলেন'।

জন (২১) যিশুর স্বর্গারোহণ সম্পর্কে কোন উচ্চ-বাচ্য করেননি।

বাইবেলের ভেতরে কার কণ্ঠস্বর শুনি ?

যিশুর জীবনের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, নিঃসন্দেহে তাঁর পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণ। বাইবেলে নথিভুক্ত সমস্ত ঘটনাবলীর তুলনামূলক আলোচনায় এই দুটি মাত্র ঘটনাকে আমি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে স্বীকার করি। সুসমাচারের লেখকরা কত কত তুচ্ছ ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন, কিন্তু এমন দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে কেন যে মুখ খোলেননি, বুঝতে পারি না, অথচ এই দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে গোটা খৃস্টান ধর্মমত কত রঙে, কত ছন্দে, ভাষার কত ললিত নিপুণ মাধুর্যে।

যিশু যদি সকলকার চোখের সামনে, নিদেন শিষ্যদের চোখের সামনেও সশরীরে স্বর্গারোহণ করতেন, তাহলে সে খবর দাবাগ্নির মত জেরুসালেমের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়তো, কেননা লোকে যে তাঁর বিচারে এবং ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ কৌতূহলী ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, রোমক অথবা ইহুদি ঐতিহাসিকদের একজনও অমন প্রগাঢ় বিস্ময়কর ঘটনাটি সম্পর্কে একটি বাক্যও ব্যয় করেননি! সুসমাচার লেখকরাও শুধু একটা দায়-সারা খসড়া মাত্র দিয়েই কাজ শেষ করেছেন। তাছাড়া তাঁরা সে ঘটনা চাক্ষুষও করেননি। জিনিসটা গোলমেলে।

* * *

কোটি কোটি খৃস্টানের ভেতর আমিও একজন। তাদেরই মতন আমিও মায়ের কোল থেকেই খৃস্টান অনুশাসনে শাসিত, সে-ধর্মের ক্ষাকল্পে করও দিয়ে আসছি বটে, কিন্তু কোন উৎপীড়ক ধর্মে আমি বিশ্বাস করি না। নাজারেথের যিশুকে কেন্দ্র করে যে নাটক লেখা হয়েছিল, সে নাটক আমি ভালবাসি। খৃস্টান সংস্কৃতিপ্রসূত চিত্র-ভাস্কর্য-সঙ্গীত আমার প্রিয়। মানবচরিত্র গঠনে সহায়ক খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রশাসিত প্রায় সমস্ত রীতি-নীতির আমি সমর্থক। সে রীতি-নীতি যে সব ধর্ম, সব পুরাণ, সব কিম্বদন্তীর সার।)

যেহেতু খৃস্টান ধর্মের গণ্ডীর ভেতর আমার জন্ম, তাই আমি মুক্তির অধিকারী, একথা আমি সর্বান্তঃকরণে অস্বীকার করি। কারণ আমি বুদ্ধ-মহম্মদের ধর্মমতকে খৃস্টের ধর্মমতের চেয়ে ছোট করে দেখতে পারি না।

কোটি কোটি ধার্মিক খৃস্টান বাইবেলের পটভূমি সম্পর্কে হয় কিছুই জানেন না, অথবা জানলেও যৎসামান্যই জানেন। ফলে বংশ পরম্পরায় তাঁরা বাইবেলকে 'ঈশ্বরের বাণী' বলেই মেনে এসেছেন। তাঁরা ধরে নেন যে যিশুই খৃস্টান ধর্মমতের প্রথম প্রচারক। কিন্তু একথা আজ প্রমাণিত সত্য যে মরুসাগর তীরের এসীনদের কাছ থেকেই তিনি তাঁর মতবাদের মূল কথাটি গ্রহণ করেছিলেন। খৃস্টান মতবাদ এবং নীতির বেশীর ভাগটাই যে প্রাচীন ধর্মসমূহের কাছে ধার করা তার নজির আমার হাতের কাছেই আছে,—ডাঃ রবের্ৎ কেল্-এর (২৭) লেখা। নজিরের সেই পাহাড় থেকেই কিছু বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

* * *

> ধর্ম বা নীতির এমন কথা একটিও নেই যা প্রাচীন অথবা সমসাময়িক নানা ধর্মশাস্ত্রে মেলে না। বর্তমান খৃস্টধর্ম তথা পলের ধর্মীয় এবং সমসাময়িক জীবন মূলতঃ গ্রীসের গূঢ় ধর্মমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত (সে-ধর্মমত গৃহীত মিসরীয় এবং প্রাচ্যের ধর্মমত থেকে)। যত কিছু দিয়ে আধুনিক পলীয় খৃস্টধর্ম গঠিত, তার সবই পাওয়া যাবে, আত্তিস্ ডায়োনিসাস, মিত্র এবং আইসিসের ধর্মমতে (ক)। (ক থেকে ঝ পর্যন্ত গ্রন্থপঞ্জীতে আলাদা করে দেখানো আছে

প্রতিটি গূঢ় ধর্মমতে একটি করে কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকেন, তিনি ত্রাতা, পলের যিশুর মত, ঈশ্বরপুত্র। তাঁকেই বলা হয়েছে 'প্রভু'। এসব ধর্মমতে ঈশ্বরপুত্রের যন্ত্রণা-ভোগ এবং মৃত্যু একটি চূড়ান্ত

নিশ্চিত ঘটনা। সেখানে ক্রুশবিদ্ধ দেবতাদের কথাও আছে। এসব ধর্মে মুক্তির কথায় যেমন স্বর্গারোহণের কথা আছে, তেমনি আছে দেবতার নরক গমনেরও বহু প্রচলিত ধারণা। ত্রয়ীর কল্পনাও আছে। উদাহরণস্বরূপ বলতি পারি, প্রাচীন মিশর এবং ভারত। মিত্র এবং ডায়োনিসাসের নামে রোগগ্রস্ত হত নীরোগ, প্রাণস্পন্দন জাগতো মৃতের দেহে, সাগর শান্ত হত, জল পরিণত হত সুরায়। এমনি আরো কত কি হত তাঁদের নামে। ঈস্টার উৎসবও যাপিত হত (পুনরুত্থান উৎসব), আমাদের এই খৃস্টানধর্মের মতই। খৃস্টানধর্মের নিজস্ব মতবাদ বলে পরিচিত 'মুক্তিবাদ', তাও নতুন নয়, গূঢ় ধর্মসমূহে তাও ছিল সম্পূর্ণভাবে। এমন কি, খৃস্টধর্মের মূলতত্ত্ব, আদি পাপও নতুন নয় (পারসীক মিত্র ধর্মে তা আছে)। দীক্ষার পূর্বে উপবাস এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রচলিত ছিল গ্রীসের নানা গূঢ়ধর্মে। পবিত্র নৈশভোজ, যার অপর নাম প্রভুর অন্ন, ঈশ্বরের নৈবেদ্য, পুণ্যাত্মার আহার অথবা সাধু-সন্তের সেবা, তার সঙ্গে খৃস্টের নৈশভোজের সমূহ মিল দেখা যায়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, গূঢ়ধর্মে সে-ভোজে আহার করা হত তাদের দেবতার দেহ এবং পান করা হত দেবতার রক্ত—খৃস্টের নৈশভোজ পর্বেরই মত। নৈশভোজের জন্যে যে রুটি তৈরী হত, সে রুটি ছিল প্রভুর শেষ নৈশভোজে ব্যবহৃত ক্রুশচিহ্নিত রুটির মত। আজকের ক্যাথলিক গির্জেয় অনুষ্ঠিত উৎসবে অন্ন এবং সুরাকে খৃস্টের দেহ এবং শোণিতে রূপান্তরণকালে যে কথাগুলি উচ্চারিত হয়, সেগুলিও নতুন নয়,—'সাতবার উচ্চারণ কর, তুমি সুরা, তুমি সুরা নহ, আথেনার রক্ত তুমি। তুমি সুরা, তুমি সুরা নহ, ওসাইরিসের রক্ত তুমি, ইয়াও-এর অন্ত্র'।

পুণ্যাত্মার এই আহার্য মারফৎ বিশ্বাসীজন পেতো পুনর্জন্ম, 'তারাই ত্রাত', মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটতো তাদেরই কপালে, অমর হত তারা আর যারা তা পেতো না, তাদের বরাতে জুটতো দুঃখ, কষ্ট, অখণ্ড নরক।

সেই অন্নই গূঢ় ধর্মে দীক্ষিতদের পরিণত করতো 'ঈশ্বরের সন্তানে'। ভগবান তাঁদের নিয়ে যেতেন, তাঁর আপন আলয়ে, তাঁর সঙ্গে একাত্মা হতেন তাঁরা। সে অন্ন-পান যেন ঈশ্বরের সঙ্গে একসঙ্গে ভাগ করে খাওয়া—ভাবটা এই রকম।

ঈশ্বরপুত্র, তথা ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার জীবনের সঙ্গে যিশুর জীবনের অদ্ভুত মিল দেখা যায়। এ সাদৃশ্য শুধু গূঢ়ধর্মেই দেখা যায় না, প্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, এবং প্রাক্‌খৃস্ট ধর্মসমূহেও এ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এর শুরু, 'মানবের ত্রাতা এবং মোক্ষদাতা' রূপ ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে (খ)। যেমন ধরুন, জরথুস্ত্রপন্থীদের বলা হত, 'সমগ্র পৃথ্বী তাকে কামনা করে, তিনি ঈশ্বরের বার্তাবাহী আহুর মাজদা'। ত্রাতাদের জন্ম সাধারণতঃ অতিপ্রাকৃত উপায়ে (গ)। কুমারী মাতার গর্ভজাত হওয়ার কাহিনীও নতুন নয়, যিশুর আগেও তা জানা ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলতে পরি, বুদ্ধ এবং জরথুস্ত্রর কথা। বুদ্ধের জন্ম-সম্পর্কে শোনা যায়, মায়াদেবীর কুমারী-গর্ভে এক দিব্যালোক প্রবেশের ফলে বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল। (আমি তো এতকাল জেনে এসেছি, গৌতমকে গর্ভে ধারণ করবার আগে মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেছিলেন, একটি শ্বেত হস্তী তাঁর গর্ভে প্রবেশ করছে! এ সম্পর্কে কোন সহৃদয় পাঠক যদি সবিশেষ জানান তো কৃতার্থ বোধ করবো।—অনুবাদক) ধর্মপ্রতিষ্ঠাতাদের জন্মের ক্ষেত্রেও অদ্ভুত মিল দেখা যায় (ঘ)। যিশু ছাড়া অন্যান্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের কেউ কেউ জন্মেছেন গরুর ডাবায়, কাউকে আবার ন্যাকড়া জড়িয়ে ডাবায় রাখা হয়েছিল। অন্য ধর্মেও দেখা যায়, ত্রাতার জন্মস্থান উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিম্বা স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছে। রাখালদের আহ্লাদও বাদ যায়নি। যিশুর মত কৃষ্ণেরও (বিষ্ণুর অষ্টমাবতার) জন্মের পরে ছিল ঈর্ষাপরায়ণ নৃপতির আদেশ, নবজাত সমস্ত শিশুকে মেরে ফেলতে হবে।

শিশুকে মন্দিরে উৎসর্গ করার কথাও বিরল নয়। আরো একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, প্রতিটি ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা অনাহারে নির্জনে তপস্যাকালে 'মার' কর্তৃক প্রলুব্ধ হয়েছেন (ঙ)। এক্ষেত্রেও সে বিবরণ বাইবেলের সঙ্গে মেলে, যথা 'মার' প্রথমে দেখিয়েছে আহারের, পরে রাজত্বের লোভ, পরিবর্তে চেয়েছে, ঈশ্বরকে ছেড়ে তার (মারের) পায়ে আত্মসমর্পণ।

গৌতম যখন বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, তখন মেদিনী কম্পমান হল, সেই সঙ্গে হল দৈববাণী, 'অমরত্ব প্রাপ্ত হও'। (যিশুর বেলায় দৈববাণী হয়েছিল, 'এই আমার প্রিয় পুত্র···'।) এসব স্বর্গীয় পুরুষদের মহাপ্রয়াণেও মিল দেখতে পাই। সবাই আখ্যাত হন বিশ্বত্রাতা বলে। সীজার যখন মারা যান, শোনা যায় ধরণী তখন তমসাচ্ছন্ন হয়েছিল, দ্বিধা হয়েছিল ধরিত্রী, মৃতের ঘটেছিল পুনরাগমন (চ)। যেসব ঈশ্বর-পুত্রদের রূপান্তর ঘটেছিল এ পৃথিবীতে, তাঁদের পুনরুত্থানের কথা যিশুর আবির্ভাবের আগেও জানা ছিল। যিশুর সমসাময়িক এবং বলতে গেলে, এক ধরনের প্রতিরূপও বটে, আপোলোনিয়াস পুনরুত্থিত হয়ে তাঁর শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন। গূঢ় ধর্মসমূহের এবং তাদেরও আগে মিশরে এবং বেবিলনেও 'আমিই দ্রাক্ষা' এবং যাজকীয় বাণী 'আমিই সৎ মেষপালক' কথা দুটিও জানা ছিল (ছ)। খৃস্টানদের নির্যাতনের মত গূঢ়ধর্মের অনুগামীদের নির্যাতনও যেন রীতিগত ব্যাপার ছিল। ডায়োনিসাসের যন্ত্রণাভোগ-কালে তাঁকে বিদ্রূপ করা আর যিশুর যন্ত্রণাভোগকালে বিদ্রূপ করা, হুবহু একই ধরনের ঘটনা। যিশুর পূর্ববর্তী ধর্মপ্রতিষ্ঠাতাদের বেশির ভাগ, বিশেষ করে প্রাচীন পৃথিবীর এবং দূরপ্রাচ্যের ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতারা যিশুর মতই অলৌকিক কর্মা ছিলেন (জ)। জলকে সুরায় পরিণত করার মত অলৌকিক কর্ম ডায়োনিসাসের কাহিনীতেও মেলে। অমনতরো অলৌকিক কাণ্ড আরো আছে, যথা দূরস্থিত দুরারোগ্য রোগীকে চোখে না দেখেই তার রোগ

নিরাময়, বৃদ্ধকে যৌবন দান, ক্ষুধার্তের ক্ষুধা প্রশমন, অন্ধকে দৃষ্টিদান, পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন, মূককে ভাষা দান ইত্যাদি। তিন লক্ষ লোককে ভোজ্য বিতরণ, সেও বড় কম অলৌকিক কাণ্ড নয়।

যিশুর মত বুদ্ধও আপনাকে বলেছেন, 'তিনিই সত্য', জরথুস্ত্র ঘোষণা করেছিলেন, 'দেবদূতদের সঙ্গে তিনি ফিরে যাবেন', আর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'পৃথিবী তাঁকে চিনতে পারেনি' (ঝ)।

* * *

এ বক্তব্য শেষ করার আগে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে বাইবেলের বিশেষ করে সুসমাচারের সঙ্গে তুলনা করছি—

বাইবেল	অখৃস্টান ধর্মশাস্ত্র
হে ঈশ্বর তোমার তুল্য কেহ নাই	ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ)
রাজ্য তোমার, মহিমা এবং শক্তিও তোমার	হে মাজদা, রাজ্য তোমারই, শক্তিও তোমার (জরথুস্ত্র)
দুষ্টকে শিষ্ট করা হইবে	যাহা অশিষ্ট তাহাকে শিষ্ট করা হইবে (তাও)
কারণ তোমাদিগের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন	তোমাদিগের জন্য অদ্য ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জন্মদান করিয়াছেন, বংশবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে (গুহ্য ধর্ম)
নারীগণের মধ্যে তুমিই ধন্য	সব্ববোযিত্থুত্তমা (পালি জাতক)
পৃথিবীকে দণ্ডিত করিতে ঈশ্বর তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করেন নাই	লোগস (হেরাক্লিস) আছেন, ক্ষতি করিতে অথবা দণ্ড দিতে নহে,

বাইবেলের ভেতরে কার কণ্ঠস্বর শুনি ?

তাঁহাব দ্বারা পৃথিবী ত্রাণপ্রাপ্ত হইবে বলিয়াই তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন	তিনি আছেন ত্রাণ করিতে (গুহ্য ধর্ম)
আমি জগতের দীপ্তি	বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ)
আজ (ধর্মশাস্ত্র) পূর্ণ হইল	কাল পূর্ণ হইল (অসুরবানিপাল)
অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর। তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও	য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ ভক্তে স্বভিধাস্যতি··· ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃতম্। (গীতা)
যে অন্বেষণ করে, সেই পায়	যে সন্ধান করিবে, সেই পাইবে (তাও)
যে ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়া পিছন ফিরিয়া চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযুক্ত নয়	যে জগৎ চিন্তায় মগ্ন, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের সে অনুপযুক্ত (তাও)
তাহারা পাপের ভারে নত	পাপোহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভব (মহানির্বাণতন্ত্র)
তোমাদের পাপসকল সিন্দুরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইবে	অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ (গীতা)
ঈশ্বর সহায় হইলে কে আমার বিপক্ষে থাকিতে পারে ?	আমরা শক্তিলাভ করি ঈশ্বরের নিকট হইতে, আমাদের বিরুদ্ধাচরণ কে করিবে ? (জরথুস্ত্র)

যে জীব আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহার মৃত্যু নাই	কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি (গীতা)
তোমার চাহিবার পূর্বেই তোমার পিতা (ঈশ্বর) জানেন তোমার কী প্রয়োজন	তোমার প্রশ্ন এবং তোমার অভিযোগের কথা আমি পূর্ব হইতেই জানি (জরথুস্ত্র)
ধন্য যাহারা দয়াশীল	হৃদয়ে যাহার ক্ষমা, যুদ্ধে জয়ী হয় সেই (তাও)
আপনাকে যে মহৎ মনে করে তাহার পতন অনিবার্য	অতি দর্পীর উন্নতি সামান্যই ঘটে (তাও)
ধন্য যাহারা নির্মলান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে	নির্মল হৃদয় যাহারা, তাহারা ইহলোকেও সুখী, পরলোকেও সুখী (জরথুস্ত্র)
আমার পিতার বাটিতে অনেক বাসস্থান আছে	প্রেমের দেবদূত···আমাদের জন্য অনেক বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন (জরথুস্ত্র)
স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে	স্বর্গ তোমার হৃদয়ে (বৌদ্ধ)
পিতা, তুমি আমাতে, আমি তোমাতে	আমার অন্তরে বিরাজ কর (গুহ্য ধর্ম)
নারি, তুমি কাঁদিতেছ কেন ? আমি আমার পিতার নিকট যাইতেছি	মা, রোদন করিও না, আমি স্বর্গে যাইতেছি (গুহ্য ধর্ম)
পিতা, তোমার হস্তে আমার আত্মাকে সমর্পণ করিলাম	আমার আত্মাকে নক্ষত্রলোকে লইয়া যাও, ইহাই তোমার নিকট আমার প্রার্থনা (গুহ্য ধর্ম)

যদি কেহ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইসে, তাহা হইলে সে আপনাকে অস্বীকার করুক এবং তাহার ক্রুশ বহন করিয়া আমার অনুগমন করুক।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, সমস্ত যন্ত্রণার ভার আমার স্কন্ধে লইতেছি। আমি বিমুখ করি না, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি না (বৌদ্ধ)

যাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে···স্ত্রী অথবা পুত্রকন্যা, অথবা···আমার নামের কারণে···

অর্থমনর্থং জায় নিত্যং······কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ···(মোহমুদ্‌গরঃ)

*　　　*　　　*

সিঙ্গাপুরের দর্শন এবং ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যাপক রোলান্দ পুচ্চেত্তি খৃস্টধর্মের মূল সমস্যা, অর্থাৎ তার বিশ্বজনীনতার দাবি সর্বজনগ্রাহ্য কিনা, সেই প্রশ্নের সমাধানে আগ্রহী। পুচ্চেত্তির মতে, সে দাবি গ্রাহ্য হলে বেশির ভাগ মানুষকেই মোক্ষলাভে বঞ্চিত থাকতে হয়, কেননা খৃস্টের কথা, তাঁর শিক্ষার কথা শোনবার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। পুচ্চেত্তি (২৮) বলেন, যিশুর বাণী যদি সারা পৃথিবীর মানুষের সাধারণভাবেও জানা থাকতো, জানি, তা সত্য নয়—তাহলেও বলা যায়, মহাবিশ্বের খুব কম বুদ্ধিমান মানুষেরই তা শ্রুত হত। অপর পক্ষে বিশ্বজনীনতার দাবি করতে গেলে, প্রতিটি জীবিত মানুষকেই যে মোক্ষের বাণী শোনানো দরকার, এবং দরকার সে মুক্তির ভাগ দেওয়া।

অধ্যাপক ই. এল. ম্যাস্কাল (২৯) বলেন, খৃস্টান ব্রহ্মবিদ্যার ধারায় একটা কথা খুব পরিষ্কার যে মুক্তির অর্থ, ঈশ্বরের পুত্র যাদের ত্রাণ করতে এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে তাঁর একাত্মীভবন। ম্যাস্কালের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ঈশ্বরের পুত্রের মানবজন্ম পরিগ্রহ করবার উদ্দেশ্য, তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে ঈশ্বরের সন্তানে পরিণত করা। তবে

তার জন্যে অগণিত অবতারের আবির্ভাব এবং সেই সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হবার ভয়ে ভীত হবার কোন হেতু নেই, কারণ, তাঁর কথায় খৃস্টের পুনরভ্যুত্থানের দ্বারা যে মানুষের মুক্তি এসেছিল, তা প্রমাণিত হবে, অন্যত্র তার পুনরাবৃত্তিতে। অর্থাৎ একটি ক্ষেত্রে যদি শাশ্বতে-নশ্বরে, একদেহে মিলন ঘটতে পারে, তাহলে অন্যান্য আরো ক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে না কেন?

ওই ধারণার সূত্র ধরে অধ্যাপক পুচ্চেত্তি সিদ্ধান্ত করেছেন যে একটি দেহী সত্তা একাধিক দেহী সত্তায় কখনোই পরিণত হতে পারে না, তবে একই সঙ্গে বহু অজৈব বিদেহী সত্তার প্রতিরূপ হয়তো সে হতে পারে। '…বিদেহী সত্তা যে কোন সময়ে সর্বত্র বিরাজ করতে পারে, কিন্তু দেহী সত্তা যে কোন সময়ে বিশ্বের একটি স্থানে ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে পারে না।' ব্রহ্মবিৎ হিসেবে পুচ্চেত্তি অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, ধর্মীয় দার্শনিক ব্যাখ্যায় তাঁর বিজ্ঞানসম্মত সর্বাধুনিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে। মূল প্রশ্ন, তথা ঈশ্বরের পুত্র কেমন করে এ বিশ্বে বহু বার মানবজন্ম পরিগ্রহ করলেন এবং সম্ভবত $১০^{১৮}$ জায়গায়, সেই সঙ্গে বহু-দেহী না হওয়া সত্ত্বেও? তারই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর সিদ্ধান্ত, এ ঘটনা অসম্ভব, তবে সেই সঙ্গে বলেছেন, যদি আমরা ওপরের ওই সংখ্যাটিকে জানা ছায়াপথমণ্ডলীর ভেতর বহির্জাগতিক স্বাভাবিক মানুষের সম্ভাব্য সমাজ সংখ্যা হিসেবে ধরে নিই (ওইটিই ছায়াপথসমূহের প্রায় $\frac{২}{১০}$) এবং যদি নাজারেথের যিশুর জীবৎমানকে ঈশ্বরপুত্রের অবতারের গড়পড়তা আয়ু বলে ধরে নিই, তাহলে প্রতি গ্রহে জন্ম থেকে পুনরুত্থানের আগে পর্যন্ত পর পর ঈশ্বরপুত্রের ৩৪×১০^{১৮} বছর লাগবে। আমাদের ছায়াপথে যে তারার গ্রহমণ্ডলে বুদ্ধিমান জীবন বিকাশের সম্ভাব্য শর্তাবলী বিগুমান, সে-তারার সম্ভাব্য জীবৎকাল $(১—৫) \times ১০^{১০}$ বছর! এই সংখ্যাটি যদি বাকি সমস্ত জানা-

আন্তঃছায়াপথ বিশ্বের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করি, তাহলে ৬৮০,০০০.০০০ থেকে ৩৪০০,০০০,০০০ জন অবতারকে একই সঙ্গে আবির্ভূত হতে হবে, আজ থেকে সমস্ত তারার মৃত্যুদিন পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের ভেতর। এ সংখ্যা থেকে পূর্বাবির্ভূত অবতারদের বাদ দিলে সংখ্যাটা একটু কমবে বটে, তবে হেরফের বড় একটা হবে না।

ভগবান যদি শুধু যে কোন একটি বুদ্ধিমান সমাজের একটি মাত্র দেহীর মূর্তি ধারণ না করে, সে-সমাজের সমগ্র সত্তার মূর্তি পরিগ্রহ করে থাকেন তাঁর পুত্রের মাধ্যমে, অর্থাৎ তাঁর আপন ব্যক্তিত্ব সংক্রমিত করে থাকেন সমগ্র সমাজজীবনে, তাহলে খৃস্টান অর্থে ধরে নেবো, সমগ্র বিশ্বে বহু দেহধারী পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন একই সময়ে। নিম্নোক্ত অনুমান থেকে পরিস্ফুট হবে, খৃস্টধর্ম অনুযায়ী তার অর্থ কী ? ধরা যাক, পঞ্চাশ আলোবছর দূরের কোন সমাজের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি, তাই আমাদের 'নূতন নিয়ম' একখানি তাদের কাছে পাঠালুম। তার জবাবে আমরা 'তাদের' যিশুর একখানি দূরেক্ষণ ছবি পাবো। সে-ছবিতে দেখবো, হাতে তাঁর নটা করে আঙুল, চারটে পা, নীল, মোটা চামড়া, আর হাড়গুলো বেশ লম্বা লম্বা। তখন প্রায় বলতেই পারবো না যে 'তিনিই যিশু', কেননা সে কথা বলার অর্থ, 'উনিই ঈশ্বরের পুত্র, ওই রূপে আবির্ভূত হয়েছেন তোমাদের কাছে'। প্রচলিত মতের এ নিছক বিরুদ্ধাচরণ, যাকে বলে ডোসীটবাদ ! Docetism = ডোসীটবাদ বলে, যিশুর দেহ শুধু একটা আভাষ, অথবা 'ঈথারীয়' বস্তু। প্রচলিত ধর্মমতবিরুদ্ধ এ ধারণা দ্বিতীয় শতাব্দীর।

অপর পক্ষে তাঁরও ঐশ্বরিক সত্তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারবো না, (তিনিও যে 'আমাদের' যিশুর মতই তাঁর ধর্মোপদেশ দিয়েছেন পাহাড়ের ওপরে, তাদেরই পাপে তিনিও যে ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেছেন, এমনি আরো সব খৃস্টোচিত কাজ যে তিনিও

করেছেন) কারণ নাজারেথের যিশুর মত তাঁরও যে সমান অধিকার বর্তমান। এতে আমাদের আর করবার কী আছে? আমাদের ছিল নাজারেথের যিশু, 'তাদের' ছিল 'অমুক খৃস্ট'। দুজনের রূপেই দেহধারণ করেছিলেন, স্বয়ং ঈশ্বর এবং দুটো সমাজকেই খৃস্টের 'মানব সত্তা' অথবা 'অমুক সত্তার' অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, দুটি ক্ষেত্রেই তাঁরা পরিগণিত হবেন ঈশ্বরের বাণীর অবতাররূপে। কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র যদি একবারই জন্মে থাকেন, তাহলে একই সঙ্গে কেমন করে তিনি একটা 'পুরো মানুষ' এবং একটা 'পুরো অমুক' হতে পারেন, তথা দুটি দেহী সত্তা একই সঙ্গে কেমন করে সম্ভব? দুটি দেহী পুরুষ এক হতে পারেন না। আরো একটা কথা, সেই 'অমুক খৃস্টকে' আমাদের যিশুর মতই পূজো করবার যথেষ্ট যুক্তি আছে এবং সে ক্ষেত্রে 'ত্রয়ীর' পূজো আর করা হবে না, করা হবে, চারজনের সমাহারে গঠিত এক সত্তার, নাম তাঁর যাই হোক না কেন।

নিচের কথাগুলো আমার নয় (মতটা অবশ্য আমারো বটে!) পণ্ডিত ব্রহ্মবিৎ, পুচ্চেত্তির কথা এগুলো। অধ্যাপকের দুশ্চিন্তা, ভবিষ্যতে খৃস্টধর্মের অস্তিত্ব থাকবে, কি না।

> খৃস্টধর্ম একটা কাজ করতে পারে, বহির্জাগতিক সম্ভাব্য মানুষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু, তাতে একটা অসুবিধে আছে। এমন হতে পারে, আন্তর্নাক্ষত্র যোগাযোগপরবর্তী পরীক্ষায় প্রমাণিত হবে, চালু বড় ধর্মগুলোর ভেতর হয়তো খৃস্টধর্মটাই ঝুটো।

* * *

কিছুকাল যাবৎ খবরের কাগজে এবং প্রাসঙ্গিক সাহিত্যে আলোচিত হচ্ছে, যিশু নভশ্চর, কি না, কতকটা সেই স্কটল্যাণ্ডের লখ্ নেস্ দানবের মত, কখনো স্বীকৃত, কখনো বাতিল।

আধুনিকতম-যিশুধর্মের উদ্ভাবক মিন্‌স্ক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-

বিজ্ঞানী ডাঃ বিয়াচেস্লাব সাইৎসেব। তাঁর বিশ্বাস যিশু এসেছিলেন বহির্জগৎ থেকে এবং তিনি ছিলেন কোন উচ্চতর সভ্যতার প্রতিভূ। এই দিক থেকে বিচার করলে, তাঁর অলৌকিক শক্তি এবং ক্রিয়ার খানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। সাইৎসেব সত্যিই বলেছেন (৩০), 'সত্যি কথা বলতে কি, ঈশ্বরের মর্তে আগমন একটি মহাজাগতিক ঘটনা'।

সোবিয়েৎ 'স্পুৎনিক' পত্রিকায় তাঁর 'হিমালয়ের উপরে মহাকাশ-যান' এবং 'মহাকাশযানে দেবদূত' শীর্ষক দুটি নিবন্ধ, ১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মে আমাকে মস্কোয় দৌড় করিয়েছিল। কিন্তু তাঁর আধুনিকতম কল্পনার সঙ্গে তাল রাখবার ক্ষমতা আমার নেই।

সাইৎসেবের বক্তব্য অবশ্য সুসমাচারভিত্তিক। এমন কিছু নেই যা সুসমাচার দিয়ে প্রমাণ না করা যায়। খাটতে অবশ্য একটু হবে, তা হোক, তাহলেই প্রমাণ করা যাবে, যিশু একজন যোদ্ধা ছিলেন, না হয় রাজা অথবা সেনাপতি। এ সবই সুসমাচারে আছে। প্রমাণ করা যায়, তিনি কূটনীতিজ্ঞ, সত্যসন্ধায়ী, তিনি যাদুকর, অথবা ভবিষ্যদ্বক্তা, প্রমাণ করা যায়, তিনি ধর্মপ্রচারক, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। আরো 'প্রমাণ করা যায়,' তিনি ছিলেন 'নভশ্চর'।

সাইৎসেবের নিবন্ধের ভিত্তি কী? ম্যাথু (১, ২০), যিনি ঈশ্বরের দূতকে যোসেফের সামনে হাজির করেছেন? তার মানে, ঈশ্বরের দূত নভশ্চর?

নাকি 'অকলঙ্ক গর্ভের' গপ্পো? নভশ্চর-সংস্করণে স্বভাবতঃই কথাটার অর্থ, 'কৃত্রিম গর্ভাধান'। তাছাড়া আর কীই বা হবে?

অথবা, জনের যিশুকে দীক্ষাদান কালে স্বর্গের দ্বার খুলে যাওয়া এবং যর্দনের ওপরে দৈববাণী শোনা (ম্যাথু-৩)? ব্যাপারটা একটা মহাকাশযান থেকে মেগাফোন মারফৎ পৃথিবীমুখী বাণী প্রেরণ ব্যতীত আর কী হতে পারে?

নাকি, লুকের (২৪) সুসমাচারে যে ছুটি উজ্জ্বল বস্ত্রাবৃত লোকের আবির্ভাব ঘটেছে, তারা ? নভশ্চর তারা ?

কিম্বা, ম্যাথুতে (২৮) উল্লেখিত সেই দেবদূত, যার মুখ 'বিদ্যুৎ সদৃশ' এবং বস্ত্র তুষার শুভ্র ? নিরাপত্তা-বস্ত্রে আবৃত আর একটি বহির্জাগতিক মানুষ ?

নাকি, যিশুর সেই উক্তি, 'আমার পিতার আবাসে অনেক গৃহ আছে' ? তার তো একমাত্র অর্থ হওয়া উচিত, মহাকাশে মনুষ্য-বাসোপযোগী অসংখ্য গ্রহ আছে।

অথবা, মার্কের (১৩) দাবি, 'মনুষ্যপুত্র মহাপরাক্রম ও প্রতাপের সহিত মেঘযোগে আসিতেছেন' ? এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সর্বাধিনায়ক তাঁর ছেলেকে মহাকাশযানে করে পাঠাচ্ছেন।

থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এ তালিকায় অমন প্রমাণ ভূরিভূরি দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু আমি বলি এইরকম,—

১। ওপরের ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে সুসমাচারকে 'বিশ্বাস' করতেই হবে, যেমন বিশ্বাস করতে হবে, মেরী যিশুকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন নিষ্পাপ পন্থায়। ঈশ্বরের আত্মা পাখির মত নেবে এসে বসেছিল প্রভুর ওপরে। আকাশ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল একটি বাণী। শুভ্র, উজ্জ্বল একটি দেবদূত আবির্ভূত হয়েছিলেন সমাধিস্থলে। কাজগুলি যিশু নিজেই করেছিলেন, কথাগুলিও তিনি নিজে বলেছিলেন, তবে, সেগুলো তাঁতে অর্পিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। সুসমাচারকে যিনি আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করেন না, যিনি জানেন, কী ভাবে 'ঈশ্বরের বাণী'র উৎপত্তি ঘটেছিল, তিনি এসব কথাকে সত্যি বলে মেনে নিতে পারবেন না। সুসমাচার থেকে যিনি 'নভশ্চর যিশুকে

বের করতে চান, তিনি জাল দলিলের ওপর নির্ভর করে সাজা দেওয়ার পক্ষপাতী বিচারকের মতই ভ্রান্ত।

২। নভশ্চর যিশু পৃথিবীতে কী করেছিলেন বলে মনে হয় ? একটা ধর্ম এনেছিলেন, খৃস্ট অথবা নৈতিক ? নতুন কিছুই দেননি তিনি। সুসমাচারের সঙ্গে কুমরান পুঁথির তুলনা করলে দেখতে পাই; যিশুর শিক্ষার মূল কথা এসেছে এসীন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। তাঁর অন্যান্য অবদানেও বিশেষ কিছু নেই। পৃথিবীর মানুষকে ভয় দেখাতে, এখানে সন্ত্রাস ছড়াতে তো নভশ্চর যিশুকে পাঠাবার দরকার ছিল না। অবিশ্বাসীজনের শেষ পরিণতি নরকে, একথা জানাতেও তাঁকে পাঠাবার প্রয়োজন ছিল না।

৩। আন্তর্নাক্ষত্র নভোযাত্রীরা নিশ্চয় নিখুঁত সময়সূচী মেনে কাজ করবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, তাদের শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিটির মৃত্যু তারা রোধ করতে পারেনি, এসে পৌঁছেছিল অনেক দেরীতে। যিশু যদি জানতেন যে তাঁর মহাকাশের ভায়েরা ঠিক সময়ে তাঁর সাহায্যে এসে পৌঁছবে, তাহলে তিনি তাঁর মৃত্যুর কথা আমরণ বলে বেড়াতেন না। যদি ধরে নিই যে নভোযাত্রীরা তাদের বিশিষ্ট দূতটিকে অসহায়ভাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলে গিয়েছিল, তাহলে বহির্জাগতিক মানুষ সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা নেহাতই নিচু, বলতে হবে।

৪। পুনরুত্থানকে নজির হিসেবে ধরাও অসম্ভব। তবু ধরা যাক্, বহির্জাগতিক আগন্তুকেরা যিশুর মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল তাদের সুউন্নত আয়ুর্বেদের সাহায্যে, তাহলে কি মৃত্যুর মত ব্যাপারকে তাদের চোখ

ঠারবার ক্ষমতাটা একবারও সর্বসাধারণ্যে দেখাবার চেষ্টা করতো না ? পুনরুত্থানের অলৌকিক ব্যাপার জেনেছিল কয়েকটি মাত্র লোক, তাও, তারা বিশ্বাস করেনি। তা ছাড়া, বহির্জাগতিক সেই পণ্ডিতেরা যদি সত্যিই অমন অঘটন ঘটাতো, তাহলে কি যিশুকে তুলে নিয়ে সোজা জেরুসালেমে গিয়ে সেখানকার মানুষদের দেখাতো না, প্রচার করতে শুরু করতো না তাঁকে দিয়ে ? তা না করায় অমন একটা কীর্তির কথা, অমন অত্যুচ্চ পর্যায়ের কার্য-প্রণালীর কথা যে অজ্ঞাতই থেকে গেল। তা ছাড়া, শিষ্যদের মতে, চিকিৎসাগত পুনর্জাগরণের কোন গুরুত্বই নেই। শিষ্যেরা আড়ালেই রয়ে গেল বিহ্বলভাবে, সাধারণ্যে বেরোতে সাহস করেনি।

৫। বহির্জাগতিক যে-পণ্ডিতদের আন্তর্নাক্ষত্র দূরত্ব পাড়ি দেওয়া করায়ত্ত ছিল, তারা নিশ্চয় এমন নির্বোধ হবে না যে, পৃথিবীর একটি মাত্র জায়গায় নাববে, একটিমাত্র স্থানীয় ধর্মপ্রচার মানসে। বরং একটি বিশেষ ধর্মকে ব্যাপক-ভাবে প্রচার করতে তারা নাবতো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, তাতে খাটুনি একটু বাড়তো বটে, কিন্তু সেইটেই হত কাজের মত কাজ। কি ইহুদি এলাকায়, কি অন্যত্র যিশুর জীবদ্দশায় লিখিত ইতিহাসে কোথাও মহাকাশযানের অবতরণ, মহাকাশযান দর্শন, অ. উ. ব. (অজানা উড্ডীন বস্তু = U.F.O.) অথবা ওই রকম কোন অদ্ভুত বস্তুর কথা নথিভুক্ত নেই। যিশুর মৃত্যুর পর নানা অদ্ভুত দর্শনের কথা,—যেমন ভারতে যিশু, মধ্য আমেরিকায় যিশু, ইত্যাদির কথা রটিয়েছে ধর্মান্ধ যিশু-ভক্তের দল। ওগুলোকে খেয়ালি কল্পনা বলেই বাতিল করতে হবে,

কারণ ওই সব 'ধর্মপ্রতিষ্ঠাতারা' প্রায়ই মিথ্যা-প্রমাণিত সুসমাচারেরই নজির বারবার আওড়ান, যে সুসমাচার প্রথমে যিশুকে পরিণত করেছে 'ঈশ্বরপুত্রে' এবং 'ত্রাতায়', যার কোনটাই তিনি নন।

৬। যে নভশ্চর-যিশুর বিদ্যাবুদ্ধির স্তর সাধারণ মানুষের অনেক ওপরে, তিনি যদি ভবিষ্যতের কথাও বলতে চাইতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে উচিত হত রূপকের ভাষাকে অমন সহজবোধ্য না করা, বরং সেগুলোকে সেকালের মানুষের কাছে দুর্বোধ্য করে ভবিষ্যৎ মানুষের বোধ্য করে রেখে যাওয়াই তাঁর উচিত হত। সে ক্ষেত্রে তিনি হয়তো বলতেন, 'হে আমার সন্তানগণ, শুন, যেদিন উপযুক্ত সময় আসিবে, যেদিন পৃথিবীর পণ্ডিতগণ বস্তুর সূক্ষ্মতম অংশও বিদীর্ণ করিতে পারিবে, সেইদিন স্বর্গ হইতে আগমন করিবেন ঈশ্বরের পুত্র'। তাহলে বহির্জাগতিক আগন্তুকদের পরিকল্পনা সম্পর্কে পণ্ডিতেরাও তর্ক করতেন না যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী নভশ্চর-যিশুকে তাঁরা পাঠিয়েছিলেন এ গ্রহের ভবিষ্যৎ পণ্ডিতদের উন্নত জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে। সুসমাচারের ভেতর যদি আইনস্তাইনের $E = mc^2$-এর মত ছোট্ট একটা সূত্রও থাকতো, তাহলে আমি সাইৎসেবের দলে নিশ্চয় ভিড়তুম।

৭। বহির্জাগতিক মানুষেরা যদি সত্যিই তাদের আপনজন যিশুকে তাদের উন্নত প্রাযুক্তিক উপায়ে ধর্মপ্রচারার্থ জেরুসালেমে পাঠাতো, তাহলে তো উন্নতিশীল এলাকাকে তারা তাদের আপন নিয়ন্ত্রণাধীনেই রাখতো। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, যিশুর ধর্মমতের ওপর তাদের কোন হাত ছিল না। খৃস্টধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে পলের নিপুণ হাতের

··কাজে, তারপরেই তা ধারণ করেছে এক বিকট অমানুষিক আকার।

ইতিহাসের পাতায় যে পড়ি, রোম খৃস্টানদের নির্যাতন করেছে, পড়তে পড়তে মনটা তেতো হয়ে ওঠে। কিন্তু সেইটেই সব নয়, আমাদের দয়ালু খৃস্টানরাও নৃশংস হত্যাকাণ্ড করেছে ব্যাপকভাবে, হাত রাঙিয়েছে যত অখৃস্টান, যত 'সত্যধর্ম'-বিরোধীর রক্তে। বেচারা অখৃস্টান শহীদদের কোন সন্ত-তালিকা কেউ রাখেনি, রাখলে খৃস্টান সন্ত-তালিকাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যেতো তাদের তালিকা।

নাঃ, নভশ্চর-যিশুর সব গপ্পো ভুলে যাওয়াই ভালো, সে-যিশুর অস্তিত্ব ছিল না। ত্রাতা-যিশুরও কোন অস্তিত্ব ছিল না কোন কালে।

* * *

খৃস্টধর্ম যিশুর যে ছবি আমাদের দেখিয়েছে, সে ছবি সম্পর্কে চারটে কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই,—

(ক) যিশু ঈশ্বরের একমাত্র ঔরস ছিলেন না। 'আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা' সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্রও নেই, কন্যাও নেই।

(খ) যিশুর পক্ষে ত্রাতার ভূমিকাও গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কেননা 'আদি পাপের' যে-ধারণার বিলুপ্তি সম্ভব একমাত্র রক্ত দিয়ে, মৃত্যু দিয়ে, সে-ধারণা কিন্তু সর্বশক্তিমান, শাশ্বত ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে মেলে না।

(গ) যিশুর যে সব শিক্ষা, উপদেশ, কৃতির কথা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, সে সব দৈবপ্রেরণাপ্রসূত হতে পারে না, কেননা তাঁর জন্মের বহু বহুকাল আগে থেকেই ওই সব কৃতি-উপদেশ-শিক্ষার প্রচলন ছিল।

(ঘ) নবতম ব্যাখ্যার কথা তুলে বলি, যিশু নভশ্চর ছিলেন না। গত দুহাজার বছর ধরে সম্ভব-অসম্ভব যত বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, যিশুর এ বিশেষণটি তাদের শীর্ষস্থানীয়।

বাইবেল যেমন 'ঈশ্বরের বাণী' নয়, যিশুও তেমনি ঈশ্বরসম্ভূত নন এবং খৃস্টধর্মের উৎপত্তির পেছনেও ঐশ্বর প্রেরণা নেই। আর, এ সব না হলে দিব্যদর্শনের পেছনে ঈশ্বর, কিম্বা ঈশ্বরের পুত্র অথবা পবিত্র কুমারী মেরীর হাত থাকতে পারে না।

দিব্যদর্শনের উৎসের সন্ধান করতে হবে অন্য কোনখানে।

দিব্যদর্শন যখন মেলে

যিশু যদি 'ঈশ্বরের একমাত্র ঔরস' না হন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের যদি কোন পুত্র-কন্যা না থাকে, মেরী যদি স্বর্গের কেউ না হন এবং ছোট, বড় দেবদূতেরাও যদি বৃহত্তর খৃস্টপরিবারভুক্ত না হন, তাহলে এঁদের কেউই দিব্যদর্শন দানের উপযোগী হতে পারেন না। তবু এ কথা সত্যি যে দিব্যদর্শন যেখানে লাভ হয়েছিল, অলৌকিক অঘটন সেখানে ঘটে এবং বৈদ্যের ব্যাখ্যার অসাধ্য কোন উপায়ে নানা রোগের নিরাময় হয়। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে 'দৈবশক্তি' সেখানে কাজ করছে? খৃস্টপরিবারভুক্ত কারুর দর্শন দানের সেইটেই কি বড় প্রমাণ?

ব্রহ্মবিদ্যাগত অনেক অনেক ব্যাখ্যা পড়ে একটা প্রশ্ন মনে জেগেছে। ওই সব তথাকথিত দিব্য দর্শনপ্রাপ্ত স্থানে যদি মেরী, যিশু অথবা দেবদূতদের কোন সত্যিকার আবির্ভাব না ঘটে থাকে, অথবা মূর্ত-আবির্ভাব যদি 'দিব্যদর্শী'র রেখে যাওয়া বিবরণের সঙ্গে না মেলে তাহলে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন বলে বলা হল, তাঁদের নামে অলৌকিক ঘটনা, অলৌকিক নিরাময় কেমন করে সম্ভব হয়?

খোদ আবির্ভাবের স্থানেই আমার এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলুম।

ফরাসী পিরেনীজে অবস্থিত লুর্দ্, পৃথিবীর এক প্রখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। ফি বছর কমপক্ষে পঞ্চাশ লাখ লোক সেখানে তীর্থযাত্রা করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে। গোটা শহরটায় যেন সম্বৎসরের মেলা লেগে আছে। সেখানকার আকর্ষণ, অলৌকিক ঘটনা। রাত্তিরেও লুর্দের পথ-ঘাট গম গম করে। নৈশ জীবনের বড় আকর্ষণ অবশ্য কামনা-ঝলকিত দেহাবরণ উন্মোচন ছাড়া আর কিছু নয়।

অলৌকিকের বিকিকিনি বেড়েই চলেছে। সে ব্যবসা চলছে আজ ১২৫ বছর ধরে। দোকানে দোকানে হরেক রকমের, হরেক মাপের ক্রুশ এবং মাদোন্নার মূর্তি। জপমালা যা বিক্রি হচ্ছে, তাও সকলকার জন্যে সমান নয়, বড়লোকের জন্যে আছে দামী এবং বাহারে আর গরীবের জন্যে সস্তা, খেলো। কোন্‌টায় কাজ বেশি হয়, আমার জানা নেই। বেসাতি যে কত রকমারী তার ইয়ত্তা নেই,—সাধু-সন্তদের ছবি, খড়ম, টাকার থলি, ঘণ্টা, রেকাবী, রোদ্দুরের চশমা, ঘড়ি, লকেট। তা ছাড়া আছে রকমারি মোমবাতি—সরু, মোটা লম্বা, বেঁটে, সোজা, লীলায়িতভাবে বাঁকানো, লাল, নীল। আর, প্রত্যেকটি বস্তুর গায়ে সোনার জলে লেখা মাদোন্নার ছবি আর 'লুর্দে তৈরী'! মোম গলার সঙ্গে মাদোন্নার মুখও গলে গলে পড়বে, অবশ্য খড়মের ওপরে আর রেকাবীতে সে ছবি বেশ একটু ভালো করে আঁকা, যাতে কিছু দিন স্থায়ী হয়।

সারা পৃথিবীতে অনেক মদের দোকান দেখেছি, আকাপুল্‌কোর (মেক্‌সিকো) দোকানও দেখেছি, তাদের তাকে-তাকে সাজানো মানুষের কল্পনায় যত রকম আকার, আয়তন সম্ভব, তার সব রকমের বোতলই বোধ হয় আছে। কিন্তু আকারের কথা উঠলে লুর্দের দোকানগুলোর কাছে বোধ হয় কেউ পেরে উঠবে না। জীবনে আমি অত রকম চেহারার বোতল কখনো দেখিনি, কোথাও দেখিনি—পেটমোটা, গোল, চারকোণা, তেকোণা, পকেট মাপের, লিটার এবং গ্যালন মাপের—রঙেরও যত বাহার, আয়তনেরও তত বহর। তবে আকাপুল্‌কোর দোকানের বোতলের পানীয় যেমন মাতাতে পারে, লুর্দের বোতলের পানীয়ের সে ক্ষমতা নেই, তাতাতেও পারে না, স্রেফ জল—লুর্দের 'অলৌকিক সলিল'।

দোকানীরা জানে, লুর্দের নাম-মাহাত্ম্যের কাছে তারা কতখানি ঋণী, জানে, কিসে তাদের রোজগার বজায় থাকবে, সে-রোজগার

বাড়াতে হয় কেমন করে, তাও জানে তারা। দোকানের নামের বাহারই বা কত! কেউ ও পারাদি, কেউ নোৎর শেরে দাম দ নোয়েল, ও স্যাঁ ওদিল, ও স্যাঁ কামিল, ও স্যাঁ পাপ পল দী, ও লা পে দ্যু মন্দ্, ও রোজিয়ে দ মারি, কেউ বা মিষ্টি মধুর ও স্যাঁ দাম দ লা গৎ।

যে মেয়েটির বরাতে মাদোন্না-দর্শন ঘটেছিল, তার সন্তত্ব প্রাপ্তির পর সব কিছুরই একটা ধর্মীয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এমন কি, হোটেলেরও সাধারণ পার্থিব নাম রাখা হয়নি যেমন, একটা হোটেলের নাম 'পোপ নিবাস'। রোমের প্রভুদের পরিধেয় বিপুল, এ সব জিনিস তার তলায় অনায়াসে ঢাকা পড়ে, তাই একজন মহাযাজকের মুখও লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে না।

বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি 'পবিত্র' হোটেলের 'পবিত্র' আস্তাবলে, এক অপবিত্র মূল্যের বিনিময়ে আমার গাড়ি ঢোকালুম। মনে তবু একটা আশা, এ সব নোংরামি সত্ত্বেও আমার 'ভিতর দুয়ার' খুলবে। গির্জের সামনের ভিড়ের ভেতর মিশে গেলুম। এই একটি মাত্র জায়গায়, এই ধর্মস্থানে দেখলুম, কোন দোকান নেই, বেসাত নিয়ে পথের ধারে কেউ বসেওনি। পোড়া মোমবাতির গন্ধে ধূপ-ধূনোর গন্ধ মিশে যেন মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে। লাউডস্পীকারে প্রার্থনা-বাণীর সঙ্গে বাজছে সর্বজন-পরিচিত নানা স্তোত্রের সুর। মনে হচ্ছে, যেন একটা হৈ-হট্টগোলের মাঝে এসে পড়েছি। কোন্‌টা আগে দেখবো, বুঝতে পার্চ্ছি না।

দীর্ঘ এক মাইল লম্বা সারিতে চলছে, এক ধরনের চেয়ার-গাড়ি চেপে নিরাময়াকাঙ্ক্ষী রোগগ্রস্তের দল। মিছিল চলেছে বড় মাঠের ভেতর দিয়ে, হাতে নিশান, ক্রুশ, আর মাদোন্নার মূর্তি, পুরোভাগে পুরোহিত, হাতে তাঁর মেগাফোন, কণ্ঠে প্রার্থনা। বিরাট এ নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে দিনে বহুবার। বুকভরা আশা নিয়ে অলৌকিক বিশ্বাসী, নিরাময়কামী মানুষ এগিয়ে চলেছে শম্বুক গতিতে, সীমাহীন ধৈর্যে,

কতক্ষণে তাদের রঙিন প্লাস্টিকের বোতলে ভরে নেবে দেয়ালে লাগানো কল থেকে লুর্দের পূত পবিত্র সলিল। আমিও চলেছি মিছিলে গা ভাসিয়ে। লুর্দের পবিত্র বারি কেউ অঞ্জলি ভরে পান করছে, কেউ ছিটোচ্ছে গায়ে, মাথায়, পায়ে, সর্বাঙ্গে। এ সবই হচ্ছে, আকাশের নিচে, খোলা মাঠে, তবু মনে হচ্ছে, সুবিশাল মন্দির অভ্যন্তরের গম্ভীর নৈঃশব্দ বিরাজ করছে চতুর্দিকে। শত সহস্র মোম-বাতির আলো কাঁপছে, সামনে, পেছনে, সর্বত্র। শব্দ বলতে শুধু প্রার্থনার গুঞ্জন, স্তোত্র পাঠের অস্পষ্ট গুনগুন আর কথা বলার ফিস ফাস। বহু ভাষায় সাবধান বাণী উচ্চারিত হচ্ছে, 'ভুলে যাবেন না, আপনি বিচরণ করছেন পবিত্র ভূমিতে'।

এতক্ষণে জলের ধারে পৌঁছলুম। হাতে আমার বোতল নেই, অঞ্জলি ভরে নিলুম পবিত্র বারি। পাশের লোকদের পানে চেয়ে দেখলুম, মুখ তাদের বেদনায় ম্লান, কিন্তু তারই ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে আনন্দের একটা মিষ্টি আভা, ভক্তি এবং নিষ্ঠার আলো মাখা। অলৌকিকের এত কাছে, এই এখানে শেষ পর্যন্ত আসতে পেরেছে, এ কি কম আনন্দের, কম গর্বের কথা! লোকে জল ভরে নিচ্ছে এক গ্যালন, দু গ্যালন বোতলে, সে কি শুধু নিজের প্রয়োজনে? না কি, একটু একটু করে বিক্রি করে, দ্বিতীয় বার আসবার খরচটা উঠে আসবে বলে?

পা পা করে জনসমুদ্র এগিয়ে চলেছে শেষ গন্তব্য পানে, সেই গুহার কাছে। গুহাটা তিরিশ ফুট লম্বা, কুড়ি ফুট উঁচু আর চল্লিশ ফুট চওড়া। ঢোকবার মুখে দশ ফুট ওপরে রয়েছে কুমারী মেরীর শ্বেত-মর্মর মূর্তি। এই এখানেই ছোট্ট বের্নাদেৎ সুবিরুকে (১) দর্শন দান করেছিলেন মা মেরী, ১৮৫৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৬ই জুলাই পর্যন্ত আঠারো বার, আর ঠিক যে ভাবে বের্নাদেৎ তাঁকে দেখেছিল, এ মূর্তি প্রায় সেই মূর্তি। গুহার দেওয়ালগুলো

স্যাঁৎসেঁতে, চকচকে। তীর্থযাত্রী চুম্বন আঁকে সে প্রাচীরগাত্রে, নতজানু হয়ে বসে থাকে মাদোন্নার মুখের পানে চেয়ে। কত লোক প্রার্থনা করে, হাউ হাউ করে কাঁদেও কেউ বা। গুহার পেছন দিকে রাখা চুপড়িতে কেউ কেউ খাম ছুঁড়ে দেয়, মায়ের কাছে আবেদন। না, কোন ডাকটিকিট লাগে না, এমনিই পৌঁছে যায় মায়ের দরবারে। গুহার মধ্যিখানে একটা বেদী, তার সামনে প্রজ্বলিত মোমবাতির সার। শত শত শিখার আলোর উত্তাপে গুহার ভিজে বাতাস প্যাচপেচে গরম। যে আলোকশিখার সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সে-সমুদ্র দেদীপ্যমান ১৮৫৮ সালের সেই ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে! অনির্বাণ-শিখা বলে যদি কিছু থাকে তো সে এখানে, লুর্দের এই গুহায়।

শহরের ভেতর প্রাচ্যের বাজারের মত গুমোট আবহাওয়ায় যেমন নিদারুণ বিরক্তিতে মন তেতো হয়ে উঠেছিল, এখানে তেমনি মন ভরে উঠলো ভক্তির দখিন হাওয়ার স্পর্শে। বোধ হয় এমন কেউ কঠিন-হৃদয় নেই, যার মন এই জলের কলের কাছে, ওই গুহার ভেতরে, মাঠের ওই জনসমুদ্রে আর ওই গির্জের ভেতরে গেলে গলে নরম না হয়। এরা যে অসংখ্য দুঃখ-বেদনা বয়ে নিয়ে আসে এখানে। আশার এই মহাসাগরের তীরে এসে মিলিত হয় বিশ্বাসী মানুষের দল। কত মানুষ ফিরে যাবে হতাশ্বার দুঃসহ বোঝা মাথায় নিয়ে! গুহা থেকে শ'দুই হাত তফাতে একটা পাঁচিলের ওপরে দশ ঘণ্টা ধরে বসে রইলুম চুপ করে। রাত হয়ে এল। অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ে ভাঁটা পড়তে শুরু হল। মোমবাতির মৃদু আলোকমালা এবার ধীরে ধীরে পরিণত হল একটা প্রকাণ্ড, চোখ-ধাঁধানো শিখায়। লুর্দের আকাশ আলোয় আলোকময় হয়ে উঠেছে। রাত্রির দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ, হোটেলে ফিরে যাবো, তখনো শুনতে পাচ্ছি, গুহার ভেতর থেকে ভেসে আসছে একটানা কান্নার করুণ সুর।

কী সে শক্তি, যা বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ মানুষকে টেনে আনছে এখানে ?

চোদ্দ বছরের চাষার মেয়ে বের্নাদেৎকে মাদোন্না দর্শন দান করেছিলেন ওই গুহার ভেতরে আঠারো বার, আর দিয়েছিলেন বাণী আর আদেশ। একাদশ পোপ তাকে সন্তত্বে উন্নীত করেছেন ১৯৩৩ সালের ৮ই ডিসেম্বর। এইভাবে খৃস্টধর্ম স্বীকার করে নিলেন দিব্যদর্শনের বাস্তবতা, সেই সঙ্গে আলৌকিক বলে স্বীকার মানলেন কয়েকটি কঠিন রোগের নিরাময়কেও। রোমের কর্তারা বোধ হয় ব্যাপারটাকে এর চেয়ে ভালোভাবে প্রচার করতে পারতেন না। খৃস্টধর্মের দীর্ঘ হস্ত খৃস্টান জগতের প্রায় সর্বত্র এগিয়ে গেছে, ব্যবস্থা করেছে (কম ভাড়ায় !) তীর্থযাত্রার, গড়ে তুলেছে মিছিলের দীর্ঘ সারি।

১৮৫৮ সালে একশো'রও বেশী নিরাময় নথিভুক্ত হয়েছে, তার ভেতর সাতটিকে পোপ মেনে নিয়েছেন অলৌকিক বলে। (ক্যাথলিক সংজ্ঞা অনুযায়ী 'অলৌকিকে'র অর্থ 'প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ', তবে কথাটা বিজ্ঞানের দিক্ থেকে অনিশ্চিত বলে, আজ বলা হয়, অলৌকিক ব্যাপারটা এমনই, যা ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অসাধ্য।)

১৮৬৬ সাল থেকে জুর্নাল দ্য লা গ্রেৎ পত্রিকায় নিরাময়ের খবর অবিরত প্রচারিত হয়ে চলেছে। হাজারো অমন নিরাময়ের ভেতর পোপ স্বীকৃতি দিয়েছেন মাত্র তেষট্টিটিকে 'অলৌকিক' বলে। Bureau des Constatations Medicalesএর সভাপতি ডাঃ আল্‌ফঁস অলিভিয়েরি উনসত্তর সালে বলেছিলেন, তখনো বছরে গড়পড়তা তিরিশটা নিরাময়ের কথা নথিভুক্ত হয়েছে (২)। লুর্দের চিকিৎসক-সংস্থায় কিন্তু সব নিরাময়ের হিসেব নেই, কারণ নোৎর্‌দাম হাসপাতালে অথবা আওয়ার লেডি অব দি সরোজ হাসপাতালে যারা ভর্তি হয়, তাদের কথাই শুধু লেখা আছে তাঁদের

আবির্ভাব

১৯৫২ সালের মে মাসে শ্রীমতী আলিস কুতো একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পোইতিয়ে থেকে গেলেন লুর্দে। বয়স তাঁর চৌতিরিশ। গত তিন বছর ধরে জটিল স্ক্লিরোসিসে ভুগছেন। [(multiple) sclerosis—এক বৃদ্ধিশীল পুরোন রোগবিশেষ। এ রোগে গোটা কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের ওপর স্থানে স্থানে কঠিনতা প্রকাশ পায়, ফলে নানান ধরনের পক্ষাঘাত দেখা দেয়। রোগের কারণ অজ্ঞাত।] তীর্থযাত্রীর গাড়ি ভর্তি বহু রোগীর ভিড়ে শ্রীমতী কুতোর প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। সারা পথ ধরে মেরীর উদ্দেশে তাদের প্রার্থনা, স্তোত্র পাঠ আর আর্তক্রন্দনরোলে গাড়ির ভেতরে মনে হচ্ছে যেন ভেড়ার গোয়ালে আগুন লেগেছে। আত্মীয় পরিজন আর্তদের পরিচর্যায় রত। গোটা গাড়ির বাতাস কাতর চিৎকারে ব্যথিত, তবু আশা। লুর্দের আশার হাতছানিই তাদের সান্ত্বনা। যাই হোক, লুর্দে পৌঁছেই শ্রীমতী কুতোর রোগ যেন আদ্দেক সেরে গেল।

১৫ই মে ভোরবেলা তাঁকে চেয়ার-গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হল স্নান-কুণ্ডে। বাক্‌শক্তি-রহিত, পঙ্গু মেয়েটিকে যখন জলে ডোবানো হল, তখন তাঁর সমস্ত অঙ্গে আক্ষেপ আর দম বন্ধ হয়ে প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যায়, এমনি অবস্থা। কিন্তু স্নানের পর তিনি যেন নতুন মানুষ। নোৎর্‌দাম হাসপাতালে ফিরে গেলেন, চেয়ার-গাড়ি করে। বিকেলবেলা একলাই একটু বেড়িয়ে বেড়ালেন বড় দালানের ভেতর। ডাক্তারদের চোখ ছানাবড়া! বিকেলবেলা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-প্রার্থীদের মিছিলে সামিল হয়ে, গেলেন আশীর্বাদ নিতে। হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন কথাও বলতে পারবেন, কিন্তু সাহস করলেন না, 'পাছে হিজিবিজি হ জ ব র স বেরিয়ে পড়ে মুখ থেকে, তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো, লোক হাসিয়ে কাজ

নেই’। পরিচারকেরা তাঁকে হাসপাতালে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। বহির্দ্বারের বাইরে চেয়ার-গাড়ি থেকে নেবে, কাউকে না ধরে একলাই হেঁটে ভেতরে চলে গেলেন।

১৬ই মে উপস্থিত হলেন চিকিৎসক-সঙ্ঘের সামনে। সভাপতি ডাঃ আলফঁস অলিভিয়েরির নির্দেশে বহু দেশের বহু ডাক্তার এ পরীক্ষায় যোগ দিলেন। (লুর্দে গেলে যে কোন ডাক্তার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।) তীর্থযাত্রার আগে যে সব ডাক্তার দেখেছিলেন, তাঁদের দেওয়া ব্যবস্থাপত্রাদি পড়া হল। তার ভেতর ব্যবস্থাপত্র ছিল এক শল্য চিকিৎসক, ডাঃ শোভেনের, এক স্নায়ু-চিকিৎসক, ডাঃ দেলাম্ মার্শালার আর ছিল তাঁর আপন শহর পোইতিয়েরের, অধ্যাপক বোশাঁর। গবেষণাগারের বিশ্লেষণ ইত্যাদির নথিপত্তরও রয়েছে একটা ফাইলে। সব ডাক্তারের মতেই এ এক বহুমুখী স্ক্লিরোসিস্, নিরাময়ের অসাধ্য। ওই ১৬ই মে তারিখেই ডাক্তাররা নথিভুক্ত করলেন, ‘শ্রীমতী কুতোর চলন এবং ভঙ্গি স্বাভাবিক, পেশীর কোন আক্ষেপ নেই মালচক্রকের (মালাইচাকির) বিচলনও স্বাভাবিক……’।

পরবর্তিকালে প্রতিবছর তাঁকে লুর্দে পরীক্ষা করা হয়েছে, ডাক্তাররা একবাক্যে রায় দিয়েছেন, তাঁর নিরাময় নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ। পঞ্চান্ন সালের ১০ই মে পনেরোজন ডাক্তার পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন, ‘সমস্ত রোগ-লক্ষণ দূরীভূত হয়েছে’।

এ ধরনের নিরাময়ের খবর পাঠানো হয় দশ হাজার ডাক্তার, দাঁতের ডাক্তার, ছাত্র এবং রসায়নশাস্ত্রীদের এক সংস্থার কাছে। আরো একটি বৃহত্তর সংস্থার কাছেও যায় লুর্দে সেরে যাওয়া সমস্ত রোগের ইতিহাস এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত। ১৫ই আগষ্ট স্ত্রাসবুর্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক থিয়েবো ঘোষণা করলেন, ‘রোগিণীকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাঁর দেহযন্ত্রের ক্রিয়াদিতে কোন গোলযোগ নেই,

বিশেষতঃ, তাঁর শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি উত্তম এবং তাঁর কথা স্পষ্ট এবং নির্ভুল……' ।

ছাপ্পান্ন সালের ২৩শে জুন পোইতিয়েরর পাদ্রী, মসিয়ঁর ভিয়োঁ পোইতিয়েতে এক কমিশন ডাকলেন। ডাক্তারদের মতের অনুসরণে কমিশন রায় দিলেন, শ্রীমতী আলিস কুতোর নিরাময় 'প্রাকৃতিক নিয়মবহির্ভূত'।

১৬ই জুলাই মসিয়ঁর ভিয়োঁ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন, 'ট্রেণ্ট সভা (Tridentine Council = ধর্মশাস্ত্রাদির দ্বারা অনুপ্রাণিত) কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার-বলে, মহামান্য পোপের সম্মতি সাপেক্ষে আমরা ঘোষণা করিতেছি যে ১৯৫২ সালের ১৬ই জুন তারিখে লুর্দে শ্রীমতী আলিস কুতোর রোগের যে নিরাময় ঘটিয়াছে তাহা অলৌকিক এবং তাহাকে ঈশ্বরের মাতা মেরীর স্বরূপের বিশেষ প্রকাশ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে'।

* * *

একে কী বলবো ?

মেডিক্যাল বুরো যে নিখুঁতভাবে, নিপুণভাবে রোগীদের পরীক্ষা করে থাকেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তা ছাড়া পরীক্ষক ডাক্তারদের ভেতর অবিশ্বাসী এবং সন্দিগ্ধমনাও আছেন। কোন নিরাময়ই নথিভুক্ত হয় না, যদি রোগের সমস্ত ঘটনার পূর্বাপর চিকিৎসাগত প্রমাণপত্রের স্বীকৃতি না থাকে। প্রমাণপত্রেরও অসুবিধে আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো অনেক দিনের পুরোন—রোগের গোড়ার দিক্‌কার। অন্ততঃ লুর্দে যাওয়া মনস্থ করার কয়েক হপ্তা আগের। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে, ডাক্তাররাই কি 'নির্ভুলভাবে' রোগ-নির্ণয় করতে সমর্থ? যেমন ধরুন, শ্রীমতী কুতো যে ১৯৫২ সালের ১৬ই মে সেরে উঠলেন, রোগ-নির্ণয়গত মূল্য তার কতটুকু? লুর্দ মেডিক্যাল বুরোর সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞানভিত্তিক নিশ্চয়তার ওপর প্রতিষ্ঠা করা

যেতো, যদি অলৌকিক নিরাময়ের 'অনেক আগে' থেকে ওই বুরোর ডাক্তারদেরই পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় শ্রীমতী কুতো থাকতেন। কিন্তু দেশ-দেশান্তর থেকে আসা হাজার হাজার রোগীর ওপর অমন বৈজ্ঞানিক উপায় প্রয়োগ করা অসম্ভব।

'সাইকোসোম্যাটিক' প্রভাবের আবিষ্কার (Psychosomatic effect=মানসিক অস্থিরতার কারণে দৈহিক বিকার। আবিষ্কর্তা প্রথমে আমেরিকার এফ. জি. আলেকজাণ্ডার এবং পরে জার্মানীর ভি. ফন ভাইৎস্সায়েকার) এবং চিকিৎসায় তার প্রয়োগে দেখা গেছে, দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়ায় এবং দেহজ যন্ত্রণার ক্ষেত্রে কোন 'চেতক' উদ্দীপকের প্রভাব (Psychic stimulus) প্রত্যক্ষ। সংবেশন (Hypnotic suggestion) মারফত পেশীর কাজ, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া, জারক-রসসমূহের পৃথকীকরণ ইত্যাদির পরিবর্তন সম্ভব। নিরীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় ক্ষেত্রেই চরম সঙ্কটপূর্ণ জীবনাবস্থা থেকে উৎপত্তি ঘটে নানা রোগের। একটা বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বিশেষ আঙ্গিক রোগ, বিশেষ মানসিক অবস্থাসঞ্জাত। "মানসিক অস্থিরতার কারণে যে আঙ্গিক রোগ (Psychomatics) তা এমন লোকেরই হয়ে থাকে, যে লোক 'আপন' রোগ আপনি গড়ে তোলে, বাহ্যিক কারণে সে 'আক্রান্ত' হয় না। প্রত্যেক রোগের প্রকাশ ঘটে তার আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে, জীবদেহে সেইটেই মনের বহিঃপ্রকাশ।"

রোগনিদান মারফত রোগের অবস্থার কতকগুলো বিশেষ লক্ষণ স্থিরীকৃত হয়, সেগুলো বিচার করেই ডাক্তাররা সম্ভাব্য ওষুধ নির্বাচন করেন। নিদান যে সব সময়ে রোগের কারণ দেখায় বা দেখাতে পারে, এমন নয়, তবে এও সত্যি যে নিদান সম্পর্কিত চরম জ্ঞান থেকেই নিশ্চিত নিরাময় সম্ভব। ডাক্তাররা যদি সব ক্ষেত্রে রোগের সব কারণগুলোকে ধরতে পারেন, তাহলে 'রোগী' বলে আর বেশিদিন কিছু থাকবে না।

লুর্দের ভিষক্ সংস্থা নিরাময়ের আগের এবং পরের অবস্থা পরীক্ষা করেন, রোগীর দুটো ভিন্ন অবস্থার তুলনা করে। কিন্তু আন্তরিক সদিচ্ছা সত্ত্বেও, তুলনার ভিত্তিতে পাওয়া 'কারণগুলোকে' তো দেখাতে পারেন না।

লুর্দে কি নিরাময়ের আশার উদয়-মুহূর্ত থেকেই অলৌকিকের জন্ম হয়?

কষ্টসাধ্য তীর্থযাত্রায় বেরোতে মন স্থির করার আগে নানা প্রশ্ন-সন্দেহ-আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় দুলতে থাকে রোগীর মন। কিন্তু অনেক দিন আগে থেকেই কি নিয়তিকে মেনে সে নেয়নি? যত ডাক্তারের কথা লোকে বলছে, তাদের সকলকার কাছেই কি যায়নি সে? ফল কি কিছু পেয়েছে? পায়নি। তাহলে, একবার তীর্থযাত্রায় গিয়ে দেখতে ক্ষতি কি, বেরালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে তো? পোড়া সোলমাছটা যদি ভেসেই ওঠে বরাতক্রমে? যদি মায়ের কৃপায় ভেল্কি সত্যিই খেলে? জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হয়? হতে তো পারে? আশা-নিরাশার দোটানায় তীর্থযাত্রায় বেরোনোই যখন সাব্যস্ত হল, তখনি কি অলৌকিক নিরাময়ের বীজ উপ্ত হয়নি? রোগের প্রতি তার মানসিকতার একটা পরিবর্তন কি তখনি ঘটেনি?

এ সম্ভাবনা সম্পর্কে ডাঃ আল্ফঁস অলিভিয়েরি (৩) বলেন 'স্বাভিভাব (autosuggestion) অথবা ভিন্নাভিভাবের (heterosuggestion) প্রকল্প নেহাতই অসম্ভব'। শ্রীমতী কুতোর কথায় তিনি স্বীকার মেনেছেন, নিরাময়ের অসাধ্য একটি রোগে তিনি ভুগেছিলেন এবং সেই সঙ্গে এও বলেছেন যে 'তীর্থযাত্রার শুরু থেকে এবং তীর্থে পৌঁছনোর পরেও লুর্দের কুণ্ডে স্নানের উপকারিতা সম্পর্কে শ্রীমতীর সীমাহীন আস্থা ছিল'।

এসব ব্যাপারে মস্ত একটা অসঙ্গতি আছে। রোগীর 'স্নানের উপকারিতা সম্পর্কে সীমাহীন আস্থা ছিল' একথা যদি স্বীকার করা হয়,

তাহলে নিরাময়ের কারণস্বরূপ স্বাভিভাব অথবা ভিন্নাভিভাবকে সরাসরি বাতিল করার সার্থকতা কোথায় ? 'বিশ্বাসকেই' কেতাবী ঢঙে নিচু গলায় ঘুরিয়ে বলা হয়, 'সীমাহীন আস্থা' আর ধর্মীয় ব্যাখ্যার সেই 'বিশ্বাসই' ব্যক্তিগত আস্থা, তথা একটা ধারণা, যার বিপরীত অর্থ জ্ঞান। অতএব, বিশ্বাস হচ্ছে, নিজেকে প্রভাবিত করার একটা উপায়, তারই অপর নাম, স্বাভিভাব। তা যদি হয়, তাহলে নিরাময়ের কারণের একটা বড় ব্যাখ্যাকে চোখ ঠেরে উড়িয়ে দেওয়া কেন ?

* * *

লুর্দের ইতিহাসে গাব্রিয়েল গার্গামের অলৌকিক নিরাময় একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে (৪), কারণ গার্গাম ধর্মবিশ্বাসী নন এবং লুর্দে তিনি গিয়েছিলেন নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তাই কি তাঁর নিরাময় অলৌকিক ?

ডাঃ ফ্রান্‌ৎস্ এল. শ্লেইয়ের (৫) অন্যান্য অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সঙ্গে ২৩২টি নিরাময় সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। গাব্রিয়েল গার্গামের ব্যাপারে তাঁর রায় হচ্ছে, 'প্রচণ্ড মনশ্চাঞ্চল্যের ফলে স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁর মনোজগৎ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল, তার ফলে সেই মনশ্চাঞ্চল্যজনিত দৈহিক বিকার অনেকখানি কমে যাবার পর লুর্দে গিয়ে তা একেবারে দূর হয়ে গেল'।

মানসিক ব্যাধিকে প্রাকৃতিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দীর্ঘ দিনের হাসপাতালবাসে এবং তার পরবর্তীকালে, বলতে গেলে, গার্গাম মনে মনেই তাঁর নিরাময় নিজেই প্রতিরোধ করেছিলেন, মন তাঁর হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিল, ধরেই নিয়েছিলেন বাকি জীবনটা চেয়ার-গাড়িতেই কাটাতে হবে। রোগের সঙ্গে মনে মনে যুদ্ধ করাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। (এ ধরনের কুলহারা নৈরাশ্যে ঝাঁপ দেওয়া, একালের একটা বিশেষ লক্ষণ !) কিন্তু যেই লুর্দে নিয়ে যাওয়ার কথায় রাজী হলেন, অমনি নিরাময় সম্পর্কে হতাশা ফিকে হতে

শুরু করলো। তাঁর চালক-নার্ভতন্ত্র ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে লাগলো ধীরে ধীরে। লুর্দের কুণ্ডে স্নানজনিত অভিঘাতের ফলে বাকিটুকু, অর্থাৎ নার্ভতন্ত্র, ক্রিয়াশীল হয়ে উঠলো পূর্ণমাত্রায়, আবার জেগে উঠলো জীবনের আশা, সুস্থ, নীরোগ জীবনের আশা। একি অলৌকিক ? একটি রোগের শাস্তি হল এমন একটি উপায়ে, কোন ডাক্তার যার নিদানপত্র লিখতে পারবেন না।

*　　　*　　　*

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে ডাঃ শ্লেইয়ের বলেছিলেন, 'লুর্দের রোগীদের বেশির ভাগই মেয়েছেলে আর তাদের বয়স ষোল থেকে পঁয়তাল্লিশের ভেতরে'। ২৩২জন পরীক্ষাধীন রোগীর ভেতর ১৮৫ জনই ছিল মেয়েছেলে। ডাঃ শ্লেইয়ের তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে,—

লুর্দের রোগীদের ভেতর বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এক বিশেষ ধরনের অল্প বয়সী রমণীদের। নার্ভতন্ত্রের অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়াকে বাইরে প্রকাশ করবার এক অস্বাভাবিক ক্ষমতা তাদের বর্তমান। রোগ-যন্ত্রণার ইতিহাস তাদের দীর্ঘ। ক্ষীণ-কায়া এই রমণীরা তাদের দীর্ঘ রোগভোগের কালে কত কঠিন রোগের কোপেই যে পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু সে সব রোগ হবারও যুক্তি বিশেষ নেই। (দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই যে লুর্দে তীর্থ করতে আসার আগে যে কোন একটি মেয়ে কত বিভিন্ন রকম রোগের শিকার হতে পারে।)

স্নায়ুরোগের নিরাময়কে ধর্মগুরুরা প্রথমে অলৌকিক নিরাময়ের পর্যায়ভুক্ত করতে চাননি। চিকিৎসাশাস্ত্রগত গবেষণায় ধর্মগুরুদের সে ধারণা খাটেনি। ডাক্তাররা জানেন, স্নায়বিক রোগ থেকে দেখা দিতে পারে নানা আঙ্গিক রোগ এবং সে সব রোগের কারণনিচয়ের ব্যাখ্যা রোগীর জীবন এবং তার জীবনযাত্রার ধারা থেকেই পাওয়া যায়, অবশ্য, তাদের বেশির ভাগই ভেষজ অথবা শল্যচিকিৎসার

গণ্ডির বাইরে, তাই বলা যেতে পারে, অলৌকিক নিরাময় সত্যিই আর অলৌকিক নয়। ওষুধের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক নিরাময়ের অলৌকিকত্ব শনৈঃ শনৈঃ 'লৌকিক'-এ পরিণত হবে। পাঠশালে সেনেকার কথা পড়েছিলুম, সে কথা মনে পড়ছে, 'কার্যের কারণ যে জানে, তার মত সুখী আর কে।'

* * *

জল (বিশেষ করে, হঠাৎ-জাগা উৎসের জল) তীর্থক্ষেত্রের একটি বিশেষ রোমাঞ্চকর বস্তু। হাইড্রোলজিক্যাল ইন্‌স্টিট্যুট লুর্দের অতিলৌকিক জলের 'ভৌতিক' এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে ১৯৬৪ সালের ৮ই অক্টোবর নিম্নলিখিত তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন,—

এ জল প্রায় অক্রিয় pH মান সমন্বিত (pH = মুক্ত আয়নিত হাইড্রোজেনের সমাহরণের পরিমাপ)
মুক্ত কার্বনডাইঅক্‌সাইডের পরিমাণ, যৎসামান্য
গ্যাসীয় কার্বনডাইঅক্‌সাইড, শূন্য
খরত্ব, সাধারণ (প্রায় ১৪′)
ধাতব পরিণতি (mineralization) সামান্য, প্রধানতঃ ক্যালসিয়ম কার্বোনেট থেকে
সালফেট এবং ক্লোরাইডের অস্তিত্ব খুব সামান্য
দ্রবণীয় লোহ এবং জৈব-পদার্থের পরিমাণ স্বাভাবিক
ইমারতী মাল-মসলা অথবা পয়ঃপ্রণালীপ্রসূত কোন প্রভাব নেই।
অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পানীয় জল, যাতে স্নানজনিত কোন ভেষজ-প্রভাব থাকতে পারে না!

* * *

অলৌকিক নিরাময়ের কারণে লুর্দ জগদ্বিখ্যাত হলেও, অদ্বিতীয় নয়। তীর্থক্ষেত্রে যেখানেই 'অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মাদোন্নার' মূর্তি

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই দেখা দিয়েছে নানা অলৌকিকের সংঘটন আর তারই সঙ্গে সেখানে শোনা গেছে অলৌকিক নিরাময়ের কথা।

তবু 'খাঁটি' অলৌকিকের দেখা আমি পাইনি, কারুর কাটা-হাত-পায়ের জায়গায় নতুন করে হাত-পা গজাবার কথা আজ পর্যন্ত শুনিনি, কিন্তু যেহেতু অঘটন-ঘটন-পটিয়ান-পটিয়সীদের সবাই সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বরের অংশ, তাই অমন খাঁটি অলৌকিক ঘটনার সংঘটন তো অসম্ভব হওয়ার কথা নয়, ভেলকিবাজী হওয়ারও কথা নয়।

লুর্দের গোঁড়া ঐতিহাসিকবর্গ (৬, ৭, ৮, ৯) বলেন, অমনতরো অলৌকিক ঘটনা যদি ঘটেও, অবিশ্বাসীর মনে তবুও বিশ্বাস জন্মাবে না। যিশু তো মৃত লাজারাসকে প্রাণ দান করেছিলেন (জন ১১, ১……)। অভূতপূর্ব সে অলৌকিক ঘটনা যারা দেখেনি তারা কি বিশ্বাস করেছিল? যিশুর ক্ষেত্রেও সন্দেহের ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হয় না, কেননা 'ঈশ্বরের বাণী'র উৎপত্তির ব্যাপারটা তো জানি। শিষ্য টমাসও অবিশ্বাসীদের একজন। মৃত যিশু পুনর্জীবন লাভ করেছেন বলে তিনিও বিশ্বাস করেননি, বলেছিলেন, 'আমি যদি তাঁহার দুই হাতে পেরেকের চিহ্ন না দেখি ও সেই পেরেকের স্থানে আমার অঙ্গুলি না দিই, এবং কুক্ষিদেশ মধ্যে আমার হাত না দিই, তবে কোন মতে বিশ্বাস করিব না' (জন ২০, ২৫)।

তারপর যিশু আবির্ভূত হয়েছেন অবিশ্বাসীদের সামনে, বলেছেন, তাঁর ক্ষতে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করতে। সুসমাচারের কথা ধরলে, দেখতে পাই, ঈশ্বরপুত্র একটি অবিশ্বাসীকেও বিশ্বাসী করে তুলতে বদ্ধ-পরিকর। সে চেষ্টা না করাই তো অস্বাভাবিক, অঘটন ঘটন-সক্ষমতার ধৃষ্ট দাবির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন কোন অলৌকিক

ঘটনায়, অন্ততঃ একজন সন্দেহবাদী, 'অবিশ্বাসী', কিন্তু শিক্ষিত, বিজ্ঞ ডাক্তারকেও যদি বিশ্বাস করানো যায়, তো সেই তো যথেষ্ট ?

* * *

লিসবনের একশো মাইল তফাতে ফতিমা। ১৯১৭ সালের অক্টোবর থেকে সেখানেও অলৌকিক নিরাময় ঘটছে। সেখানকার নথিপত্তর থেকে দুটো অসম্ভব ঘটনা তুলে দিলুম,—

তরের্স নোভাসের শ্রীমতী সিসিলিয়া আউগুস্তা ত্রেসতেস রাজযক্ষ্মায় ভুগছিলেন, সেই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ছিল পেরিটোনাইটিস এবং শোথ। অবস্থা বুঝে আত্মীয়স্বজনেরা কফিনের ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। ডাক্তারদের জবাব দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শ্রীমতী ত্রেসতেসকে ফতিমায় নিয়ে যাওয়া হল, ১৯২৩ সালের ১৩ই জুলাই।

তীর্থস্থানে কিছুই অঘটন ঘটলো না, কিন্তু যাঁর খিদে বলে কিছু ছিল না, ফেরার পথে সেই মেয়ের পেটে যেন কুলি-মজুরের খিদে। নিজের খাবার শেষ করে সঙ্গীর খাবারেও হাত বাড়ালেন। সেটা শেষ করে, আধ ঘণ্টা জিরোবার পর মেয়ের মুখে কথা ফুটলো, শুধু কথা নয়, হাসিও ফুটলো, গানও বেরুলো। হপ্তাখানেক পরে বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন শ্রীমতী ত্রেসতেস (১০)।

কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত রোগীর মনে এক একসময়ে একটা তীব্র আনন্দ-চেতনার উদয় হয়, আয়ুর্বেদে একথা স্বীকৃত। জানি না, শ্রীমতী ত্রেসতেসের মনেও সেইরকম হঠাৎ-আনন্দ-চেতনার উদয় হয়েছিল কিনা, নথিপত্রে সে খবর লেখা নেই কবে, লেখা নেই কোথায় তিনি পুরোপুরি রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

* * *

মাদিরা দ্বীপের কামারা দ্য লোবোসের এক ভদ্রলোক, বয়স বছর তিরিশ, পাঁড় মাতাল। ডাক্তারদের রায়, যকৃতের কাঠিন্যে তাঁকে ভুগতেই হবে এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু সুনিশ্চিত। ভদ্রলোকের

তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, তাঁর পাত্র সবসময়েই উচ্ছলিত। হঠাৎ ধার্মিক স্ত্রীর মনে হল, ফতিমার জল দু'পাঁচ ফোঁটা করে মদের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে বোধহয় ভালো হবে। স্বামীর অজান্তে তা-ই করতে লাগলেন তিনি। কী হল, কে জানে, মদে আর ভদ্রলোকের রুচি নেই। মৃত্যু যার দোর গোঁড়ায় দাঁড়িয়েছিল, সে বাঁচলো সত্তর বছর পর্যন্ত (১১)।

এ ধরনের নিরাময়ের সত্যতা কখনোই প্রমাণ করা যায় না। তা সত্বেও অলৌকিক খবরের পত্র-পত্রিকায় এসব গপ্পো লেখা হয়ই। যাদের কথা লেখা হয়েছে, তাদের জিজ্ঞেস করবারও উপায় নেই,—কবেই তারা মরে ভূত হয়ে গেছে। তাদের আত্মীয়-স্বজনরা স্বভাবতঃই গর্বিত, তারা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে, ব্যাপারটা ওইরকমই ঘটেছিল···।

১৯৪০ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ নিরাময়ের খবর ফতিমার নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। লুর্দের মত এখানকার ভেষজ-সংস্থা অল্পসংখ্যক নিরাময়কেই অলৌকিকের মর্যাদা দান করেছেন। নিরাময়ের ক্ষেত্রে এখানেও মেয়েছেলের হার সত্তর, পুরুষের তিরিশ। এমনটা হবার কারণ কি? মেয়েরা কি বেশি করে ভগবানকে ডাকে? নাকি, মেয়েরা কাল্পনিক রোগে বেশি ভোগে, ডাক্তাররা যা ধরতে না পেরে মাদোন্নার হাতে ছেড়ে দেন?

এ সব কথা বলার অর্থ, তীর্থস্থানের অসাধারণ নিরাময়কে অস্বীকার করা নয়, অস্বীকার আমি করছিও না। তবে একথাও বলছি যে যেহেতু স্বর্গীয় পরিবার দিব্যদর্শনের 'কারণ' নন, সেই হেতু দিব্যদর্শনজনিত অলৌকিক নিরাময়েরও 'কারণ' তাঁরা হতে পারেন না।

যাই হোক, স্বর্গীয় পরিবারের নামেই অলৌকিক ঘটনাবলী সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে। 'ফতিমার শিশু' (১২) নামের পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখা হয়ে থাকে, নানা নিরাময়ের খবর, নানা চিঠির

অংশবিশেষের উদ্ধৃতি, যাতে লেখা থাকে, খৃষ্টীয় দেব-দেবী-দেবদূতদের কাছে প্রার্থনা করে সুফল পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে ঈশ্বরের করুণা। সে-পত্রিকায় শুধু যে দেব-দেবী-দেবদূতদের করুণার কথাই থাকে তা নয়, দিব্যদর্শনপ্রাপ্ত সেই মৃত শিশুদের খবরও থাকে। তারা নাকি আজো নানা প্রার্থনা মঞ্জুর করে থাকে। খৃস্টান ধর্মসভা তাদের সন্তত্ব দান করেননি, তা না করুন, মানুষের করুণ প্রার্থনায় তারা আজো সাড়া দেয়!

* * *

ফতিমার সরলবিশ্বাসী রাখাল-ছেলে ফ্রান্সেস্কো মা মেরীর কাছে নিয়ত প্রার্থনা করতো এবং বিশ্বাস করতো তার প্রার্থনায় লোকে রোগমুক্ত হবে। তার বিশ্বাস যে কত সত্যি, তা বোঝা যাবে কয়েকটি উদাহরণ থেকে।—

> স্পেনের মাদিরার শ্রী জে. এন. তাঁর মরণাপন্ন পুত্রের জন্যে প্রার্থনা করতে বলেছিলেন ফ্রান্সেস্কোকে। ছেলে তাঁর ভালো হয়ে গিয়েছিল।
>
> পোর্তুগালের মিনহো শহরের শ্রী এ. আর. সি. তাঁর এক বান্ধবীর বড়রকম একটা অস্ত্রোপচারের জন্যে চিন্তিত ছিলেন। ফ্রান্সেস্কোর প্রার্থনায় অস্ত্রোপচার ভালোভাবেই উতরে গিয়েছিল।
>
> হল্যাণ্ডের ইউট্রেট শহরের হাসপাতাল ফেরত শ্রী এম. এ. অস্ত্রোপচারজনিত ক্ষতের কারণে মরণাপন্ন হয়েছিলেন, ফ্রান্সেস্কোর প্রার্থনায় তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছিলেন।
>
> যুগোস্লাভিয়ার লুবলিয়ানা গ্রামের শ্রী এল. পি. ফ্রান্সেস্কোর প্রার্থনায় তাঁর দীর্ঘকালের যকৃতের রোগ এবং হাঁপানি থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

> অস্ট্রেলিয়ার সিডনির শ্রী ডি. জি. মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর গুরুতর আহত এবং মরণাপন্ন পুত্রের জন্যে ফ্রান্সেস্কোর কাছে প্রার্থনার আবেদন জানিয়েছিলেন। সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

প্রার্থনার সাহায্যে রোগ নিরাময়ের ঘটনা ফ্রান্সেস্কোর খাতে অন্ততঃ একশোটা আছে।

* * *

খৃস্টান ধর্মসভা শুধু ঠিক করেই দেন না কোন্ দর্শনটি 'দিব্যদর্শন', তার সংজ্ঞাও দিয়ে থাকেন। অলৌকিকের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন পোপ, ১৮৭০ সালে। বলেছিলেন, অলৌকিক হচ্ছে, 'প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ'। ব্যস। কিন্তু ও-সংজ্ঞা একশো বছরের পুরোন, অনেক গির্জের চূড়োর মতন ওতেও ছাতা পড়ে গেছে। আস্তে আস্তে প্রকৃতির অনেক ছল, অনেক চাতুরী মানুষ ধরে ফেলেছে, তাঁর ছলা-কলার ওপর কারিকুরিও করতে শিখেছে, অতএব আমার বড় আশা যে আর একশো বছর পরে অলৌকিক বলে আর কিছু থাকবে না।

এখন, মানে আমার এ-বই লেখার সময়ে, পোপের বিচার-সভা ১২০০ (!) জনকে 'সন্তত্ব' দেবার কথা ভাবছেন।

সন্তের সংখ্যা এখনই প্রায় ১২০০০!

১৭৩৮ সালে চতুর্দশ পোপ তাঁর 'On the Beatification and Canonization of God's Servants' নামে বইটি প্রকাশ করেন, তখন থেকেই সন্তত্ব দানের নিয়ম চালু হয়েছে যে, কোন সাধু অথবা সাধ্বীকে তাঁদের 'মৃত্যুর পরে' অন্ততঃ দুটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে হবে, তবে তাঁদের সন্তত্বে উন্নীত করা হবে। অপেক্ষমান ১২০০ প্রায়-সাধুদের ভেতর যাঁরা আছেন, তাঁদের অবস্থা তাঁদের পূর্বসূরীদের অবস্থার তুলনায় অনেক কাহিল। যে সব ব্যাপারকে আগে সহজেই অলৌকিক বলে ধরে নেওয়া হত, আজ সব ভাল

ডাক্তারেই সে সব করে ফেলছেন। সন্ত হওয়া আজ আর আগের মতন অত সহজ নয়। ছোটবেলায় পাঠশালে পড়া লাতিন প্রবাদ মনে পড়ছে, 'কালের পরিবর্তনের সঙ্গে আমরাও পরিবর্তিত হই'।

খৃস্টধর্মের কোন সেবক যখন জীবিতাবস্থায় একের পর এক অলৌকিক কাণ্ড করতে থাকেন, তখন ধর্মসভা কী করেন? আবার পোপের আশীর্বাদধন্য না হওয়া সত্ত্বেও যদি সে-সেবক বিশ্বাসী-মানুষ কর্তৃক পূজিত হন, তাহলে? তাহলে কী আর হবে, মুখ বুজে সহ্য করতে হবে।

দীক্ষিত মহলের ধারণা, ফ্রাঞ্চেসকো ফোর্জিওনে, যিনি পেতর পিও নামে জগদ্বিখ্যাত, তাঁকে নিশ্চয় সন্তসমাজভুক্ত করা হবে। পেতর পিও তাঁর সারা জীবনে এত বিভূতি দেখিয়েছেন যে তাঁকে সন্তত্ব দান করা হবে কি হবে না এ প্রশ্ন ওঠবার অনেক আগেই লোকে তাঁকে (জীবিত) সন্ত করে দিয়েছিল।

ফ্রাঞ্চেসকো ফোর্জিওনে পিয়েত্রেল্‌চিনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৭ সালের ২৫শে মে আর দেহত্যাগ করেছিলেন সান গিওভান্নি রোতোন্দা মঠে

'খৃস্টের ক্ষতচিহ্ন প্রাপ্তির প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে' (১৩)।

ফ্রাঞ্চেসকোর যৌবনের কথা সামান্যই জানা আছে, তা সে ইচ্ছাকৃত ভাবেই হোক বা এমনিই হোক। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, কুঁড়ে ছেলে বলে পরিচিত ছিলেন। কাপুশিন সন্ন্যাসীরা আপন সতীর্থ সম্পর্কে বড় একটা মুখ খোলেন না, কিন্তু তাঁর দীক্ষিতাবস্থাতেই একটি আজব গুজব ছড়িয়েছিলেন, 'এই জীর্ণ, শীর্ণ শিষ্যটি দিনের পর দিন না খেয়ে থাকেন···ভিনিফ্রোতে একুশ দিন প্রায় কিছু না খেয়েই থেকেছেন'। দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে তিনি প্রায়ই জ্বরে ভুগতেন আর সে জ্বরে 'মঠের থার্মোমিটারগুলো ফেটে যেতো'। যিনি তাঁর শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকতেন তিনি জোরালো বড় থার্মোমিটার

দিয়েও দেখেছেন, পারা ১১৮°তে (!) উঠে গেছে। রাত্রে মঠের কুঠরী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতো। 'যখন তিনি পবিত্র নিয়মানুযায়ী সামান্য বিশ্রাম লইতে চেষ্টা করিতেন, চতুর্দিক হইতে ভয়ঙ্কর দৈত্যসকল আসিয়া উপস্থিত হইত।'

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে তখন তিনি পিতৃগৃহে বাস করছেন। ১৯১৫ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। মা খেতে ডাকলেন, পেতর পিও বেরিয়ে এলেন বাগানের একটা ছোট্ট ঘর থেকে, হাত দুটো ঝাড়তে ঝাড়তে, 'যেন দুইটি হস্তই অগ্নিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে'। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?' তিনি বললেন, 'কী জানি, কেমন যেন ছুঁচ ফোটানোর মতন লাগছে'। যে বই ছাপতে সর্বাধিক যাজকীয় স্বীকৃতি পেয়েছে, তাতে বলা আছে, 'পেতর পিও খৃস্টের ক্ষতচিহ্ন সত্যই লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ্যে অদৃশ্য ছিল সেই ক্ষত'। তারপর সতীর্থদের সঙ্গে একদিন গির্জেয় যখন প্রার্থনা সভায় বসেছিলেন একেবারে শেষের সারিতে, তখন সেই অদৃশ্য ক্ষত থেকে হঠাৎ রক্ত চোয়াতে লাগলো। যখন উঠে দাঁড়ালেন যাবার জন্যে, তখন দেখা গেল, তাঁর হাত থেকে রক্ত ঝরছে, পায়েও ক্ষত চিহ্ন, আর বুকের ডান দিকেও গভীর একটা ক্ষত।

জনতা চিৎকার করে উঠলো, 'পেতর পিও মহাযোগী'।

ক্ষতের আলোকচিত্র পাঠানো হল পোপের পবিত্র দপ্তরে। পেতর পিওর ক্ষতগুলি ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে বলা হল। পরীক্ষা হল, পটি বাঁধা হল, সবই হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররা রায় দিলেন, 'এ ধরনের ক্ষত বিজ্ঞানের উপলব্ধির আওতাবহির্ভূত'। ক্ষতগুলি তিনি দস্তানায় ঢেকে রাখতেন, তবু রোজ এক বাটি করে রক্ত বেরুতো।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বিজ্ঞান যাকে আজ 'পরামনো-বিদ্যাগত ব্যাপার' বলে, তার সব ক'টি 'বিভূতি' পেতর পিওর

আয়ত্তাধীন ছিল। একাধারে তিনি ছিলেন অন্তর্দ্রষ্টা, ভবিষ্যদ্বক্তা, চেতনা-সংবাহক (telepathist), গতি-সংবাহক (telekinetist), অলৌকিককর্মা। দূর থেকে রোগ নিরাময়ের শক্তিও তাঁর ছিল। পেতর পিও একবর্ণও ইংরেজি বুঝতেন না, কিন্তু মার্কিন শিশুরা কথা বললে তিনি বুঝতে পারতেন। লোকের মনের কথাও তাঁর অজানা থাকতো না। একজনকে একবার মুখের ওপর বলেছিলেন, 'তুই তোর বৌকে খুন করতে চাস!' আর একবার, একটি মেয়ে বড় রকম একটি স্ত্রীরোগে ভুগছিলেন, পেটটা তখনই কাটা দরকার, কিন্তু পেতর পিওর মুখের কথায় তাঁর রক্ত তো বন্ধ হলই, তাঁকে বললেন, 'তোমার একটি ছেলেও হবে'। বছরখানেক বাদে ছেলে কোলে এসে তাঁকে প্রণাম করে গেলেন তিনি।

সান গিওভান্নি মঠের প্রতিবেদক লিখেছেন, একবার এক ভদ্রলোক তাঁর মুমূর্ষু ভ্রাতুষ্পুত্রের কল্যাণে পিতা পিওর স্বীকারোক্তি কক্ষে গিয়ে প্রার্থনা করলেন। যে-ছেলেটিকে ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গিয়েছিল, চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরেই সে সুস্থ হয়ে উঠলো।

পিওর সঙ্গে দেখা করতে হলে কয়েক হপ্তা আগে থেকে ব্যবস্থা করতে হয়, একটা মেয়েকে সময় দেওয়া হয়েছিল, যেদিনের কথা বলছি, তার তিন দিন পরে, কিন্তু অত দেরি তার সইবে না। আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে চললো পিতা পিওর সঙ্গে দেখা করতে। পিও মাঝ পথেই তাকে থামিয়ে বললেন, 'এক্ষুনি বাড়ি চলে যাও, সব ঠিক হয়ে যাবে'। মেয়েটি যাচ্ছিল তার মুমূর্ষু স্বামীর নিরাময়ের জন্যে, বাড়ি ফিরে দেখলো স্বামী সুস্থ হয়ে উঠেছে।

পেতর পিওর সম্পর্কে এরকম অলৌকিক নিরাময়ের ঘটনা ভুরিভুরি আছে। একবার একটি লোক তার অপরাধ স্বীকার করে যখন মঠ থেকে বেরুলো, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। হঠাৎ বৃষ্টি

নাবলো আকাশ ভেঙে। কিন্তু তার তো ভিজলে চলবে না, দাঁড়িয়ে রইলো। পিতা পিও এসে বললেন, 'চল, ভয় কি, আমি তোমার সঙ্গে যাবো'। যখন সে তার চটিতে ফিরলো, তখন সবাই শুধোয়, 'এত বৃষ্টি, তবু না ভিজে এলে কেমন করে?' চটিওলা ব্যাপারটা বুঝেছে, বললে, 'এ আর বেশি কথা কি, বাবা সঙ্গে থাকলে অমন…'। পিতা পিও কিন্তু উল্টো ভেলকিও দেখাতেন। এক শীতের ভোরে একটি মেয়ে অঝোর ঝরণ বৃষ্টি মাথায় করে কাগ-ভিজে হয়ে মঠে ঢুকলো। পিতা সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন। মেয়েটি সবিস্ময়ে দেখে, কাপড়-চোপড় তার 'শুকনো খটখট করছে'।

একই সময়ে দু'জায়গায় সশরীরে উপস্থিত থাকতেও পারতেন তিনি। এক লেখিকা বলেছেন, একঘর অপেক্ষমান জনতার সামনে বন্ধ দরজার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারতেন। বিস্ময়ে তারা চিৎকার করে উঠতো, 'কোথায় ছিলেন বাবা, আমরা কত খুঁজছি?' তিনি বলতেন, 'তোমাদের সামনেই তো পায়চারী করছিলুম, তোমরা যদি না দেখ, আমি কী করবো'।

পিতা পিও পীড়িত, ঘরে ভ্যাপসা গন্ধ, হঠাৎ ঘর ভরে উঠলো সুমিষ্ট পুষ্পগন্ধে। ডাঃ রোমানেল্লীর আশ্চর্য লাগলো, পেতর পিও আতর ব্যবহার করেন নাকি! হবেও বা। এক কাপুশিন সন্ন্যাসী তাঁর ভুল ভেঙে দিলেন। বললেন, 'পিওর রক্তে আতর আছে'। এক ডাক্তার, নাম ফেস্তা, পিতা পিওর রক্তে একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন রোমে, গবেষণাগারে পরীক্ষা করবার জন্যে। গাড়ির অন্যান্য যাত্রীরা কৌতূহলী হয়ে ওঠে, 'কী নিয়ে যাচ্ছেন আপনি, এমনি মিষ্টি গন্ধ কিসের?' ১৯৩০ সালের জুলাই। বোলোনিয়ার একটা বাড়ির বসবার ঘর। একটি রুগ্ন মেয়ে সান্ গিওভান্নি মঠ থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতেই মিষ্টি গোলাপগন্ধে ঘর ভরে গেল। স্বর্গীয়

সেই অপূর্ব সুবাসে ঘর উপচে রইলো প্রায় পনেরো মিনিট, তার পর মেয়েটি তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত আবার নাড়তে পারলো। গন্ধের ব্যাপারে সন্দেহ থাকবার কারণ নেই, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে শত শত লোক যে সেই স্বর্গীয় সুবাস উপভোগ করেছে। মাইকেল ফ্যারাডের ভাষায় বলতে হয়, 'এমন কোন অলৌকিক কাণ্ড নেই, যা সত্য হতে পারে না'।

পিতা পিওর দেহে খৃস্ট-ক্ষতচিহ্ন ফুটে উঠেছিল, তাঁর সমসাময়িকদের চোখের ওপরেই। তাঁর বিখ্যাত পূর্বসূরী, আসিসির ফ্রান্সিসের (১১৮২—১২২৫) দেহে সে ক্ষত প্রতিফলিত হয়েছিল সর্বপ্রথম, সে কথা সরকারীভাবে স্বীকৃত। কিন্তু তাঁকে সন্ত অভিধায় ভূষিত করা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর দুবছর পরে। তাঁর দেহে প্রতিফলিত খৃস্ট-ক্ষতচিহ্ন আজ রূপকথায় পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু যে সন্ত পাখীদের সঙ্গে আলাপচারী করতেন, সে সন্ত আজ বহুকাল হল দেবদূতদের সভায় গান করছেন। সন্ত ফ্রান্সিসের পর শোনা যায়, আরো প্রায় ৩৫০ জনের দেহে খৃস্ট-ক্ষতচিহ্ন প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সকলকার দেহের ক্ষতচিহ্নই কিছু খাঁটি নয়। যথা, জার্মানীর ওবের্প্ফাল্ৎসের কনের্স্রয়েৎবাসিনী, তেরেসে নয়মান। খবরের কাগজের পাতায় তার নাম বড় বড় হরফে বেরুতো, কিন্তু দেখা গেল সব ভুয়ো। ব্রহ্মবিদ ডাঃ য়োসেফ হানাউয়েরের (১৪) ধারণা, তেরেসে নিজের দেহে খুঁচিয়ে ঘা করতো। কারণ প্রায়ই তার অতিথিদের সে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিত, তারপর খানিক পরে ডেকে দেখাতো তার রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন। বেসরকারী খবর বলে, তেরেসে খৃস্ট-ক্ষতচিহ্ন লাভ করেছিল ১৯২৬ সালের লেণ্টে (Lent—ঈস্টারের আগের ৪০ দিন ব্যাপী খৃস্টান পরব), তাছাড়া খৃস্টান ছুটির দিন বাদে রোজই সে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর দর্শন লাভ করতো !

তবে বহু ভক্তের হাতে, পায়ে, বুকে যে খৃস্ট-ক্ষতচিহ্ন দেখা গেছে এবং তা এত লোকে দেখেছে যে তাকে বাজে কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শোনা যায়, খৃস্ট-ক্ষতচিহ্ন কাঁটার মুকুটের মত, কিম্বা ক্রুশের সঙ্গে পেরেক দিয়ে গাঁথার মত যন্ত্রণাদায়ক। সে ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে বিশেষ করে শুক্রবারে এবং সাধারণ চিকিৎসায় সে ঘা সারে না।

সমাধানের অসাধ্য অলৌকিকের মুখোমুখী হয়েছি বলছেন? আগেই স্বীকার করি, খৃস্ট-ক্ষতচিহ্নের কোন প্রামাণিক ব্যাখ্যা 'আজ পর্যন্ত' পাইনি। তাই ব্যাপারটা গূঢ়তত্ত্বের সুরক্ষিত, ঘন যবনিকার আড়ালে আজো ঢাকা রয়েছে।

* * *

(পিতা পিওর প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে আর একটি দিশী যোগীর বিষয়ে বলার লোভ সামলাতে পারছি না। তিনি আমার বাবার গুরু শ্রীমৎ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস। সাধারণভাবে তিনি পরিচিত ছিলেন 'গন্ধবাবা' নামে। বাবার কাছে ছোটবেলায় তাঁর বহু অলৌকিক কাণ্ডের গল্প শুনেছি। কিছু বিশ্বাস করেছি, কিছু করিনি। কিন্তু বড় হয়ে তাঁর সম্পর্কে বাবার কাছে শোনার শতগুণ জেনেছি পণ্ডিত শিরোমণি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বহু গ্রন্থ থেকে। বাবা কাছের মানুষ, তাঁর কথা খানিক বিশ্বাসে, খানিক অবিশ্বাসে নিলেও কবিরাজ মহাশয়ের কথা যে কোন মানুষের পক্ষে ফেলা শক্ত। তাছাড়া, সেদিন আবার ডাঃ পল ব্রাণ্টনের 'A Search in Secret India' গ্রন্থেও তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা পড়লুম। আমার ছেলেবেলায় দেখা বিশুদ্ধানন্দকে প্রায় ভুলতে বসেছিলুম, পেতর পিওর কথায় আবার সেই মহাপুরুষকে মনে পড়লো। অষ্ট বিভূতির নামই শুনেছি,

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের কথা পড়ে এবং শুনে বোধ হয় বুঝতেও পেরেছি বিভূতিগুলো আসলে কী বস্তু।

আমাদের দেশে বিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষের অভাব নেই। তাঁদের ভেতর থেকে হঠাৎ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের প্রসঙ্গ তোলার কারণ, তাঁকে আমি দেখেছি এবং তাঁর কথা যত শুনেছি এবং পড়েছি, অন্যদের সম্পর্কে তার শতাংশের একাংশও জানি না।—অনুবাদক)

*　　　*　　　*

পাঠকের হয়তো জানা আছে, আগেকার কালে ভূত-প্রেত, দত্যি-দানা যাদের ওপর ভর করতো, ধর্মীয় ঘটনাবলী ঘটতো সম্ভবতঃ তাদেরই ঘিরে। মৃগীকে আগে বলা হত 'পবিত্র পীড়া' (morbus sanctor), কেননা মৃগী রোগীরা প্রায় ক্ষেত্রেই দেব-দেবী, দত্যি-দানা দেখতো। 'এ কথা সুবিদিত যে মহম্মদও মৃগীরোগে আক্রান্ত হইতেন এবং সেই কারণে তাঁহার আত্মীয়-পরিজনের ধারণা ছিল যে তাঁহার মধ্যে দৈবশক্তি বর্তমান। কোরাণেও তিনি তাঁহার স্বর্গবাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১৫)।' অধ্যাপক ও. প্রোকপ বলেছেন, মৃগী রোগে লোকের মনে আধ্যাত্মিক ধরনের অনুভূতি জাগে। ফলে কঠোর তপশ্চর্যার দিকে তাদের মন যায় (খৃস্ট-ক্ষতচিহ্নধারীর বৈশিষ্ট্য !), প্রাণায়ামের সাহায্যে তারা ঊর্ধ্বলোকের সান্নিধ্য আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

ক্যাটাটোনিয়া রোগটি এক জাতের স্কিৎসোফ্রীনিয়া। সে-রোগে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে যায়, চৈতন্য লোপ পায়, কখনো বা দেখা দেয় প্রবল উত্তেজনা অথবা বিহ্বলতা এবং সমাধি। যারা ধার্মিক প্রকৃতির, এই অবস্থায় তাদের ভেতর কিছু বিশেষ শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। এই রোগের প্রলোভনও কম কার্যকর নয়, কারণ স্কিৎসোফ্রীনিয়ার রোগীর বুদ্ধিভ্রংশ হয় না, যা কিছু সে করে, সবই তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

অধ্যাপক প্রোকপ এবং অন্যান্য পণ্ডিত বলেছেন, মৃগীরোগও (hysteria) খাঁটি মানসিক ব্যাধি। তাঁরা বলেছেন, 'এ রোগে দেখা যায়, রোগীর কামনা, লোকে তাকে শ্রদ্ধা করুক, ভালোবাসুক, প্রশংসা করুক, খাতির করুক, সেই সঙ্গে থাকে, তার গুণে লোককে আকর্ষণ করার ক্ষমতায় তার আনন্দ। এই কারণেই শহীদরা শুধু হাসিমুখে তাদের যন্ত্রণা সহ্যই করে না, শহীদ হতে এগিয়েও যায় হাসিমুখে।' তাছাড়া, প্রায়ই প্রমাণিত হয়েছে, যন্ত্রণার উপলব্ধি মৃগীরোগীর প্রায় থাকে না বললেই হয়।

আমার মনে হয়, নিদানতাত্ত্বিক এই ছোট্ট আলোচনাটুকু থেকে খৃস্ট-ক্ষতচিহ্নধারণের পূর্বে লোকের মনের অনুকূল অবস্থার ইঙ্গিত মেলে। রোগের পুরো তিনটি লক্ষণই রোগীর ক্ষতিগ্রস্ত অথবা অশান্ত স্নায়ুতন্ত্রের কথাই ব্যক্ত করে। সাধারণ বইয়েও ক্ষতচিহ্নযুক্ত লোক সম্পর্কে বলে, তাদের স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত সংবেদনশীল, 'খৃস্ট-ক্ষতচিহ্নের' কারণে তাদের স্নায়ুতন্ত্র মানসিক অথবা আধ্যাত্মিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'অঙ্গজ স্নায়ুতন্ত্রের (vegetative organ) একটি অংশ স্বয়ংক্রিয়-স্নায়ুতন্ত্র (parasympatheticus)। সে-স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র কাজ করে মস্তিষ্কের আদেশে, তারই কারণে চোখের পাতা পড়ে, অশ্রু ঝরে, ক্ষরিত হয় লালা, আবার তারই দরুন যৌন-অঙ্গও সংযত হয়।

অত্যধিক উত্তেজনায় (vagotonia) যে সব অঙ্গ স্বয়ংক্রিয়-স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা ক্রিয়াশীল হয়, তাদের প্রয়োজন হয় খুব সামান্য উত্তেজনার, তা থেকে আঙ্গিক গোলযোগ দেখা দিতে পারে। পেশী এবং শিরার অস্বাভাবিক উত্তেজনা (dystonia), দুর্বল অঙ্গজ-স্নায়ুতন্ত্র-প্রসূত এবং তার প্রকাশ ঘটে দৈহিক অস্বস্তির ভেতর দিয়ে···এবং রক্তের আধিক্য অথবা সঞ্চয় (hyperaemia) হেতু চর্মেও তা প্রকাশ পায়। নিদানতাত্ত্বিক আলোচনা শেষ করার আগে বলি, তীব্র

অনুভাবের (hyperaesthesia) সঙ্গে স্পর্শে কাতর হওয়া, নানা স্নায়ুরোগের পরিণতি।

মোট কথা, আমার জানা প্রত্যেকটি খৃস্ট-ক্ষতচিহ্নজনিত ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতার উদ্ভবের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবপ্রবণতাও দেখেছি। ব্যতিক্রমহীনভাবে বলা যায় যে তারা ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক কাছের মানুষদের আকর্ষণ করেই। কিন্তু শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রশংসা, পরিচিতির কারণে তাদের মনে কি একটা নিরহংকার আনন্দের অনুভূতি জাগে না? তাদের আপন আকর্ষণশক্তি (=খৃস্ট-ক্ষতচিহ্ন) দিয়ে তারা যে মানুষকে টানতে পারে, এ কথা কি তারা অস্বীকার করতে পারে? চিকিৎসাশাস্ত্রগত বিশেষ দৈহিক অবস্থা না হলে, যন্ত্রণার উপলব্ধি কেন থাকে না তাদের? তাদের দৈহিক ক্রিয়ানিচয় কি স্নায়ুতন্ত্রের আদেশ-উত্তেজনার ওপর নির্ভরশীল নয়?

নিদানতত্ত্বগত এ সব আলোচনা থেকে আমার মনে হচ্ছে, খৃস্ট-ক্ষতচিহ্নপ্রাপ্তদের মানসিক পীড়ন এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয় যে তার প্রভাব তাদের সমস্ত দেহের ওপর গিয়ে পড়ে। মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্স্টিট্যুট ফর এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন অ্যাণ্ড সার্জারীর অধ্যক্ষ ডাঃ হান্স্ সেলিয়ে, 'পীড়ন-গবেষণার (stress research) জনক'। অমন মানসিক অবস্থার তিনি একটা বিবরণ দিয়েছেন, বলেছেন, মানসিক পীড়নকে সব সময়ে প্রকাশ করা হয়, 'সিনড্রোম' দিয়ে (syndrome), অর্থাৎ পরিবর্তনের সামগ্রিকতা দিয়ে, কোন একটি পরিবর্তন দিয়ে নয়। পৃথক্কৃত কোন প্রভাব কোন একটিমাত্র অংশে, হয় ক্ষতি করে, না হয় উন্নততর কীর্তির প্রেরণা যোগায় (১৬)। প্রসঙ্গতঃ, আজকের দিনের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বলা যায়, প্রত্যেকটি পৃথক লক্ষণ স্বাভিভাবের (autosuggestion) প্রাপ্ত ফলের সঙ্গে গ্রথিত।

* * *

১৯৭৩ সালের ১৪ই অক্টোবর নিউ ইয়র্কের প্লাজা হোটেলে বসে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রাণ্ডির সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল,—

'ভাঙা শিরদাঁড়ার জন্যে বহু বছরের পঙ্গু লোকটিকে আপনি কাটা-ছেঁড়া না করেই সারালেন কেমন করে? আপনি কি অলৌকিক ডাক্তার নাকি?'

'অলৌকিকের প্রশ্নই নেই। এ ব্যাপারে অলৌকিকের কথা যদি কেউ বলে, তো সে-অলৌকিক হল, দেহের ওপরে স্রেফ মনের কাজ। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে এ গ্রহে মস্তিষ্কই হচ্ছে শেষ পোষ-না-মানা জানোয়ার।'

'কিন্তু, লোকটির পক্ষাঘাত সারালেন কেমন করে?'

'আমি তাকে একটা প্রতিসন্তরক (feed back) বিশিষ্ট পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণ নিবেশক বৈদ্যুতিক যন্ত্রের (electromyographic) সঙ্গে যুক্ত করে শেখালুম, কেমন করে পরম ধৈর্য্যে সে-যন্ত্রের "কথায়" সাড়া দিতে হয়।'

'যন্ত্রটা কেমনতরো?'

'একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র, অনেকটা, মস্তিষ্কের এক্স্ রে ছবি নেবার বৈদ্যুতিক যন্ত্রের (encephalograph) মতন। কতকগুলো জৈব প্রতিক্রিয়া, যথা হৃৎস্পন্দন, অথবা রক্ত চাপ সূচিত করে সে-যন্ত্র, কিন্তু সে-কাজ করতে করতে যেই কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে, অমনি সে কথা সে রোগীকে জানিয়ে দেয়। যেমন ধরুন, হৃৎস্পদন যে তালে স্পন্দিত হওয়া উচিত, তার চেয়ে ঢিমে তালে স্পন্দিত হচ্ছে, তাহলে সে-যন্ত্র ছন্দোবদ্ধ একটা পিপ্-পিপ্ শব্দ করে রোগীর 'হেডফোন' মারফৎ রোগীকে জানিয়ে দেবে, ঠিক কেমনভাবে তা স্পন্দিত হওয়া উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে

তার মস্তিষ্ক জেগে উঠে হৃৎপিণ্ডকে নির্দেশ দেবে, উপযুক্ত তালে চলতে।'

'অর্থাৎ, বলেছেন, মগজ হৃদয়কে বলে দেয়, কত তাড়াতাড়ি তাকে চলতে হবে।'

নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাদি সমেত স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রিয়াপদ্ধতি সমন্বিত মনুষ্য দেহটি একটি 'সাইবার্ণেটিক-তন্ত্রের' মত। মস্তিষ্ক পেশীসমূহকে নির্দেশ দেয়, এই এই ভাবে কাজ করবে। মস্তিষ্ক খবর পায় স্বাদ, স্পর্শ, দর্শন, ঘ্রাণ, শ্রুতি, আনন্দ, বেদনা, ইত্যাদির অনুভূতি, তথা নানা সংবেদক ইন্দ্রিয় মারফত। যথা হৃৎপিণ্ড যদি অনিয়মিতভাবে স্পন্দিত হতে থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে জাগে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির অনুভূতি। তাই অবিলম্বে সে পাঠিয়ে দেয় হৃৎপিণ্ডের পেশীসমূহে একটা উপযুক্ত নির্দেশ এবং সে নির্দেশ পালিত হয় নিঃসন্দেহে, যদি না কোন ধমনীর অবরোধজনিত কোন বাধা উপস্থিত হয়।

'ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সানফ্রান-সিসকো চিকিৎসা কেন্দ্রের ডাঃ বি. এঙ্গ্‌ল্ আমার সহকর্মী। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে, তথা চিন্তার সঞ্চারণ মারফত, অনেক রোগীর হৃৎস্পন্দনকে, বিলম্বিত অথবা ত্বরান্বিত করেছেন। সে ক্ষেত্রে, রোগীকে বসানো হয়, লাল, সবুজ, হলুদ রঙের তিনটি আলোক বর্তিকার সামনে। হলুদ আলোক রোগীর স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের নির্দেশক। ডাক্তার যদি দ্রুততর স্পন্দনের নির্দেশ দেন, লাল আলো জ্বলে উঠবে এবং রোগী তার 'হেডফোনে' দ্রুতস্পন্দনের একটি নকল শব্দ শুনতে পাবে। এই ভাবে পরীক্ষাধীন রোগীরা শ্রুতি এবং দর্শন দুদিক থেকেই প্রভাবিত হয়। তারা চেষ্টা করে লাল

আলোর নির্দেশ মানতে, চেষ্টা করে, 'হেডফোনে' শ্রুত স্পন্দনকে অনুসরণ করতে। কয়েক মুহূর্তেই দেখা যায়, কাগজের উপরে রোগীর স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের চেয়ে দ্রুততর স্পন্দনের চিত্রলেখ ফুটে উঠেছে। এই ভাবে নাড়ীর গতিও মন্থরায়িত করা যায়, পরিবর্তন করা যায় রক্ত চাপের, দেহের ত্বককেও নির্দেশ দেওয়া যায় গরম অথবা ঠাণ্ডা করার...এমন কি, পক্ষাঘাতগ্রস্ত সেই যুবকটির মত ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতেরও কবলমুক্ত হওয়া যায়। চিকিৎসাক্ষেত্রে এ পরীক্ষাগুলি প্রমাণিত সত্য, অলৌকিক নয়। এ পদ্ধতির নাম, জৈব-প্রতিসম্ভরণ (Bio-Feedback)।'

*　　　*　　　*

খৃস্ট-ক্ষতচিহ্নধারীদের দেহক্ষতচিহ্নের উৎপত্তি এবং তার কারণ অথবা জৈব-প্রতিসম্ভরণ সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকার জন্যে তাদের এতটুকু দোষ দেওয়া যায় না।

যারা তুরীয়ানন্দ ভোগ করে তারা তাদের আরাধ্য দেবতার সঙ্গে যখন আধ্যাত্মিক একাত্মতা লাভ করে, তখন তাদের দেহের ভেতর ধীরে ধীরে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। রোগতত্ত্বগতভাবে বলা যেতে পারে যে-ভিন্নাভিভাব (heterosuggestion) তার অন্তরে বছরের পর বছর কাজ করেছে, তার প্রকৃতিতে সে-অভিভাব এমনি অন্তর্ব্যাপ্ত যে এক সময়ে সে জানতেও পারে না যে সে প্রকৃতিরই অংশে পরিণত হয়ে গেছে এবং তখন তার অজান্তেই তার দেহে ওই ক্ষতচিহ্ন ফুটে ওঠে। যদি ধর্মপ্রাণ নারী অথবা পুরুষ একান্তভাবে কামনা করে, যে তার দেহে যিশুর ক্ষতচিহ্ন দেখা দিক এবং সে কামনার সঙ্গে প্রার্থনা-বাণীও উচ্চারিত হয়, তাহলে মস্তিষ্কও একদিন

সে প্রার্থনায় সাড়া দেবে, আদেশ দেবে শিরা-উপশিরাকে রক্তের স্রোতকে তীব্রতর করে বহিস্ত্বকে আঘাত করতে, ফুটিয়ে তুলতে রক্তের ছোট ছোট ফোঁটা। আসলে সবার ওপরে কাজ করে কৃচ্ছ্রসাধনের ইচ্ছে এবং ত্রাণকর্তার যন্ত্রণা উপভোগ করবার উদগ্র কামনা।

বিখ্যাত ইংরেজ শল্যচিকিৎসক, রিচার্ড সার্জেন্ট (১৭) প্রশ্ন করেছেন, 'মুক্তিলাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন কি একান্ত প্রয়োজন? ...যন্ত্রণা ভোগ না করলে কি মুক্তি পাওয়া যায় না? খৃস্টান স্বর্গে শত শত শহীদের স্থান তৃতীয় স্তরে, খৃস্ট-শিষ্য এবং দৈববার্তা ঘোষকদের নিচে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র, ওই শহীদত্ব'।

কৃচ্ছ্রসাধন, যন্ত্রণাভোগ এবং সন্ন্যাসের সাহায্যে স্বর্গীয় সমাজে প্রবেশের কামনা—এক কথায় শহীদত্ব—হচ্ছে, খৃস্ট-ক্ষতচিহ্নধারীদের মূল কথা। খৃস্ট-ক্ষতচিহ্নধারীদের ইচ্ছাশক্তি দুর্জয়।

ধর্মের গণ্ডি ছেড়ে একটি সাধারণ উদাহরণ দিই, দেখা যাক, দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি কতখানি কী করতে পারে।...বিশের দশকে এক খনি-শ্রমিক, নাম আউগুস্ত দিয়েরের, কয়লার সুড়ঙ্গ ধ্বসে জীবন্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়েছিল। দুদিন, দুরাত্তির বেচারা অপেক্ষা করে রইলো উদ্ধারের আশায়। তার ডান উরু আর পায়ের খানিক জগদ্দল পাথরের তলায় চাপা। প্রথমে সে ভাবলো, যন্ত্রণার অনুভূতিকে পাত্তা দেবে না, কিন্তু মনে হল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং তাদের কোন সাড় নেই। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে চিন্তা করতে লাগলো, 'অসাড়' উরুতে রক্ত চলাচল করুক। প্রথমে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে উঠলো, তবু তাকে আমল দিলো না। তারপর অনুভব করলো, উত্তাপ ফিরে আসছে, 'সাড়ও' জাগছে। পরে তাকে পরীক্ষা করে দেখবার সময় ডাক্তাররা অবাক হয়ে দেখেছেন,

তার উরুতে এবং পায়ে রক্তের জোগান ভালোই ছিল। পা-টাকে তার কেটে বাদ দেবার প্রয়োজন হয়নি। কয়লা খনির শ্রমিকটি ওই দুর্ঘটনার সময় একটি নতুন ক্ষমতা আবিষ্কার করেছিল। ইচ্ছাশক্তি এবং স্বাভিভাবের সাহায্যে সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সংবেদনহীন করে ফেলতে পারতো (সন্ন্যাসীদের মত!) আর যে কোন অঙ্গে ইচ্ছে মত রক্ত 'পাঠাতেও' পারতো। সে ক্ষমতার অনুশীলন করে সারা পৃথিবীর কৌতূহল উদ্রেক করেছিল আউগুস্ত দিয়েরের।

খেলোয়াড়রা মঞ্চে দাঁড়িয়ে অনেক সময় নিজের দেহে ছোরা-ছুরি গেঁথে দেখায়, সেও এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু এই লোকটি নিছক একাগ্রতার বলে রুদ্ধশ্বাস দর্শকমণ্ডলীর সামনে আপন দেহে খৃস্টদেহক্ষত ফুটিয়ে দেখালো। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সে এ বস্তু দেখিয়েছে, বুধবারে আর রবিবারে আবার দু'বার করে।

কিন্তু সেই অলৌকিক বিচিত্রানুষ্ঠানের একদিন অবসান ঘটলো, স্নায়বিক বৈকল্যে। ওস্তাদ ব্যবস্থাপকের ইচ্ছে, অনুষ্ঠানকে অতি-নিখুঁত করা। আউগুস্তকে আদেশ করলেন, রক্ত-অশ্রু ঝরাতে। কিন্তু ঝরাতে বললেই ঝরানো যায় না। তীব্রতম ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেও রক্ত সে বের করতে পারলো না তার অচ্ছোদপটল ভেদ করে। তার পরে অর্থগৃধ্নু ব্যবস্থাপক একটি চক্ষুচিকিৎসক মোতায়েন রাখতেন মঞ্চের সাজঘরে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের আগে তিনি তার অক্ষিগোলকে ক্ষুদ্র ছিদ্র করে দিতেন। সেই ভাবে রক্ত-অশ্রু ঝরানোও হল কয়েকবার। তারপর? তারপর আবার কি। খেল খতম। যাই হোক, চোখ থেকে জলই পড়ুক আর রক্তই ঝরুক আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমি শুধু বলতে চাইছি, ইচ্ছেশক্তির সাহায্যে দেহে ক্ষতচিহ্ন উৎপন্ন করা যায়।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্তবিদ অধ্যাপক এচ. জে. ক্যাম্বেল

দেখিয়েছেন, কি মানুষ, কি জন্তু সবারই মস্তিষ্ক আনন্দ আহরণে ব্যাপৃত থাকে। ভ্রূণ যখন জরায়ুর গভীরে বাড়তে শুরু করে, তখনই তার মস্তিষ্কটা হয় দেহের তুলনায় বেশ বড়। সেই মস্তিষ্কের ধূসর-কোষই দেহকে গড়ে তোলে, যথা নির্দিষ্ট গঠনে। যে-স্নায়ুপথে আনন্দ আহরিত হবে, সে-পথ জন্মমুহূর্তেই নির্মিত হয়ে যায়। শিশুর প্রথম ক্রন্দন থেকেই শুরু হয় তার আনন্দ-বেদনার অনুভূতির সঞ্চয়।

তার প্রতিবেশ—বাপ-মা, খুড়ো-জেঠা, খুড়ি-জেঠি, শিক্ষক-পুরোহিত—ক্রমাগত এবং বলতে গেলে, না-ভেবে না-চিন্তেই তার 'পশু-মস্তিষ্ক'-পরিগণককে মানবোচিত আচার-আচরণ, রীতি-নীতি দিয়ে পরিপোষণ করে চলেন। তাছাড়া তার ইন্দ্রিয়সমূহ যে সব আবিষ্কারের প্রতিবেদন মস্তিষ্কে পাঠায়, তাও সঞ্চিত হয় সেখানকার ক্ষুদ্রতম কোষনিচয়ে। ভবিষ্যৎ আচার-আচরণ, রীতি-নীতির প্রশ্নে মস্তিষ্কে প্রেরিত এই প্রতিবেদনসমূহই কাজে লাগে, যথা এটা না করলেই ভালো হয়, ওটা করতেই হবে, এটা বলতে পারো, কিন্তু ওটা নয়, এ কথা তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে, কিন্তু ওটা বিশ্বাস করা নিষিদ্ধ কর্ম, ইত্যাদি। কিম্বা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই রকম—এটা গরম, তোমার হাত পুড়ে যাচ্ছে, ওটা ঠাণ্ডা, তোমার হাত-পা জমে যাচ্ছে, গান কর, আনন্দ পাবে, ফুলটা শুঁকে দেখ, গন্ধটা মিষ্টি, ইত্যাদি।

আজ আমরা শিক্ষিত হয়েছি, ধর্ম-কর্মের শিক্ষাও পেয়েছি, তবু সেই আনন্দ আহরণের আকাঙ্ক্ষাটুকু আজো রয়েছে সবার ওপরে। ক্যাম্বেল তাই বলেন, আমাদের আদিপুরুষের মস্তিষ্ক-পরিগণককে একটি মাত্র আদেশ দেওয়া হয়েছিল, 'আনন্দ আহরণে তৎপর হও'। আনন্দের ধারণা ক্যাম্বেলের কাছে পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক। মস্তিষ্কের উচ্চতর স্তরে অবস্থিত আনন্দের এলাকাসমূহের বর্ধিত

উদ্দীপনাজাত অনুভূতিকে তিনি বলেন আনন্দ। এতদর্থে চিন্তা 'মস্তিষ্কের ভিতরে উপযুক্ত নির্দিষ্ট পথ নির্ধারিত করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ-চিন্তা দিয়ে তার মনকে তৈরী করে নেবার শক্তি দেয় ব্যক্তি-বিশেষকে'। ব্যক্তি তার আপন প্রয়োজনে কোন্ বস্তুকে 'আনন্দ' হিসেবে আহরণ করবে, তা নির্ভর করবে তার আপন আসক্তি এবং রুচির ওপর।

আধুনিক ভেষজবিজ্ঞান কর্তৃক জৈব-সন্তরণে প্রবর্তিত দর্শন এবং শ্রবণ সঙ্কেত এবং ক্যাম্বেল প্রদর্শিত, মনুষ্য-মস্তিষ্কে অনুক্রমিত আনন্দ আহরণের আকাঙ্ক্ষা থেকে, আমার মনে হয় দিব্যদর্শী ছেলেমেয়েদের (বয়স্কদেরও বটে) রেখে-যাওয়া বিবরণের ব্যাখ্যা মেলে। যে ছবি, যে মূর্তি তারা আশৈশব লালন করেছে মনের গভীরে, দিব্যদর্শন আসলে তাদেরই প্রকাশ। আর পাদ্রী এবং গুরুমহাশয়ের কাছে শেখা ব্রহ্মবিদ্যাগত অবোধ্য বাগাড়ম্বরের শিশুসংস্করণই, দিব্যদর্শনজাত 'বাণী'। শোনা এবং শেখা নীতিবাক্যকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা ভুল বোঝে, তাই আপন মনের মতন করে তারা শুধরে নেয়। ফল, অতিপ্রাকৃত ধারণা এবং ভবিষ্যৎ বাণীর জগাখিচুড়ি।

শিশু-মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন, খুব কমবয়সী ছেলেমেয়েরা দিব্যদর্শনকে বেশি উপভোগ করে। নরকের ভয়ে তারা ভীত, তারা জানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত যারা করেনি, সে নরকে তারা শাস্তি পাবে, সে নরক শোধনাগার। ছেলেরা শাস্তির ভয় পায়, নরক-যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে তাই তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাদের সরল আবেগ এবং বল্গাহীন শিশু-কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়ে তারা উদ্ভট ধারণা এবং কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন ধর্মীয় চরিত্রনিচয়ের মুখোমুখী হওয়া ছাড়া আর কিছু তারা চায় না। দিনের পর দিন কত গল্পে তারা শুনেছে, পূতপবিত্র কত চরিত্রের কথা, যাঁরা 'পবিত্র পরিবারের' মানুষদের দেখেছেন, পেয়েছেন সান্নিধ্য। যাজক

এবং শিক্ষক দিনের পর দিন শুনিয়েছেন সে সব গল্প। সে সব তো মিথ্যে হতে পারে না, ধর্মের কথা কি মিথ্যে হতে পারে? (সব মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতই জানেন, ভয়ঙ্কর বস্তুর গল্প শিশুমনে স্নায়বিক পীড়া উৎপন্ন করতে পারে।) উদ্ভট কল্পনা থেকে আকাঙ্ক্ষা জাগে, অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে আনন্দ পাবার। তারপর তারা হঠাৎ স্বপ্ন দেখে সজ্ঞানে, সত্যি স্বপ্ন। আশ্চর্য অদ্ভুত সত্য থাকে সে সব স্বপ্নে (যথা মূর্তি, প্রতীক এবং তাদের আপন ধর্মের কত কথা)। সত্য-স্বপ্নের বস্তুনিচয় অনেক আগেই নির্দেশিত হয়ে গেছে তাদের স্বপ্নাবিষ্ট মনে। তারপর হঠাৎ সে স্বপ্ন দেখা দেয় বাস্তব প্রত্যাদেশের আকারে জাগর-মনের পটে। চরিতার্থ হয় শিশুমনে, দিব্যদর্শন লাভের আনন্দ থেকে আনন্দ আহরণের আকাঙ্ক্ষা।

তাদের দিব্যদর্শনের আধ্যাত্মিক সত্যতা সম্পর্কে তর্ক করা অন্যায়। সন্তজীবনী লেখক ওয়ল্টার নিগের কামনা, সন্তগণ প্রত্যাবৃত হোন। যে আশা তিনি পোষণ করেন, তাও দিব্যদর্শনের 'প্রয়োজনীয়তা' সম্পর্কে আস্থাশীল। 'একথা অনস্বীকার্য যে তাঁদের কথা মানুষ আজ প্রায় ভুলে গেছে। হয় তাঁদের কথা আজ কদাচিৎ উচ্চারিত হয়, না হয়, আদপেই হয় না। কিন্তু এ নীরবতা স্থায়ী হবে না, হঠাৎ তাঁরা আবার একদিন মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন।' আনন্দ আহরণের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা গির্জেরও আছে, অলৌকিকের আনন্দ।

* * *

ধর্মীয় আনন্দ আহরণকে বাড়াবার উদ্দেশ্যে কিছু কৌশল গির্জের অনুষ্ঠানেও ঢোকানো হয়েছে। মার্কিন লেস্‌লি এম. লেক্রন (১৯) বলেছেন, ভিন্নাভিভাব জাগাবার পক্ষে প্রজ্বলিত দীপ-শিখা অত্যন্ত উপযুক্ত (ওরই নাম তো ভক্তি?)। দীপটিকে এমন জায়গায় রাখতে হবে, এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে, যাতে সেটি বেশ

দৃষ্টিসুখকর হয়। 'দীপের কম্পমান শিখার একটা সম্মোহক প্রভাব আছে।' পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাম্বেল প্রমাণ করেছেন যে বহু-কম্পাঙ্কের কারণে শ্বেত বর্ণ প্রগাঢ় আনন্দের অনুভূতি জাগায়। ক্লান্তিকর বৈচিত্র্যহীন পরিবেশে দীপশিখার উজ্জ্বলতা একটা বৈপরীত্য সৃষ্টি করে বলেই মনে আনন্দের উদয় হয়।

স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যাজকীয় পণ্ডিতকুল যখন বেদীমূলে খৃস্টের উপস্থিতি জ্ঞাপক অনির্বাণ দীপশিখা স্থাপন করেছিলেন, তখন তার স্বপক্ষে তাঁদের হাতে তত্ত্বমূলক কোন যুক্তি ছিল না। কিন্তু খৃস্টধর্মের দুহাজার বছরের ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, 'প্রভাব' সৃষ্টি করার পক্ষে দ্ব্যর্থহীন একটা সহজাত প্রবৃত্তি (একটা ষষ্ঠ অথবা সপ্তম ইন্দ্রিয়, বলতে পারেন) তাঁদের আছেই। বেশ কিছুকাল যাবৎ অবশ্য, অনির্বাণ শিখা আর গির্জের ভেতরেই বসে নেই, গির্জের বাইরের প্রবেশপথেও বসে থাকে, আপনি কিনবেন বলে। এমন একটি গির্জেও পাবেন না, যেখানে মাদোন্না অথবা সাধু-সন্তদের মূর্তির পাদমূলে অসংখ্য প্রদীপ না জ্বলে। তারা যে মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষিত পরমানন্দ জাগিয়ে তোলে।

তীর্থক্ষেত্রে প্রদীপের মেলায় যেন একটা রহস্যময়তারও সৃষ্টি হয়। প্রদীপশিখার সমুদ্র চোখকে যেন অলৌকিককে দেখবার উপযুক্ত করে তোলে। ছুটির দিনে প্রদীপ এবং মশালের মিছিল প্রায় সারা দিন চলে। আজকের মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের আলোয় দেখা যায়, দীপশিখা মানুষকে তার ব্যক্তিসত্তার উর্ধ্বে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, যে উর্ধ্বে অলৌকিকে বিশ্বাস স্থাপনের একটা সম্ভাবনা আজও বর্তমান।

*   *   *

মনস্তত্ত্বের অনন্তবিস্তৃত রাজ্যে প্রবেশ করবার ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু তার একটা এলাকায় একটু আলো ফেলতে

চাই, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব হয়তো সেখানে পেতে পারি। আমি মনোভিনয়ের (Psychodrama) সাহায্যে মনোরোগ চিকিৎসা-প্রণালীর কথা বলছি। আপন ব্যর্থতা থেকে, খেপামি থেকে মুক্তি পাবার কামনায় একদল রোগী তাদের সে-ব্যর্থতাকে, সে-খেপামিকে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করে, ধীরে ধীরে তাতে তাদের রোগ সেরে যায়।

অত্যাধুনিক এই চিকিৎসাপ্রণালীটির খবর মেলে, গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততলের (৩৮৪-৩২২ খৃঃ পূঃ) কালে। আরিস্ততল বুঝেছিলেন, কল্পনার কার্যকরী শক্তির বাস দেহের বাইরে নয়, ভেতরে। জন্ম এবং জীবনের নিয়ন্ত্রক প্রাণশক্তির যে ধারণা তিনি পেয়েছিলেন পদার্থবিদ্যা থেকে, তাকেই তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন তাঁর নীতি-দর্শনে। সে ধারণা অনুযায়ী, মন বস্তুসত্তাহীন শক্তি, তথা আদি সৃজকশক্তি। আরিস্ততল বলেছেন, বিয়োগান্ত নাটকের সিদ্ধি তার বিশোধনের ভেতর দিয়ে, সু এবং কু-এর নির্বাচনের মাধ্যমে, তারই ভেতর আছে নিরাময় শক্তি (সেই কি মনোভিনয় ?))।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উপাধ্যায় ডাঃ প্লোয়েগের (২০) বিয়োগান্ত নাটকের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'ইহার একান্ত অন্তর্নিহিত শর্ত, দর্শক নায়কের সহিত আপনাকে একাত্ম করিয়া ফেলিবেন। নায়কের কার্যাবলী তিনি মানিয়া লইবেন এবং সে কার্যাবলীর সহিত তাঁহার আপন আদর্শ এবং উদ্দেশ্যে অন্বয় সাধিত হইবে'। (অমন একাত্মতা সর্বতীর্থে পরিলক্ষিত হয়,—সে একাত্মতা তীর্থের অধিদেবতার সঙ্গে!) আরিস্ততলীয় অর্থে, সঙ্ঘাতের নাট্যরূপ যে-নিরাময় সাধন করে, তা আজকের প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে অনুশীলিত মনোভিনয়ের প্রায় অনুরূপ।

খৃস্টপূর্ব তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীর চৈনিক দর্শনে 'তাও' মতবাদ বিদ্যমান ছিল, তার অর্থ পথ। 'তাও' পৃথিবীর আদি কারণ,

তথা সমস্ত কারণের মূল, কিন্তু সে ছিল যুক্তিগ্রাহ্য উপলব্ধিবহির্ভূত। ‘তাও’ দর্শনে ‘ইন্’ এবং ‘ইয়াং’ (অন্ধকার এবং আলোক) পরা এবং অপরা-শক্তিবাচক। অধ্যাপক ইল্‌ৎসা ফাইথ (২১) তাঁর ‘চৈনিক ভেষজবিদ্যায় মনোরোগগত চিন্তা’ শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন, অন্যান্য সংস্কৃতির মত চীনাদের কল্পনায় কখনো ছিল না যে তাদের স্রষ্টা তাদের কাছে পূজা-অর্চনা দাবি করেছেন। সৃষ্টির আদিতে শাস্তিদাতা প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবতার রক্তচক্ষুভ্রূকুটির সামনে পড়তে হয়নি বলে চীনারা মন দিয়েছিল, আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে, আত্মীয়-বন্ধুর মত সদৃশমনা আত্মার যুতশক্তির মাঝে চেয়েছিল রোগ-নিরাময়ের কৌশল আয়ত্ত করতে। সে ক্ষেত্রেও যেখানে গোষ্ঠীমনের ঐকান্তিকতায় কোন নিরাময় সাধিত হয়েছে, সেখানেও নিরাময়কে তারা ভেবেছে অলৌকিক।

এগুলো মনোভিনয়ে উন্নীত হবার পথে মানসিক কার্যকারণের বিভিন্ন পর্যায়ের দৃষ্টান্ত (২২)।

এই সূত্রে স্বকপোলকল্পন (autogene) শিক্ষণেরও একটা প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। গটিঙ্গেনের স্নায়ুবিজ্ঞানী, য়োহান্নেস হাইনরিখ শুল্‌ৎস্ (১৮৮৪-১৯৭০) এই ধরনের আত্ম-সম্মোহনের ব্যবস্থা করেছিলেন, যার ফলে আভ্যন্তরিক কোন কারণে স্নায়ুতন্ত্র শিথিল হয়ে পড়ে। মন্দিরে ‘হত্যা’ দেওয়ার ভেতর যেন এর একটা ছাপ খুঁজে পাই। ‘হত্যার’ ভেতর ভগবৎ প্রকাশ ঘটে, তারপর ওষুধ পাওয়া যায় স্বপ্নে।

‘হত্যা’ দেবার সময়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে যায়। আগেকার দিনে হত্যা দেবার আগে স্নান করতে হত। (লুর্দ এবং অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রে সে-প্রথা আজো চালু!) ডাঃ ফন শুমান (২৩) বলছেন, সে সময়ে পেশীর শৈথিল্য এবং নিদ্রিত হওয়া (স্বকপোলকল্পন শিক্ষণের মত) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, তথা আপেক্ষিক হওয়া চাই, কারণ

তখেই অভিভাব্য এবং যাদু-দৈব নিরাময়ে বিশ্বাসী রোগগ্রস্ত সরল মানুষ আরোগ্য লাভ করতে পারে, মুক্ত হতে পারে আধি ব্যাধির কবল থেকে। আরোগ্যকামী মানুষ হত্যা দেবার সময় অনড় হয়ে পড়ে থেকে অপেক্ষা করছে, কখন দেবতা আস্ক্লীপিয়সের হাত থেকে তাঁর আশীর্বাদপূত ওষুধটি পড়বে। যদি ধরুন, আস্ক্লীপিয়সের জায়গায় বের্নাদেৎ সুবিরুর নাম বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে মনে হবে, ব্যাপারটা যেন লুর্দে ঘটছে।

সেকালের বিখ্যাত শহর এপিদাউরুস অবস্থিত ছিল সারোনিক উপসাগরের তীরে। সেখানকার মন্দিরে জাগ্রত দেবতা ছিলেন আস্ক্লীপিয়স। অবশ্য জাগ্রত দেবতা হিসেবে তিনি আরো অনেক মন্দিরে বিরাজ করেছেন। সে সব মন্দির ছিল ক্লিদস, কস্, পেরগামন সিকিয়ন, নাউপাক্তস আর আথেন্সে। তাছাড়া, অনেক ছোটখাটো মন্দিরেও তিনি বিরাজ করতেন এবং হেন রোগ নেই যার ইলাজ তিনি না বাতলাতেন। সে সব মন্দিরে যেতো অন্ধ-খঞ্জ-মূক, যেতো শোথ-বাত-ক্রিমির রোগী, চুল-ওঠার রোগীও বাদ যেতো না। কর্মব্যস্ত দেবতাটিকে আজকের দিনের তীর্থক্ষেত্রের সন্তদের মর্মর মূর্তির মত একের পর এক অলৌকিক নিরাময় দান করতে হত। রাবি বেন আকিবা বলতেন, 'এ সবই আগে হয়েছে……'।

গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণযুগের লুর্দ, এপিদাউরুসের মন্দিরে লেখা থাকতো, 'সৎ হয়ে প্রবেশ কর, বেরিয়ে এসো আরো সৎ হয়ে'। আরোগ্যকামী তীর্থযাত্রীর মিছিল শুরু হয় সে মন্দিরে ৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে। 'ধরনার' সময় প্রধান 'বৈদ্য' আস্ক্লীপিয়স ছাড়াও আরো অনেক 'করুণাপরবশ দেবতা' হত্যা-নিদ্রার ভেতর ওষুধ দিতেন।

কুৎ´ পোল্লাক (২৪) লিখেছেন, 'অলৌকিক নিরাময় লাভ করতো অন্ধ-খঞ্জ-বধির, নিরাময় লাভ হত অনিদ্রা এবং অন্যান্য রোগীর

কপালেও। "আজ ও-সব রোগকে বলি স্নায়ুরোগ, তার রোগীরা অক্রিয়ভাবে রুগ্ন"। দেববৈদ্য এমন সব রোগীকে সারিয়ে দিতেন পার্থিব বৈদ্যেরা যাদের কোন উপকারই করতে পারেননি···। আস্‌ক্লীপিয়সের পুরোহিতকুল নিখুঁতভাবে মানব-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন এবং জেনেছেন, কেমন করে রোগীর ওপরে মানসিক প্রভাব বিস্তার করতে হয়। অথবা, তাঁরা জানুন, বা না জানুন এ কথা সত্যি যে তাঁরা মনোরোগ চিকিৎসকদের পূর্বসূরী'। এমন অলৌকিক নিরাময় সম্পর্কে কারুর কিছু বলবার আছে? খৃষ্টধর্ম জানে তার ইতিহাস।

মানসিক রোগ চিকিৎসায় সঙ্গীতের প্রভাবের কথা খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পিথাগোরাসপন্থীদেরও জানা ছিল বেশ ভাল করেই। সিরীয় দার্শনিক ইয়াম্‌ব্লিকাস বলেছেন,—

> পিথাগোরাসপন্থীরা সঙ্গীতকে রোগনিরাময়ের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিত। মনোরোগে হতাশা এবং উদ্বেগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত বিশেষ বিশেষ সুর, ভিন্নতর সুর ব্যবহৃত হইত, উগ্রতর রোগলক্ষণে। মানসিক রোগের সর্ব পর্যায়েই ব্যবহৃত হইত নানাতরো সুরলহরী। কোন্ সুরে, কোন্ ছন্দে মানসিক অবস্থার উন্নতি হয়, মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়া আসে স্বাভাবিক অবস্থায়, তাহারই কার্য-কারণ সম্পর্ক হইতে পিথাগোরাস আবিষ্কার করিয়াছিলেন, দেহ এবং মনের রোগের উপশম এবং নিরাময়পদ্ধতি।

দুটো ছবিতে কী অদ্ভুত মিল!

যে অলৌকিক-কর্ম আজ সাধু-সন্তরা এবং তাঁদের সাকরেদবর্গ সম্পাদন করেন, সেই অলৌকিক কাণ্ড করতেন এপিদাউরুসে আস্‌ক্লীপিয়স এবং তাঁর শিষ্যবর্গ, প্রায় একই ভাবে, একই পদ্ধতিতে। শুধু তাই নয়, কোন খৃস্টানকরস্পর্শ ব্যতীতই সে-অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন হত!

আজো প্রমাণসম্ভব বলেই বলছি, দেবতার প্রসাদ পেয়ে সেকালেও লোকে দেবতার উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে। এসিয়া মাইনরের ম্যাগনেশিয়া থেকে গ্রীক লেখক, পাউসানিয়াস দেখতে এসেছেন এপিদাউরুসের ধ্বংসাবশেষ ১৬৫ খৃস্টাব্দে। তাঁর 'পেরিয়েগেসিস্ তেস্ হেল্লাদোস' গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে লিখেছেন,—

> তীর্থস্থানে ইদানীং যত উৎসর্গ-ফলক দৃষ্ট হয়, পূর্বকালে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত। আজ ওই স্থানে ছয়টি মাত্র ফলক পড়িয়া আছে। উক্ত ফলকগুলির উপরে লিখিত আছে, আস্ক্লীপিয়সের কৃপায় আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগী অথবা রোগিণীর নাম, কোন্ রোগে তাহারা আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার কথা এবং কেমনভাবে তাহারা আরোগ্য লাভ করিল, তাহার বর্ণনা। ফলকগুলি লিখিত ছিল ডোরিস প্রদেশের ভাষায়।

১৯২৮ সালে এপিদাউরুস খনন কালে সেই ছটি ফলক পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলোতে লেখা ছিল,—

> আথেন্‌সের আম্ব্রোসিয়া, এক চক্ষুবিশিষ্টা। দেবতার কৃপা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে মনে মনে হাসিয়াছিল,—স্বপ্নে কি কোন অন্ধ, খঞ্জ নিরাময় লাভ করিতে পারে? নিরাময় কক্ষে নিদ্রিত হইবার পরে সে সুস্থ হইয়া বাহিরে আসিয়াছে।
>
> ইউহিপ্পসের চিবুকের ভিতর বর্শাফলকের একটি অংশ ছয় বৎসরকাল বিদ্ধ হইয়াছিল। নিরাময়-কক্ষে শয়নের পরদিবস যখন বাহিরে আসিল, তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বর্শাফলকের অংশটি তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্তে ধৃত ছিল।
>
> লাম্পসাকসের হের্মোদিকস, পঙ্গু। নিরাময়-কক্ষে নিদ্রাকালে আস্ক্লীপিয়স তাকে সুস্থ করে আদেশ করেন

মন্দিরের বাহিরের পথ হইতে সর্ববৃহৎ প্রস্তরখণ্ডটি উত্তোলন করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে আনয়ন করিতে। মন্দিরসম্মুখে যে প্রস্তরখণ্ডটি রহিয়াছে, উহাই সে বহন করিয়া আনিয়াছিল।

হালিয়েইসের আলকেতাস। সে অন্ধ ছিল। নিরাময়-কক্ষে সে নিদ্রিত হইল। পরদিবস প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিল সে চক্ষুষ্মান।

লাকোনিয়ার আরাতে, শোথরোগী। তাহার পরিবর্তে তাহার মাতা নিরাময়-কক্ষে শয়ন করিয়াছিল। সেই সময় সে ছিল লাসেদায়মনে, তথায় সে একটি স্বপ্ন প্রাপ্ত হইল। মাতা গৃহে ফিরিয়া দেখিল কন্যা রোগমুক্ত হইয়াছে। মাতাও অনুরূপ স্বপ্ন পাইয়াছিল।

হালিয়েইসের আরিস্তক্রিতস্। সমুদ্রে সন্তরণ করিতে করিতে ডুব দিয়া এমন স্থানে উপস্থিত হইল, যে স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। তাহার পিতা তাহাকে কোথাও না পাইয়া আস্‌ক্লীপিয়সের নিরাময়-কক্ষে শয়ন করিল।…কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সপ্ত দিবস পরে সে পুত্রকে ফিরিয়া পাইল।

খৃস্টজন্মের পাঁচশো বছর আগে যারা অলৌকিক নিরাময় লাভ করেছিল, তাদের সঙ্গে, ইদানীং কালে অনুরূপ ভাবে নিরাময় প্রাপ্তদের কোন তফাত নেই, তফাত নেই অলৌকিক ব্যাপারেও, অবশ্য খৃস্টধর্মের মাতব্বরেরা সে কথা শুনতে রাজী নন।

প্রাক্-খৃস্টান অলৌকিক নিরাময়ের সাক্ষী একা দেবতা আস্‌ক্লীপিয়সই নন, তাঁর সঙ্গে আছেন আরো অনেক সুবিখ্যাত দেবতা। লোকে ভুলে যায়, আপোল্লো শুধু যৌবন, কাব্য এবং সঙ্গীতের দেবতা নন, তিনি নিরাময় এবং ভবিষ্যদ্বাণীরও দেবতা… আর, সর্বোপরি তিনি আস্‌ক্লীপয়সের পুত্র। অতএব বাপের কারবারে

ছেলের দক্ষতা যে অল্প-বিস্তর থাকবে, এ আর বেশি কথা কি! রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে আপোল্লো ছিলেন এক পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবতা। দেলফির পবিত্র স্থানে তাঁর নামে এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, খৃস্টজন্মের আটশো বছর আগে। স্বভাবতঃই সেখানে অলৌকিক কাণ্ড ঘটতো। সেখানে মূক হত বাচাল, পাথরি নিষ্ক্রান্ত হত 'গবিনী' (ureter) পথে, বোধাতীত অথচ স্বাভাবিক ভাবে। টাকভরা মাথা নিয়ে গ্রীকরা এসে প্রার্থনা করতো, তাদের মাথা ভরা চুল হোক, তারপরেই তাদের টাক ভরে গজাতো ঘন কালো গোছা গোছা চুল (২৫)। (এক ওস্তাদ ফাটকাবাজ, আমায় বলেছিলেন, বোনার কাঁটা আর জিপ-ফাস্‌নার আবিষ্কৃত হওয়ার পর আর একটি মাত্র জিনিস বাকি আছে আবিষ্কৃত হতে, যা মানুষকে কোটিপতি করে দিতে পারে, সে বস্তু, একটি অব্যর্থ কেশোৎপাদক। কিন্তু হায়, আস্‌ক্লীপিয়স এবং আপোল্লোর উদ্দেশে প্রার্থনাবাণীকে কেউ অলৌকিক কান্তিবর্ধক হিসেবে বিক্রি করতে পারে, এমন বুকনিবাজ, চোখা ব্যাপারীর খবর তো জানি না!)

মিসরের মৃতের শহর থীবিসে নিরাময়ের দেবতা আম্‌ফিরাওসের পূজো করা হত। মেম্‌ফিসে প্‌তাহ্‌-এর মন্দিরে উৎসর্গ-ফলক পাওয়া গেছে, আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীরা দেবতার উদ্দেশে তাতে শ্রদ্ধা অর্পণ করেছে। আপন কৃতজ্ঞতাকে চিরস্থায়ী করতে পাথরে খোদাই করে রেখেছে হাত, পা, নানা অঙ্গ। মেম্‌ফিসে প্‌তাহ্‌ দেবতার পাশে ৩৭৫টা কান খোদাই করে রেখেছে (২৬)। সেখানে নিশ্চয় কর্ণবিজ্ঞানের হাসপাতাল চালু ছিল, অলৌকিক কাণ্ড-কারখানাও নিশ্চয় চলতো জবররকম!

* * *

তীর্থক্ষেত্রে নিরাময়ের ব্যাপারে সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে

সর্বত্র! এ যেন মনোভিনয়ের আগের সংস্করণ। সমষ্টিগত চিকিৎসা সম্পর্কে ডাঃ সামুয়েল ভার্নার (২৭) বলেছেন,—

> সমষ্টিগত চিকিৎসা প্রায় ক্ষেত্রেই বিশেষ ফলপ্রসূ, কারণ এ ক্ষেত্রে পরস্পরের ত্রুটিগুলো সহজে চেনা যায়, যেন পারস্পরিক ভাববিনিময়ের কালে এক হাত দিয়ে অপর হাত ধোওয়া!…এ চিকিৎসা যে শুধু বুদ্ধিগত অভিজ্ঞতা, তা নয়, তার সঙ্গে মানুষের আবেগ অনুভূতিও বিজড়িত। আবেগের অনুভূতি থেকেই যে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে আর সে অভিজ্ঞতার কারণ নিহিত রয়েছে দেহাভ্যন্তরের নানা গ্রন্থি এবং দৈহিক অন্যান্য সম্পূরক লক্ষণের বিক্রিয়ার মধ্যে। ব্যক্তিত্বের একটা মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে হলে, এ চিকিৎসাকে তীব্র, পুনরাবৃত্ত এবং অবিরাম আবেগ-অনুভূতির অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, যাতে ব্যক্তিত্বের অনুভূতির জগৎ পুনঃপ্রভাবিত হয় এবং পরিবর্তিত হয়।

একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ইশারা বিজড়িত এ ধরনের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার আভাষ আমি দেখেছি প্রায় সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে। অলৌকিক একটা কিছু ঘটার কামনা—আবেগ-অনুভূতির এ একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা—সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর থেকে জেগে ওঠে। সে কামনা যে-কোন বাধা-নিষেধকেও দমন করে, চিৎকার করে কাঁদবার নিষেধও ভুলিয়ে দেয়। সাধারণভাবে যে মানুষ অন্তর্বৃত, তারও ব্যক্তিত্বের রূপান্তর ঘটে যায়, সাধারণ্যের আবেগ-অনুভূতির স্রোতে সে ভাসিয়ে দেয় আপনাকে। আশা-আকাঙ্ক্ষার লক্ষে পৌঁছে, রোগক্লিষ্ট জনতার কাতারে তার আপন রোগের যন্ত্রণার অনুভূতিরও ঘটে পরিবর্তন। ভাবটা যেন এখানেও যদি না সারে তো আর সারবে না! তীর্থক্ষেত্রের আশামাখা

আনন্দঘন পরিবেশ এমনি অদ্ভুত জায়গা যে আপাত অবিশ্বাস্যও সেখানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য বাস্তব হয়ে ওঠে।

*　　　*　　　*

এই প্রসঙ্গে প্রাণীজ চুম্বকত্ব সম্পর্কে দুটো কথা বলবো। সে চুম্বকত্বের অনুশীলন করেছিলেন ডাঃ ফ্রান্‌ৎস্‌ আন্তন মেস্‌মের (১৭৩৪-১৮১৫)। মেস্‌মের নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতেন রোগীর চোখে, তারপর তার গায়ে হাত রেখে তার দেহ থেকে বিকিরিত শক্তিকে ব্যবহার করতেন সম্মোহক নিরাময় রূপে। শুধু গা ছুঁয়ে রোগ নিরাময় করতেন এমন পঁয়ত্রিশটি লোককে খৃস্টধর্ম সন্তত্বে উন্নীত করেছেন। ইংরেজ শল্যচিকিৎসক জেম্‌স্‌ ব্রেড (১৭৯৫-১৮৬০) বুঝেছিলেন, এ ধরনের নিরাময়ে গূঢ়তত্ত্বগত ভেল্কি কিছু নেই। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন সংবেশন। ইউরোপে মেসমেরিজম্‌ একটা যন্ত্রণা বিশেষ হয়ে উঠেছিল, যার নিরাময়কারী চুম্বকশক্তি ছিল না, সেও মোটা ব্যবসা চালিয়েছিল।

১৭৮৪ সালের একটা প্রতিবেদনে (২৮) দেখতে পাই, সমষ্টিগত অভিভাবন এবং সংবেশন অলৌকিক নিরাময় সংঘটনে কী রকম সম্ভব ছিল।

পুইসেগুরের মার্কুইস তাঁর সোয়াসনের নিকটবর্তী প্রাসাদকে 'চৌম্বক স্বাস্থ্যনিবাসে' রূপান্তরিত করেছিলেন। মেস্‌মের পদ্ধতির গোঁড়া ভক্ত, তিনি নিরাময়-সন্ধানী মানুষদের আশ্রয় দিতেন। রোগীর সংখ্যা প্রকাণ্ড, প্রাসাদের অগণিত ঘর রোগীর ভিড়ে উপচে পড়তো। কিন্তু উপায় কি? মার্কুইসের মাথায় একটা চমৎকার মতলব খেলে গেল। গ্রামের একটি ঋজু, সুন্দর দেবদারু গাছকে তিনি চুম্বকিত করলেন। রাইনের দুধার থেকে রোগযন্ত্রণায় কাতর মানুষ চুম্বকিত সেই গাছের কাছে ভিড় করতে লাগলো, যেন সে কোন অলৌকিক-কর্মা পবিত্র দেবতা।

টীকা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অলৌকিক নিরাময়ের জন্যে পীরের দরগা কিম্বা বাবার থানের দরকার হয় না। লোকের বিশ্বাস যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ বুড়ো দেবদারুই যথেষ্ট।

খৃস্টধর্মের স্বীকৃতি থাক আর নাই থাক, অলৌকিক নিরাময়ের ব্যাপারে সংবেশন এবং অভিভাবন সব সময়ে বর্তমান। অভিভাবন কথাটাকে আরো পরিষ্কার করে বললে দাঁড়ায়, চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তির সম্মিলিত প্রভাব। 'তা থেকেই জাগে বিশ্বাসের সহজ, নির্দোষ স্বীকৃতি, তথা আচরণের মান এবং ধরনের অভিভাবন।' আবেগপ্রসূত সহানুভূতির ক্ষেত্রে 'মানুষ তার অজান্তে আপন হৃদয় উন্মুক্ত করে ফেলে, বিস্ময়কর রূপ এবং ধারণার কাছে।...সমষ্টিগত পরিবেশ এবং অনুভূতির তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার একটা শক্তি-প্রদায়ী ক্ষমতা আছে।...স্বাভিভাব হল, আবেগপ্রবণ আশা এবং কল্পনার সাহায্যে আত্ম-প্রভাবন।' সংবেশনের ক্ষমতা কতখানি? 'মায়া এবং অধ্যাসকে সহজেই সক্রিয় করে তুলতে পারে সংবেশন। উন্মুক্ত করতে পারে স্মৃতির বদ্ধ দ্বার। অন্তরে প্রস্তুতি থাকলে বেশির ভাগ মানুষকেই সংবেশিত করা সম্ভব।'

এ সংজ্ঞা, তীর্থক্ষেত্রে আগত তীর্থযাত্রীর রোগনিদানগত। কিন্তু, এ ব্যাপারে খৃস্টধর্মের কী বক্তব্য?

খৃস্টধর্মের দাবি, নিরপেক্ষ পরীক্ষকের কাছে অলৌকিক ঘটনাকে স্বীকৃতি পেতে হবে (২৯)। কম করে বললেও বলতে হয়, এ দাবি অমূলক।

*　　　*　　　*

অলৌকিক নিরাময়ের ঘটনা চলে আসছে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে। অধ্যাপক ডি. লাঙ্গেন (৩০) লিখছেন,—

> মনোরোগ চিকিৎসায় সংবেশনের ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন। ওঝারাও যেমন এ পদ্ধতির সদ্ব্যবহার করেছে,

> সুসভ্য মিসর, গ্রীস, রোমও এ পদ্ধতির প্রয়োগে কিছু কম যায়নি।...এ চিকিৎসার ধারা বিলুপ্ত হয়েছিল মধ্যযুগে।...ফ্রানৎস আন্তন মেসমের নতুন করে শুরু করেন সংবেশনের অভিভাব তত্ত্ব। তার পর থেকে এ পদ্ধতি আজো প্রচলিত। এ-পদ্ধতিতে চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করা হয় একটি বিন্দুতে, যাতে চেতনার অতি-জাগর অবস্থার সঙ্গে অবচেতন অবস্থার একটা সংস্পর্শ ঘটে। সেই অবস্থার ভেতর চিন্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় একটি বিশেষ বিন্দুতে, অথবা বহু-ধারণার জটিলতার ভেতরে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান করতে।...ধ্যানও ওই একই বস্তু, চেতনার অর্ধ-জাগর অবস্থায় চিন্তাকে একটি মাত্র বিন্দুতে স্থির করা।

বারো হাজার সাধু-মহাত্মার দোহাই, তীর্থস্থানে সমাগত সমস্ত মানুষই কি একটি মাত্র বিন্দুতে, তথা দেবতার মূর্তির ওপর আপনাপন চিন্তা নিবদ্ধ করে না? স্বাভিভাবের সাহায্যে কেমন করে তারা সংবেশ-সমাধি দশা প্রাপ্ত হয়? আপন অস্থি-মজ্জায় কি বুঝতে পারেন না, আপনার চেতনার সাধারণ স্তরটি নাবতে নাবতে মনের এক অতি-সক্রিয় অবস্থায় পৌঁছে অলৌকিকের সংঘটন-সম্ভাবনায় নিবিষ্ট হয়ে যায়? প্রায় সমস্ত তীর্থযাত্রী শুরু থেকেই সমষ্টিগত অভিভাবের 'চৌম্বক ক্ষেত্রের' আওতায় গিয়ে পড়ে, কেউ যদি তার বাইরে থেকে যায়, সেও শেষ পর্যন্ত অন্যের চেতনার ফল্গু স্রোতে ভেসে যায়। 'সমষ্টিগত আনন্দ-বেদনার ওপর ব্যষ্টির একটা অব্যবহিত প্রভাব আছে' (৩১)।

এ সব দানিকেন মশায়ের অনুমান নয়, কল্পনাও নয়, এ সবই পণ্ডিত চিকিৎসকদের গবেষণালব্ধ, যুক্তিসিদ্ধ, তথ্যভিত্তিক প্রমাণ। ...এ কথা সত্যি, খৃস্টধর্মও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা মানেন, কিন্তু কোন্

নিরাময়টি 'বিশুদ্ধ' অলৌকিক এবং দৈব-পরিবারের দিব্যদর্শনপ্রসূত, তার বিচার তাঁরা রেখে দেন তাঁদের আপন হাতে।

* * * .

যোগানন্দ পরমহংস আমাদের কালের একজন সুবিখ্যাত যোগী। পৃথিবীব্যাপী 'আত্মোপলব্ধি সঙ্ঘ' তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯১৭ সালে। তাঁর মূল বক্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত।—

> যে স্বাবলম্বী তারই হাত ভগবান ভরে দেন। তিনি তোমাকে ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, একাগ্র হবার শক্তি দিয়েছেন, দিয়েছেন বিশ্বাস, যুক্তি এবং সুস্থ, স্বাভাবিক সহজবুদ্ধি যাতে আপন দেহমনের যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করতে পারো অন্যের সাহায্য ছাড়াই। তাঁর কাছে হাত নিশ্চয়ই পাতবে, কিন্তু সেই সঙ্গে আপন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতেও কার্পণ্য কর না। যখন প্রার্থনা কর, অথবা 'হত্যা' দাও, তখন সারাক্ষণ মনে মনে বলবে, 'তাঁর ইচ্ছা, তাঁর দেওয়া ক্ষমতার প্রয়োগে আমার যন্ত্রণার উপশম হোক'। তোমার শক্তি তাঁরই দান, তবু তিনি চান, তুমি নিজে তার প্রয়োগ কর।

যোগানন্দ মনস্তত্ত্বের খবরও জানতেন নিখুঁত করে,—

> কবে আমাদের যন্ত্রণার উপশম হবে, সে খবর আগে থেকে জানবার উপায় আমাদের হাতে নেই, তাই অমুক দিন সারবে বলেও ধরে নেবো না। সময় নয়, 'বিশ্বাসই' স্থির করবে, কবে আমি আরোগ্য লাভ করবো। পরিণাম নির্ভর করে প্রাণশক্তিকে সম্যকরূপে জাগরিত করার উপর এবং ব্যক্তিবিশেষের চেতন-অচেতনের স্বাভাবিক প্রবণতার উপর।

যোগানন্দের অন্তর্দৃষ্টি সম্পূর্ণ অখৃষ্টীয় ধর্মজাত এক অলৌকিক

নিরাময়ের অন্তঃস্তলে পৌঁছে দেয়। সে-অলৌকিক নিরাময় স্বাভিভাবের প্রাণশক্তির ক্রিয়া বৈ আর কিছু নয়। তাঁর কাছে পবিত্রবারি, ক্যাথলিক পাদ্রীর কাছে বিবাহের আনন্দের মতই অস্পৃশ্য। নানা স্থানের দিব্যদর্শন এবং অলৌকিক সঙ্ঘটন সম্পর্কে যোগানন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছে একটু আভাষ দিয়েছেন,—

> ভুলো না, নিরাময়ের কথাটি বেশ জোর দিয়ে বলতে হবে। প্রথমে বেশ জোরে তারপর ধীরে ধীরে স্বর নামাতে নামাতে বলতে হবে, প্রায় নিঃস্বর উচ্চারণে। আর সেই সঙ্গে দরকার একাগ্র মনোনিবেশ। এমনি করে তোমার চিন্তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, দেহের গণ্ডি থেকে চেতনায়,···চেতন থেকে অবচেতনে—স্বয়ংক্রিয় মননে। সে চিন্তার সত্যতায় তোমার নিষ্ঠা যেন অবিচল থাকে। যার বিশ্বাস আছে, এ পদ্ধতিতে সে-ই আরোগ্য লাভে সমর্থ।

যোগানন্দ কখনো লুর্দ কিম্বা ফতিমা কিম্বা দিব্যদর্শনধন্য অন্য কোন তীর্থে গেছেন বলে শুনিনি। ওসব জায়গায় তাঁর যাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না, তবু সে সব জায়গার পদ্ধতি এবং তাঁর পদ্ধতিতে তফাত নেই। ওখানে বিরাট ফাঁকায় কাতারে কাতারে মানুষ জড়ো হয়ে চিৎকার করে ভজন গায়, তারপর ঠাকুরের কাছে পৌঁছোতে পৌঁছোতে সে চিৎকার পরিণত হয় গুঞ্জনে। তখন তাদের মন লক্ষ্যের পানে একাগ্র, তখন তাদের কামনা ধাবিত হয় 'ইন্দ্রিয় থেকে চেতনায়', আলাপ পর্যবসিত হয় প্রায়-নিঃস্বর কানাকানিতে, ভজন পরিণত হয় গুঞ্জরণে। 'বিশ্বাস' তখন পূর্ণজাগ্রত, একাগ্র।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস নিরাময়ের পথে কাজ করে, তীর্থক্ষেত্রে সেই বিশ্বাসই অলৌকিকে বিশ্বাসী করে তোলে। বাস্তবিক পক্ষে, অবচেতন অথবা স্বয়ংক্রিয় মনন মস্তিষ্কে তাড়িত-

রাসায়নিক ক্রিয়ার সূচনা করে। 'স্নায়ুর কম্পন যখন···মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, তখন তারা সেখানে নানা রাসায়নিক বিকিরণের পত্তন করে' (ক্যাম্বেল)।

নতুন কোন ওষুধের নিদানিক পরীক্ষায় বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে, কোন ওষুধের নিরাময় শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস থাকলে রোগ সারে। রোগীদের দুটো দলে ভাগ করে নেওয়া হয়। একদলকে দেওয়া হয় নতুন ওষুধ আর একদলকে দেওয়া হয়, ডাক্তারী ভাষায় যাকে বলে 'ফাঁকি' (নতুন ওষুদের একটা নির্দোষ এবং অবিকল নকল, সাধারণতঃ, চিনির তবক মোড়া, একই রঙের এবং গন্ধের একই মাপের বড়ি)। লেসলি এম· লেক্রন সে পরীক্ষার ফলের বর্ণনা দিয়েছেন, 'দেখা গেছে, যে দলকে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, তাদের বেশির ভাগই প্রথম দলের মত একই ভাবে আরোগ্য লাভ করেছে। ওষুধের এ প্রভাবকে অভিভাব বলা যেতে পারে।

নিরাময়ের ক্ষেত্রে যোগানন্দ যাকে বলেছেন, বিশ্বাস, ইচ্ছাশক্তি এবং একাগ্রতা, চিকিৎসকেরা তাকেই ডেকেছেন তার আসল নামে, সে-নাম, অভিভাব।

খৃস্টানদের অলৌকিকের গপ্পোর ধারে-কাছে যোগী অথবা ডাক্তার ঘেঁষেন না, তবে তাঁরা জানেন, কেমন করে 'অলৌকিক' ঘটে।

*　　　*　　　*

একগুঁয়েমি, তথা আংশিক অন্ধতাকে আমি বুঝতে পারি না। যে 'অলৌকিকের' কথা সাড়ে চারশো বছর ধরে চলে আসছে, ব্রহ্মবাদীরা সে সম্পর্কে আজো কিছু বলেননি।

থিওফ্রেটাস বম্বাস্টাস ফন হোহেনহাইম (১৪৯৪-১৫৪১), পারাসেল্‌সাস্‌ নামে যিনি পরিচিত। তিনি এক নব-নিদান শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনে এবং পীড়ার ক্ষেত্রে 'আত্মাকে' তিনি সর্বাগ্রগণ্য বলে ধরে নিয়েছিলেন ('আত্মার' পরিবর্তে

আজ আমরা ব্যবহার করি, 'মন')। মনের সঙ্গে আরোগ্যতত্ত্বের যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে, এ কথা কেউ আগে ভেবে দেখেননি। তিনিই প্রথম স্নায়বিক এবং মানসিক বিকার সমূহকে রোগতত্ত্বের গণ্ডির ভেতর নিয়ে এসেছিলেন। পারাসেলসাসের মতে, নিরাময় হল প্রাণশক্তির ক্রিয়া এবং বাঁচবার কামনা। তাঁর Imaginatio গ্রন্থ থেকে নিচের এই উদ্ধৃতি হতে বোঝা যাবে, তাঁর চিন্তা কত আধুনিক।—

> মানুষ কল্পনাপ্রবণ এবং কল্পনা যদিও অদৃশ্য এবং ধারণাতীত, তবু দেহাভ্যন্তরে তার ক্রিয়া বাস্তবানুগ।
>
> কল্পনা যেমন রোগের—অত্যন্ত কঠিন রোগের কারণ হতে পারে, তেমনি স্বাস্থ্য এবং সুখেরও কারণ হতে পারে।
>
> এ থেকেই বোঝা যায়, প্রকৃতির চেয়ে কল্পনা বড় এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে কল্পনা। কল্পনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিনিচয়কে অপসারিত করে, তাই সে স্বর্গীয় প্রকৃতিকেও জানে না, পার্থিব প্রকৃতিকেও চেনে না।
>
> এ থেকে আরো বোঝা যায় যে চিকিৎসকের পক্ষে অনেকখানিই অসম্ভব এবং কল্পনা যত শক্তিশালী, বৈদ্যের প্রভাব তত ক্ষীণ।
>
> এই কারণে কল্পনার উপরে বিশ্বাসের কারণে বহু লোক যেমন সুস্থ হয়ে উঠে, বহু লোক তেমনি রোগেও পড়ে।
>
> এই কল্পনা থেকেই আসে সাধু-সন্তদের অলৌকিক ক্রিয়ায় এবং ঔষধে বিশ্বাস…সেই বিশ্বাসই তাদের আরোগ্য দান করে, কিন্তু আরোগ্যের কারণ তারা আরোপ করে সাধু-সন্তদের উপরে এবং অলৌকিকের ওপরে… যদিও এ সবই কল্পনার উপরে বিশ্বাসের ফল।

> বিশ্বাস সম্পর্কে ঠিক-বেঠিকের প্রশ্ন নির্ভর করে শুধুমাত্র কল্পনার দৃঢ়তার উপর।
>
> যদি কোন ভণ্ড সাধু মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে (এবং সে সাধু যদি আপনাকে মনে করে দৈবশক্তিসম্পন্ন, পবিত্র) এবং বলে নিরাময়ের কৃতিত্ব তারই, তবুও বুঝতে হবে সে-নিরাময় সাধুর হাত থেকে আসেনি, এসেছে রোগীর বিশ্বাসের দৃঢ়তা থেকে।

এত কাল যার ব্যাখ্যা মেলা ভার ছিল, আরিস্ততল, জন লক, ডেভিড হিউম এবং কার্ল য়ুঙের মত পণ্ডিতদের বক্তব্যের সার থেকে আজ তাদের ব্যাখ্যা মেলে। ওই সব পণ্ডিত এবং তাঁদের শিষ্যবর্গের সঙ্গে আমরা পরিচিত নই, তবু তাঁদের সীমাহীন জ্ঞান আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পাথেয়।

*　　*　　*

ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্যে রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক সর্বজনবিদিত পবিত্র নাম, "ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত্রী এবং খৃস্ট-বিজ্ঞানসমাজের জন্মদাত্রী শ্রীমতী মেরী বেকার, তথা 'মা মেরী'। নিউ হ্যাম্পশিয়ারের এই কৃষক কন্যা, 'মা মেরীর' জন্ম ১৮২১ সালের ১৬ই জুলাই, আমেরিকার বোস্টন শহরে।

ছোটবেলা থেকেই মেরীর একটা রোগ ছিল, মৃগীরোগীর মত কাঁপা। কিছুক্ষণ কাঁপুনি চলার পর যখন শান্ত হতেন, তখন কিন্তু এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতো,—তাঁর সারা মুখে এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি ফুটে উঠতো। অসুস্থতার পরে কোথায় শ্রান্ত হয়ে পড়বেন, তার পরিবর্তে অপূর্ব এক দিব্যজ্যোতিতে মুখখানি তাঁর উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো, মনে হত তিনি যেন আর এক জগতে বিচরণ করছেন, কথা বলছেন অন্য কোন জগৎ থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারবাদী

মানুষের কাছে ব্যাপারটা ক্রমশঃ আশ্চর্যজনক এবং তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হতে লাগলো। বেকার পরিবারের এই সপ্তম গর্ভের শিশুটিকে কেউ কেউ দেবযোনিসম্ভূতও বললেন। ছোট্ট মেরী ইতিমধ্যেই বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁর পাকা পাকা কথায়। স্বজন প্রতিবেশীদের সমালোচনা-সমবেদনা-উপদেশ-নির্দেশের জবাবে বাপ-মায়েরা কেউ কিছু বলার আগে নিজেই বলে বসতেন, 'তোমরা কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে ভগবানের দয়ায়। ওষুধ-বিষুধ খেয়ে কী হবে? আমি তো ভালোই আছি। কই কিছু তো হয়নি…'। বিব্রত বেকার পরিবার বহু ডাক্তার-বদ্যি করলেন, কিন্তু সব বৃথা, মেরীর 'রোগ' দিন দিন বেড়েই চললো। মেরীর কাছে কিন্তু দৈহিক যন্ত্রণা 'সম্যক্ শিক্ষার' মাধ্যম বলে পরিগণিত হল। ডাক্তাররা বিফল হয়ে তাঁকে মনোরোগগ্রস্ত বলে দায় সারলেন। এমনি করে পুরো বাইশটা বছর কেটে গেল। তারপর যেন একটু আলো দেখা গেল। ওয়শিংটন গ্লোভার নামে কৃতবিদ্য এক ব্যবসায়ী বাইশ বছরের ওই অপূর্ব সুন্দরী মৃগী রোগীকে বিয়ে করলেন। কিন্তু দু'বছর কাটলো না; গ্লোভার মারা গেলেন পীতজ্বরে। সংসারে ব্যাপৃত মেরীর দুটো বছর কোন রোগ বালাই ছিল না, কিন্তু বিধবা হবার পর আবার যে কে সেই। অসুস্থ মেরীকে একা রাখা নিরাপদ নয় বুঝে ছোটবোন অ্যাবিগেল আবার তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর হাবে, ভাবে, চেহারায়, কথায়, বার্তায়, আচারে, আচরণে, সবাই একটা অলৌকিক ভাবের প্রকাশ দেখতে পেলেন। সবারই মনে হল, মেরী বুঝি এবার সন্ন্যাস নেবেন। 'পবিত্র মেরী' বলে তাঁর নামে রটে গেল।

এখন অনেকেই তাঁর কাছে আসে তাদের সমস্যা নিয়ে, অসুখ-বিসুখের কথা নিয়ে। তিনি মিষ্টি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'অত ভাবছো কেন? কোথায় তোমার সমস্যা, রোগই বা কোথায়?

ভাবলেই ও সব আসে। মন থেকে ও সব চিন্তা ঝেড়ে ফেল, দেখবে কোথাও কিছু নেই'। ওই প্রচণ্ড শক্তিশালী নির্দেশ শ্রোতার মনে এক অদ্ভুত স্বাভিভাবের কাজ করতো। আশ্চর্য্য তাদের সমস্যা, তাদের রোগ দূর হয়ে যেতো অল্প দিনেই, জীবন তাদের আনন্দের হয়ে উঠতো, কাজে-কর্মে স্পৃহা ফিরে পেতো।

একবার এক রোগীর অভিভাবকেরা ডাক্তারী চিকিৎসায় বিফল হয়ে ঝাড়-ফুঁকের জন্যে এক বিখ্যাত গুণিন, প্যাটার্সনকে নিয়ে এলো। গুণিনও বিফল-প্রায়, তখন 'পবিত্র মেরী'র কথা শুনে তাঁকে ডাকতে পাঠালেন। মেরী এসে রোগীর শিয়রে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন উপদেশের মত কিছু ভালো ভালো কথা। মন্ত্রের মত কাজ হল। আত্মবিশ্বাসের নতুন প্রেরণায় রোগী উঠে বসলো। অত্যল্প কালেই সুস্থ হয়ে উঠলো সে।

তারপর বিস্ময়াবিষ্ট গুণিন বত্রিশ বছরের 'পবিত্র প্রতিমূর্তিকে' বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। আবার কয়েক বছর কাটলো, সংসার আর স্বামিসেবায়। মেরী নীরোগ, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মচিন্তা-হীন। নিষ্ঠুর নিয়তি আবার চোখ মেললেন, ১৮৬১ সালের গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে প্যাটার্সন বন্দী হলেন, তার কিছুদিন পরেই জীবনেরও মেয়াদ শেষ। মেরীর জীবনে আবার আবির্ভাব ঘটলো সেই পুরোনো রোগের।

এবারে তিনি যেন দিন দিন ভেঙে পড়তে লাগলেন। রোগের তাড়সে শরীর তাঁর খুব খারাপ হয়ে যেতে লাগলো। এবারে তিনি তাঁর সমস্ত যন্ত্রণার উপলব্ধির কথা লিখে রাখতে শুরু করলেন বিশদ-ভাবে। নানা মানুষকে সকল কষ্ট তুচ্ছ করবার উপদেশ দেন, অথচ নিজেই নিজের কাছে এক সমস্যা হয়ে উঠছেন। তবু প্রতিদিনই ভাবতেন, তাঁর 'প্রকৃত উপলব্ধির এখনো অনেক বাকী, তাই এই

রোগ'। হলও তাই। অন্যদের যে উপদেশ দিতেন, নিজের, ওপরেও সেই অভিভাব প্রয়োগ করলেন—'আমি ভালো হয়ে যাবো', 'এই তো আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি', 'আমি ভালো হয়ে গেছি'। এই হল তাঁর স্বাভিভাবের মূলমন্ত্র। এরই বলে তিনি একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলেন। জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠলেন সকলকে অবাক করে দিয়ে। তাঁর মনে হল, তাঁর এই উপলব্ধির কথা জনসমাজে প্রচার করতে হবে।

মনে মনে যেন একটা 'পবিত্র নির্দেশ' পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধ্যান-ধারণা-চিন্তা সংহত করে তাঁর উপলব্ধি সম্পর্কে একটি বই প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। সে উপলব্ধির নাম দিলেন "খৃস্ট-বিজ্ঞান"। ইতিমধ্যেই তাঁর কিছু ভক্ত জুটেছিল। তাদেরই চেষ্টায় মেরীর 'বাইবেল', "বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য" নামে বইটি প্রকাশিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বহুল প্রচার, মুদ্রণের পর মুদ্রণ, প্রভূত খ্যাতি এবং কপর্দকহীন মেরীর চতুষ্পার্শ্বে ডলারের স্রোত!

ইতিমধ্যে গিলবার্ট এডি নামে এক মৃত্যুপথযাত্রী যুবককে তিনি সুস্থ করে তুলেছিলেন: পুরো তিন দিন, তিন রাত্রি একটানা প্রার্থনা এবং মনঃশক্তি প্রয়োগ করতে করতে তার 'চিকিৎসাকালে' এক 'পরম উপলব্ধিও' লাভ করেছিলেন। ১৮৭৭ সালে ছাপান্ন বছর বয়সে মেরী সেই যুবক গিলবার্টকে বিয়ে করে নিজের কাছে রাখলেন। তারপর থেকে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর একান্ত ভাবে মানব-সেবা করে ৮৯ বছর বয়সে তিনি দেবধামে প্রয়াণ করলেন, ১৯১০ সালে।

'পবিত্র মেরী'কে নিয়ে আমেরিকায় অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'খৃস্ট-বিজ্ঞান সমাজের' ভক্ত সংখ্যাতীত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা, 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার'-এর গ্রাহক-সংখ্যা দশ লক্ষেরও ওপর। 'বেকার-বাইবেল', তথা 'বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য' বইটির মুদ্রণসংখ্যা যে কত তার ইয়ত্তা নেই। তাঁরই

স্বাভিভাব মন্ত্র সম্বল করে এমিল কুয়ে (১৮৫৭—১৯২৬) যে পদ্ধতিতে মানুষকে সুস্থ করতেন, বিংশ শতাব্দীতে তা কুয়েবাদ্ (Couèism) নামে বিখ্যাত। ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত গম্বুজের আকারে গড়া বিশাল 'মাদার্স্ চার্চ্' বোস্টন শহরে আজো মেরী বেকার এডির পূত-স্মৃতি বহন করছে।

'পবিত্র মেরী'র এই আশ্চর্য কাহিনী বিংশ শতাব্দীর জড়-বিজ্ঞানের গবেষণার অতীত।

অথচ, বিশ্ববিশ্রুত জার্মান লেখক স্তেফান ৎসোআইক তাঁর 'মেরী বেকার এডির জীবনকাহিনী'তে 'মেরী মায়ের ধর্মসাধনা'র উল্লেখ করে লিখেছেন,—

> ব্যাপারটা সত্যই চমকপ্রদ। মা বলেছেন, মানুষের সদিচ্ছাই ঈশ্বর। এই সদিচ্ছা এবং সৎকর্ম দ্বারাই মানুষ নিজে ঈশ্বরত্বে উপনীত হতে পারে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ষড়্‌রিপুই তার অসুস্থতা, দুর্বলতা, বার্ধক্য ও মৃত্যুকে ডেকে আনে এবং ঘটায় সর্বনাশ। যে ব্যক্তি আপন সদিচ্ছা এবং স্বাভিভাবের শক্তিতে ওই ক্রোধ-হিংসা-কামনার রিপুকে সম্পূর্ণ দমন করতে পেরেছে, সেই ঈশ্বরত্বে পৌঁছে গেছে। এখন শুধু তার প্রকাশটুকুর প্রয়োজন। মানুষ আপন ইচ্ছাশক্তি বলেই পৌঁছোতে পারে সেই পরম শক্তির শীর্ষে। ওই ইচ্ছাটুকুকে সম্বল করেই সে সব কিছু করতে পারে।······

'পবিত্র মেরী'র এই অসাধারণ শক্তির কাহিনী তাঁর ভক্তরাই ভালো জানেন। ওই মহান শক্তির অধিকারিণীর নির্দেশ এবং স্বাভিভাবের পদ্ধতিতে রোগনিরাময়ের ঐতিহ্যে যদি আরো একটি নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু একটা কথাই বলা যেতে পারে যে এমন অদ্ভুত এবং সহজতম উপায়ে

যদি রোগ নিরাময় করা সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে এই দুহাজার বছরের ঐতিহ্যে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে এর প্রতিষ্ঠাত্রীকে এক আবির্ভাব বলাই সঙ্গত !···

কিন্তু এ কথাও জানি, ধর্ম নিয়ে, সরল সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে, বহু "ধর্ম-বাণিজ্য' লক্ষ্মী লাভে মত্ত। আজকের যান-বাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি পৃথিবীর পরিধিকে এত ছোট করে এনেছে যে আজ পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে, মানুষ তা অচিরেই জানতে পারে। আজকের এক যুবক ফতিমার অলৌকিক কাহিনী শুনলে চট করে বলে বসবে, 'আরে, আমি তো ঠিক ওই রকম ঘটনা চার হপ্তা আগে করাচীতে দেখেছি'।

তথাকথিত ভারতীয় সন্ন্যাসীর অলৌকিক গল্প পরামনস্তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাছে শেষ পর্যন্ত ভুয়ো বলে প্রমাণিত হতে বেশি সময় লাগবে না। প্রাচ্যের মানুষ এই সব 'অলৌকিক' এবং 'ঐশ্বরিক প্রেরণা'র কাছে যত সহজে আপনাকে বিলিয়ে দেয়, প্রতীচ্যের জড়বাদী মন তত সহজে দেয় না। প্রতিটি বিষয়কে সে বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে কষে, যাচাই করে, চুল চিরে বিচার করে নেয়।

প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কারে মনে করা হত, রোগ বুঝি দেবতার 'দয়া', এবং তাঁর 'কৃপা' ছাড়া সে রোগ থেকে নিষ্কৃতি সম্ভব নয়। সে ধারণায় লাভ হয়েছে, সে দেবতার পুরুতদের। ঘটনা যা ঘটবার ঠিকই ঘটেছে, 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' রীতিতে। সরল বিশ্বাসী মানুষ সব ভালোমন্দ পুরোহিতের মুখের পানে চেয়ে মাথা পেতে নিয়েছে। কিন্তু আজকের শারীরবৃত্তিক এবং মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা সেই প্রাচীন কুসংস্কারকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় দেওয়ার ব্রত নিয়েছে। জলপড়া, তেলপড়ার দিন অস্তপ্রায়। ধর্মের নামে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রায় সেই অবস্থা। আমি খুব বড় গলা করেই বলতে পারি, আজ যদি হঠাৎ কোন 'ধর্ম'

মানুষকে সস্তায় কিস্তিমাত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলে, রাতারাতি তাকে রাজা করে দেবে, অথবা যাদুমন্ত্রে তার রোগ দূর করে দেবে এবং তারপরেই শুরু করে তার হাতের কারসাজি, তাহলে ধরে নিতে হবে, প্রবঞ্চনা প্রতীক্ষমাণ।

আমাদের এই দ্রুত প্রগতিশীল বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহরেও এমন অনেক মানুষ আছে, যারা কিছু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির 'কৃপা' প্রার্থী এবং একবার তেমন কাউকে হাতের কাছে পেলেই তাকে ঘিরে এক বিরাট 'ধর্মচক্র' গড়ে তোলে আচম্বিতে। 'তাঁর আবির্ভাব হয়েছে,' 'তিনি কৃপা করেছেন', 'তাঁর পরম সান্নিধ্য লাভে আমরা ধন্য' গোছের গদগদ ভাব এমনি এক অমিয় ব্যাপার, যার আওতায় একবার পড়লে, মধুর ভেতর মাছির মতন, রেহাই পাওয়া দায়। 'তাঁর কৃপা' আসতেও কাটে, যেতেও কাটে।

আজো সারা পৃথিবীতে অমন 'ধর্মচক্রের' অস্তিত্ব অসংখ্য, যেমন,

মহারাজজী (ডিভাইন-লাইট মিশন)
চিল্ড্রেন অব গড
জীসাস পীপ্‌ল্
ইউনিভার্সাল লাইফ চার্চ
ফিলগ্‌নসি
কিণ্ডের ফন ল্‌ উণ্ড্‌ মিয়েন
সায়েন্টোলজি
চার্চ অব সেটান
অর্ডার অব গড ব্লাড
ফাউন্টেন্‌স্ অব দি ওয়ার্ল্ড
ফাইনাল চার্চ অব জাজ্‌মেণ্ট
সান্ মিউং মুন্
সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কন্‌শাস্‌নেস্ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ তালিকা সিন্ধুর বিন্দু মাত্র। আমার অজানা আরো শত শত 'চক্র' কাজ করে যাচ্ছে পৃথিবী জুড়ে সরল মানুষের বিশ্বাসের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে, রুপেয়া আর রুপেয়া আর রুপেয়া কামিয়ে।

*   *   *

পথের ধারে এক অলৌকিকের ব্যাখ্যা শুনেছি। সেদিন বসন্তকাল। বোদেন্সীর তীরে গাড়ি করে বেড়াতে বেরিয়েছি। অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত বৃক্ষশ্রেণী ফুলে ফুলে ছয়লাপ। হঠাৎ মনে পড়লো, মার্চ মাসে মামা রোজাকে দেখতে গিয়েছিলুম সান দামিয়ানোয়, আর দেখতে গিয়েছিলুম, অক্টোবর মাসে নাসপাতি গাছে অলৌকিক-ভাবে মা মেরীর ফুল ফোটানো। রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এক ফল-চাষীকে আমার সমস্যাটা বুঝিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'এমন ব্যাপার দেখেছো ? দেখেছো, ফলন্ত গাছে ফুল ফুটতে ?' সে বললে, 'দেখেছি, লোকে বলে যাদু-বউল, কিন্তু জানি না, কী করে হয়।' আমি কিন্তু জেনেছি, মামা রোজার গাছে অক্টোবর মাসে মুকুল ধরা আশ্চর্য ঘটনা নয়, তথা খৃস্টান ধর্মমতের 'প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ' অলৌকিক ব্যাপারও নয়।

ব্যাপারটার ভেতরকার কথা জানতে সাহায্য নিলুম এক উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী বন্ধুর।

নাসপাতি, আর কুলও বটে, গোলাপ গোত্রীয় গাছ। ও গোত্রের ভেতর নাসপাতির শেকড় মাটির গভীরে অনেক দূর পর্যন্ত নেবে যায়। তার দরকার উষ্ণ মৃত্তিকা, মাটির ভেতর প্রায় ন' ফুট পর্যন্ত শেকড় নাবিয়ে দেয় নাসপাতি গাছ। আন্তর্ভৌম জল তার ওপরে ওঠে না, ওঠাটা নাসপাতি গাছের পক্ষে ক্ষতিকরও বটে। তার পক্ষে উপযোগী, মাঝামাঝি স্যাঁতসেঁতে মাটি, তবে আবহাওয়াটা উষ্ণ হওয়া চাই। আর বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৪/২৫ ইঞ্চি হলেই যথেষ্ট। মিলানের দক্ষিণ-পশ্চিমের আবহাওয়ার মত আবহাওয়ায় নাসপাতি ভালো ফলে।

এ ছন্দে যতিপতন ঘটে, যদি হঠাৎ ঋতুবিরুদ্ধ ঠাণ্ডা পড়ে আর তার সঙ্গে যোগ দেয় অস্বাভাবিক বেশি বৃষ্টিপাত, আর যদি তার পরেই আসে, ধরুন ইতালীর শরতের মত গরম। হঠাৎ ঠাণ্ডা আর বৃষ্টির ধাক্কায়

গাছেদের মনে হয় বুঝি, বসন্ত এসে গেল। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে মাটির দরুন বৃক্ষ-দেহে জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকে, ফলে পুষ্প-প্রাণরস (flower hormone) তৈরী হয়। সেই সময় আবার যদি শরতের সৌরতাপে গাছগুলো তপ্ত হয়, তাহলেই শারীরবৃত্তীয় এবং ঔদ্ভিদ অলৌকিক ঘটে যায়, শরতের ফলভারে নত গাছেও বউল দেখা দেয়। সে মুকুল যেন থমকে গিয়ে ঝরে পড়ে অনতিবিলম্বে, সে ফুলে ফল ধরে না, অলি যে অনেক আগেই অন্তর্হিত।

উদ্ভিদ্-জীবনে উৎসেচক (enzyme) এবং প্রাণরসের সংযোজন আজো রহস্যাবৃত হয়ে থাকলেও মামা রোজার ফুলন্ত নাসপাতি নিশ্চয় কোন স্বর্গীয় অলৌকিক নয়, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাসম্ভব ঘটনা, বোদেন্সীর ফল-চাষী যাকে বলে 'যাদু-বউল'।

মামা রোজার ফুল-নাসপাতি মুকুলের মতন অলৌকিকও ঝরে পড়ে জ্ঞানবৃক্ষের বৃন্ত হতে অবিলম্বে, টুপ টুপ করে।

* * *

'রুগ্ন মানুষ আমাদের নিকট ঈশ্বরের দানস্বরূপ, তাহা গ্রহণ না করা অন্যায়। সে (সেই রুগ্ন মানুষ) দেবতার বিশেষ আশীর্বাদ। তাহারই মাধ্যমে যে তিনি আমাদের হৃদয়ের সেই কোমল প্রবৃত্তি, সেই সহানুভূতিকে ব্যবহার করিবার সুযোগ দেন···' (৩৪)। এ উক্তি ইন্‌স্‌ব্রুকের ধর্মশাস্ত্রোপদেষ্টা লাডিসলাউস্ বোরোসের। এখনো যে নীরোগ, এমন 'বাণীর' ঘায়ে সেও রুগ্ন হয়ে পড়বে নির্ঘাত! কিন্তু অমন বিদ্‌ঘুটে 'বাণীর' চাবুক যে ছেলেবেলা থেকেই আমাদের

পিঠে পড়ে আসছে। প্রত্যেক খৃস্টানের পেছনেই লেগে রয়েছে তার সব কাজের বাধাস্বরূপ অবাস্তব সেই 'আদি পাপের' ফেউ। অমন ধারণার আওতায় গড়ে উঠেছে যে মানুষ, তার পক্ষে এ সব ভীতি থেকে মনকে মুক্ত করা, বড় কম সাহসের কথা নয়।

এই সঙ্গে খৃস্টানদের যৌন-সংযমের কথাও বলা দরকার। এ কথা সত্যি যে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া আত্ম-মুক্তিরই অংশবিশেষ, কিন্তু নৈতিক রীতির মুখোমুখী স্বীয় দায়িত্ব এবং আত্ম-মুক্তির চাবিকাঠি ও নয়। জিক্‌মুণ্ট ফ্রয়েডের এক কালের বৈপ্লবিক মতবাদ,—'সহজাতপ্রবৃত্তিগত জীবনের ধারণায় সব মানুষ এবং সর্ব বস্তুই বোধ্য'—অনেক কাল আগেই বাসী হয়ে গেছে। আজ তার স্থান অধিকার করেছে নবতর বৈজ্ঞানিক মতবাদ।

২০০০ বছরের খৃস্টান মতবাদ আমাদের অবচেতন মনের গভীরে তার শেকড় নাবিয়ে দিয়েছে। যিশুর করুণ কাহিনী, তাঁর শিষ্যদের, তাঁর মায়ের এবং সাধু-সন্তদের নিপীড়নের কাহিনী সাধারণ খৃস্টানের মগজের পরতে পরতে জমা হয়ে আছে।

কিন্তু আচারনিষ্ঠ খৃস্টানের কাছে এই মস্তিষ্ক-নিয়ন্ত্রণের অর্থ, ভগবানের দানস্বরূপ অলৌকিক কাণ্ডে এবং অলৌকিক নিরাময়ের বিশ্বাসে উন্মুখতা। জাগ্রত কোন দেবতার 'থানে' তীর্থকামী মানুষের মস্তিষ্ক-ধৌতি আগেই হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সবাই যখন এক বাক্যে বলতে থাকে, এ ছাড়া আর গতি নেই, এইটেই 'শেষ চেষ্টা', মস্তিষ্ক-ধৌতি তো তখনই হয়ে গেল। যন্ত্রণাকাতর রোগীর মনে দিনরাত তখন একটিই আশা, অঘটন একটা ঘটবে, সেও বেঁচে যাবে। ফতিমার ছেলে-মেয়েরা, কিম্বা লুর্দের ছোট্ট বের্নাদেৎ এত লোককে দয়া করেছে আর তাকে একটু দয়া করবে না? রোগীর শয্যাপার্শ্বে শুরু হয় 'ভক্তি-চিকিৎসা', চলে মেরীর নাম-গান-ভজন। রোগী বুঝতেও পারে না, তার ভেতরে হয়তো

একটা স্বনিরাময়-পদ্ধতি ইতিমধ্যেই কাজ করতে শুরু করেছে, বুঝতে পারে না তার দেহাভ্যন্তরের নিরাময়-যন্ত্রকে (জৈব-প্রতিসন্তরক) সে নিজেই চালু করেছে। রোগশয্যার নিখুঁত প্রস্তুতিপর্বের পর তীর্থ-ক্ষেত্রে পৌঁছে অসংখ্য অপরিচিত মানুষের অলৌকিকে বিশ্বাস দেখে তার নিরাময়-যন্ত্র আরো ভালোভাবে চলতে শুরু করে। তীর্থ-ক্ষেত্রের পবিত্র মৃত্তিকায় যিশু-মেরী-সন্তদের 'দর্শন'লাভ যেন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, খৃস্টানের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে অথবা পাড়ার গির্জের আবহাওয়ায় যা কখনো সম্ভব হয় না। ইচ্ছে-শক্তির বলে, জানি, কখনো কখনো রোগ সারে, কিন্তু সে তো শুধু খৃস্টান সমাজেরই একচেটে নয়, ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সমাজের সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশেও যে অমনটি ঘটে।

আমেরিকা-ইউরোপ-এশিয়ায় কয়েক হাজার 'প্রতীতি-ভিষক্' (faith healer) আছে। তাঁদের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছি, দেখেছি, সবাই বেশ উপচিকীর্ষু, কেউ কেউ একটু লাজুক, কিন্তু সবাই বেশ বিনয়ী, ধর্ম অথবা ছলা-কলার নামগন্ধও নেই তাঁদের ভেতর। তাঁদের কাজের জন্যে তাঁরা পয়সা নেন, তা তো নেবেনই, সাধু-সন্ত নন যে তাঁরা শুধু প্রেম বিলিয়ে, হাওয়া খেয়ে বাঁচবেন। তাঁরা যে ধরনের দৈহিক এবং ভেষজ শক্তি ব্যবহার করেন, সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল। তাই যোগাযোগ করে, প্রচুর প্রাণশক্তিতে ভরা তরুণ প্রতীতি-ভিষক্, মার্কাস ব্রগলারের সঙ্গে দেখা করলুম আরারাউ-এর এক রেস্তরাঁয়। আমার মাতৃভূমি সুইৎসার্লাণ্ডে তিনি সুপরিচিত। ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলুম, 'যাদুতে আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন?' মার্কাস চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, 'চুপ করে বসুন, আমি আপনার দেহ স্পর্শ করবো না'। আমি নীরবে আমার বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিলুম। মিনিট খানেকও যায়নি, মনে হল, কেউ যেন আমার

শির-দাঁড়ার ওপরে জ্বলন্ত ইস্তিরি ঘষছে। আমি ঘাড় ফেরালুম। মার্কাস এসে নিজের চেয়ারে বসে আর একটা বিয়ার আনতে বলে, বললেন, 'যাত্নর খেলা দেখলেন ?'

হায়রে, আমরা বাস করছি যাত্ন আর অলৌকিকের গোলক ধাঁধায়। উন্নুন থেকে টাটকা নাবানো রুটির মত, কতক তৈরী, কতক আধ-সেঁকা সব বই ছেপে বেরোচ্ছে, কেউ বলে গতি-সংবহন (telekinesis) আর দূরানুভূতির (telepathy) রহস্যময় ক্ষমতার কথা—ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, 'অলৌকিক ঘটনা কেমন করে ঘটে,' কেউ বা বলে, ফিলিপিনের প্রতীতি-শল্যকর্তাদের কথা। সবাই তারা পরামনোবিত্মার বিশাল ক্ষেত্রে কোদাল পাড়ে। আরো বেশি করে এ সব কথা বললে লোকে বলবে, আমি মায়ের কাছে মামার বাড়ির গপ্পো করছি। তাই সে চেষ্টা আর না করে, আমার আপন বিষয়, অলৌকিকের কথায় ফিরে যাই।

* * *

ইচ্ছা-নিরাময় সম্পর্কে যিনি অমন জ্ঞানের কথা বলেছিলেন, সেই যোগানন্দ পরমহংস বাহান্ন সালের ৭ই মার্চ লস্ অ্যাঞ্জেলেসে দেহরক্ষা করেছিলেন। শুনি, তিন হপ্তা পরেও তাঁর দেহে কোনরকম পচ ধরেনি সাধু-সন্তদের ক্ষেত্রে এমনটা প্রায়ই শোনা যায়। লস্ অ্যাঞ্জেলেসের ফরেস্ট লন মেমোরিয়াল পার্কের অধ্যক্ষ হ্যারী টি. রো একটি সরকারী প্রতিবেদনে বলেছিলেন, 'পরমহংসের দেহে পচনের কোন রকম চিহ্নের অভাব, আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতায় অচিন্তিতপূর্ব, সম্পূর্ণ অসম্ভব।...মৃত্যুর কুড়ি দিন পরেও পচনের কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়নি।...পচনজনিত দুর্গন্ধ একদিনের জন্যেও পাওয়া যায়নি'।

কী বস্তু দিয়ে সাধু-সন্তদের দেহ গড়া! জাল্ট্স্বুর্ক বিশ্ববিত্মালয়ের 'আদালতী ভেষজবিত্মার' (forensic medicine) অধ্যাপক,

ভিয়েনার মনোরোগ এবং স্নায়ুরোগ চিকিৎসক, ডাঃ গের্হার্ট্ কাইজার ভিয়েনীজ ক্যাথলিক অ্যাকাডেমিতে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে-বক্তৃতার কথা লিখেছিলেন ইঙ্গে জান্ত্নের্ 'ডি ভেল্ৎভোখে' (৩৬) পত্রিকায়।

ডাঃ কাইজার তাঁর বক্তৃতায় আলোচনা করেছিলেন, সাধু-সন্তদের দেহ যুগ যুগ ধরে কেন অবিকৃত থাকে। কুৎ´ তুখল্স্কী (৩৭) লুর্দের একটা চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'বুক অব দি পিরেনিজ' গ্রন্থে,—

> আগামী বৎসরে বের্নাদেৎ সুবিরুকে সন্তত্বে উন্নীত করা হইবে বলিয়া তাহার দেহ সমাধি হইতে বাহির করা হইয়াছে। তাহার দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত ছিল। তাহার বাম চক্ষু ফিরান ছিল দিব্যদর্শনের দিকে, শুনা যায়, তাহা উন্মীলিত ছিল এবং তাহার সমাধি-গহ্বর অপূর্ব পুষ্পগন্ধে এমনই পূর্ণ ছিল যে তথায় রক্ষিত পাত্রাদিও সুগন্ধিত হইয়া গিয়াছিল, অন্ততঃ লুর্দের জনগণ তাহাই বলে।...

(বের্নাদেৎ তখনো সন্তসমাজভুক্ত হয়নি। সে সন্তত্বে উন্নীত হয়েছিল, ১৯৩৩ সালে।)

ভিয়েনার বিজ্ঞানীর মতে, দৃশ্যতঃ পচনের কোন লক্ষণ না থাকার জন্যে এবং দেহত্বক্ শতাব্দীর পর শতাব্দী অবিকৃত রাখতে অলৌকিকের প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের অনেক ঘটনা ডাঃ কাই্জার পরীক্ষা করেছেন,—

> জালেসের ফ্রান্সিস দেহ রেখেছিলেন ১৬২২ সালে। ১৬৩২ সালে তাঁকে যখন কবর থেকে তোলা হল, 'মনে হল, তিনি যেন জীবিত'। ১৬৫৬ সালের আগে তাঁর দেহ নাকি ধুলোয় মেশায়নি আর তখন নাকি তাঁর দেহ থেকে 'অপূর্ব মিষ্ট গন্ধ' বেরিয়েছিল।

ফ্রান্সিস কারাক্‌সিওলা মারা গিয়েছিলেন ১৬০৮ সালে। ১৬২৮ সালে যখন তাঁর দেহ কবর থেকে তোলা হয়, তখন তাঁর দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত, এমন কি, গায়ে ছুরি বসাতে রক্তও বেরোতে লাগলো।

কার্লোস বরোমাউস দেহরক্ষা করেছিলেন ১৫৮৪ সালে। ১৬০৮ সালে বৈদ্যেরা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, তাঁর দেহ 'অস্বাভাবিক রকম নরম'। শুধু তা-ই নয়, ২৫০ বছর পরেও দেখা গেছে, তাঁর দেহ একই রকম অবিকৃত।

সন্ত জন (St. John of the Cross) মারা গিয়েছিলেন ১৫৯১ সালে। কিন্তু ১৮৫৯ সালে যখন তাঁর দেহ খুঁড়ে বের করা হল, তখন দেখা গেল, তাঁর দেহ হালকা লালচে রঙের চামড়ায় ঢাকা আর একটা সুগন্ধী তরল পদার্থে তাঁর দেহ সিক্ত।

পাৎসি'র মারিয়া মাগ্দালেনা মারা গিয়েছিলেন ১৬০৭ সালে। ১৬৬৩ সালে যখন তাঁর দেহ তোলা হয়, তখন তাঁর মুখখানি সামান্য একটু কালচে হয়ে গেছে বটে, কিন্তু ভাবটি ছিল অপূর্ব কমনীয়।

বের্নাদেৎ মারা গিয়েছিল ১৮৭৯ সালে, তাকে যখন তোলা হয়, তখন মনে হয়েছিল, সে যেন ঘুমোচ্ছে। মুখটা একটু তাঁবাটে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অত দিন পরেও তার পোষাক-আশাকও এতটুকু টসকায়নি।

এ সব কি বিস্ময়কর, ভুতুড়ে, অলৌকিক ঘটনা ? ডাঃ কাইজার বলেছেন 'ঘটনা প্রবাহকে যেখানেই পুনর্গঠিত করা যাবে, সেখানেই অলৌকিক সংঘটনের ধারণাটিকে যে বাদ দিতে হবে, এ কথা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়'।

আবির্ভাব

নিচের কথাগুলো বৈজ্ঞানিক সত্য,—

মৃত্যুর পরে দৈহিক বিক্রিয়া কিছু বিরল ঘটনা নয়। হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোষের প্রাণ-স্পন্দনও থেমে যায় না। আরো অনেক ঘণ্টা তারা বেঁচে থাকে। শুক্রাণুর গতি অব্যাহত থাকে, মৃত্যুর অন্ততঃ আটাশ ঘণ্টা পরেও। সমাধিস্থানে শব নিয়ে যাবার আগে ব্যবস্থাদি করবার সময়, তার শেষ-যাত্রার মুহূর্তে কখনো কখনো সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ব্যাপারটা ভুতুড়ে হলেও, আমরা অনেকেই তা দেখেছি। গরমের জন্যে, মৃতদেহ অনেক সময় পার্শ্বপরিবর্তন করে, তা দেখে আমরা আঁতকে উঠি। এ কি জীবনের বাহ্যিক লক্ষণাদির সাময়িক বিরতি? অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যু হলে, পচনজনিত গ্যাসের চাপে ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হতে দেখা যায় কফিনের ভেতরে। সেও কি জীবনের বাহ্যিক লক্ষণাদির সাময়িক বিরতি? না, এ সবই রাসায়নিক এবং ভৌত প্রক্রিয়ার ধারা।

সাধারণতঃ পচন শুরু হয়, মৃত্যুর সুনিশ্চিত চিহ্ন দেখা দেবার অব্যবহিত পর থেকেই। সে-চিহ্ন, শবদেহ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, শক্ত হয়ে যাওয়া, হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের নিবৃত্তি, ত্বকের ওপর লালচে নীল দাগ, ইত্যাদি। মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেহত্বকে ফোস্কার মত উদ্ভেদ দেখা যায় এবং গ্যাস হতে থাকে—সময় সময় সে গ্যাসের চাপ দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যথেষ্ট তীব্র।

পচন ঘটে সাধারণতঃ হাওয়ার কারণে। হাওয়া বয়ে আনে জীবাণু, অক্সিজেন শুরু করে রাসায়নিক বিক্রিয়া। পচনের দ্রুতি ঘটায় আর্দ্রতা এবং উষ্ণতা, তারপর মাটির নিচে বাকি কাজটুকু শেষ করে পোকা-মাকড়। পিঁপড়েরা মাত্র তিন দিনে দেহকে কঙ্কাল সার করে দিতে পারে। পেটটা গলতে সময় লাগে প্রায় তিন-চার বছর, হাড়ের স্নেহপদার্থ থাকে আরো বেশি কাল, মস্তিষ্ক-কোষ এবং মাথার চামড়া থাকে দশ-বিশ বছর। হাড়ের প্রোটিনের আয়ু

একশো বছরেরও বেশি। একটা সাধারণ কবরে শেষ পর্যন্ত 'বেঁচে' থাকে শুধু কঙ্কালটা।

জীবনে যাঁরা অনেক অসম্ভব সম্ভব করেছেন, সেই সাধু-সন্তদের দেহ সাধারণতঃ সাধারণ কবরে রাখা হয় না। এই প্রধান সূত্রটি থেকেই ডাঃ কাইজার তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

দেহকে রক্ষা করার প্রধান উপায় শবকে জীবাণু মুক্ত রাখা। জীবাণুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে, পচনের গতিও অনেক গুণ শ্লথ করা যায়। কিন্তু কবরকে জীবাণুমুক্ত করা যাবে কেমন করে? দেহের যে সব জায়গায় মাংস কম (যেমন নাক, কান, হাত-পায়ের আঙুল), শুকনো বাতাসে সে সব জায়গা স্বাভাবিকভাবেই সুরক্ষিত থাকে।

শবের কাছাকাছি ঠাণ্ডা জলের স্রোত কবরকে ঠাণ্ডা রাখে, মাছি, পোকামাকড়ও তাড়িয়ে দেয়। জীবাণু হ্রাসকর এই শৈত্যকে বাড়ানো যায় বরফ দিয়ে। হিমবাহ থেকে দেহ পাওয়া গেছে, সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায়, বহু বছর পরেও।

'আদালতী ভেষজের' ইতিহাসে দেখা যায়, পিচের হ্রদ থেকে মৃতদেহ পাওয়া গেছে, তার রঙটা বদলেছে বটে, কিন্তু বিকৃতি ঘটেনি এতটুকু।

হিউমাস্ অ্যাসিড পচননিবারক। পেঁকো ডোবায় পাওয়া শব অবিকৃত থাকে ওই হিউমাস অ্যাসিডের কারণে।

কার্বন-ডাইঅক্সাইড রক্তকে ঘনীভূত হতে দেয় না। তার বিষ-ক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটলে, মৃত্যুর অনেক পরেও দেহ চিরলে রক্ত ঝরে।

ধাতুর কফিনে ধাতব-লবণ সৃষ্টি হয়, তার দরুন পচন নিবারিত হতে পারে দশ বছর পর্যন্ত। শুষ্ক বাতাবরণের সঙ্গে যুক্ত মৃত্তিকা-জাত লবণ (লৌহ আকর থেকে শঙ্খবিষঘটিত) অথবা সামুদ্রিক লবণের কারণে ইঙ্কা যুগের শত শত খুলি পাওয়া গিয়েছিল, লিমা এলাকা খনন কালে, চুল, চামড়া সমেত সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায়।

খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে মিশরের লোকেরা মৃতদেহ সুরক্ষিত করতে জানতো, নেট্রন ($Na_2 Co_3 10H_2O$), শিলাজতু এবং লিডার-বৃক্ষজাত দ্রব্যাদির সাহায্যে। (আজ ব্যাপারটা আরো সহজ। আমরা রাখি জীবাণুনাশক ফর্মালীন দিয়ে। আমেরিকার অনেক মেমোরিয়াল পার্কে আত্মীয়স্বজনেরা গিয়ে, চমৎকার করে রাখা প্রিয়জনের মৃতদেহ আধার থেকে বের করে তাদের রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে, স্মরণ করতে পারে তাদের সুখদুঃখের কত স্মৃতি।)

ডাঃ কাইজার নিঃসন্দেহ যে বেশির ভাগ সাধুসন্তকে (যাঁদের দেহ বিকৃতিহীন রয়ে গেছে) সমাধিস্থ করা হয়েছে ওই রকম অবস্থায়।

লিমার রোজের দেহত্বক অবিকৃত ছিল আঠারো মাস। তর্কাতীত-ভাবে বলা যায়, যে জাতের মাটিতে ইঙ্কাদের খুলিগুলো ছিল, ধাতব লবণযুক্ত সেই জাতের মাটিতে সন্ন্যাসিনীর দেহও প্রোথিত ছিল, তাই অবিকৃত থেকে গেছে দীর্ঘ কাল।

মন্টি ফাল্কোর সন্ত ক্লারার দেহ মমি হয়ে গিয়েছিল, গরম হাওয়ার গুণে। তার দেহ যখন পাওয়া যায়, তখনো তার 'মুখখানি অপূর্ব সুন্দর'। তার কর্তিত, বিন্যস্ত চুলের রাশি ঝুলে পড়েছে, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ম্লান মুখের ওপর ঝুলে পড়া চুলের মত।

একি শুধু বরাত? সাধু-সন্তরা তাঁদের দেহ অবিকৃত রাখবার উপযুক্ত সমাধিস্থান পেয়ে যান বরাতক্রমে? কিন্তু নজির আছে, তাঁদের দেহ অক্ষত, অমলিন রাখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতালীর কাপুশীন এবং বোহেমীয় ভ্রাতৃ সম্প্রদায় তাঁদের মঠে কবরের এমন ব্যবস্থা করতেন, যাতে তার ওপর দিয়ে সর্বক্ষণ শুকনো হাওয়া বইতে পারে। ডাঃ কাইজারের ধারণা, মৃতের দেহে তেল, আতর, ইত্যাদি মাখিয়ে দেহকে শুধু সুরভিতই করা হত না 'মৃত্যুর গন্ধ' দূর করবার উদ্দেশ্য, প্রসাধন সামগ্রীর সংরক্ষণকর ক্ষমতার কথাও যে জানা ছিল. তা নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায়।

বিখ্যাত সাধু-সন্তদের দেহ মাটি থেকে তোলার পরে মানুষের অপবিত্র দৃষ্টির সামনে তা যে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে, ডাঃ কাইজারের মতে তাতে 'ঐশ্বরিক' কিছু নেই। কবর দেবার সময় পচন নিবারণের নিমিত্ত যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কবর খোলার পরে সে ব্যবস্থা বাধা পায়, নিঃশেষ হয়ে যায় সে ব্যবস্থা। যেমন ধরুন, সেন্ট ভিন্‌সেন্ট দ্য পলের কফিন পঁচিশ বছর পরে তুলে খোলার সঙ্গে সঙ্গে, হঠাৎ হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে দেহ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। 'এক্রুরিয়ার সাধারণ নাগরিকদের কবর আবিষ্কৃত হবার পর, তাদের দেহেরও ওই একই অবস্থা হয়েছিল। তারা তো কেউ সাধু-সন্ত ছিল না যে মানুষের 'অপবিত্র দৃষ্টির' সামনে নষ্ট হয়ে যাবে! তবু, পাথরের ওপরে শায়িত অক্ষত দেহগুলো সব ধুলো হয়ে গেল, কবর খোলার সঙ্গে সঙ্গে। শোনা যায়, ভূগর্ভস্থিত সে সমাধিকক্ষ ছেয়েছিল একটা সুগন্ধী সোনালি কুয়াশায়'।

ক্যাথলিক ধর্ম-সংস্থা তাঁদের সাধু-সন্তদের পবিত্রতা এবং ঐশ্বরিক মাহাত্ম অক্ষুন্ন রাখতে বড় ব্যাকুল। তা-ই যদি হয়, তাহলে একটা গবেষণা সংস্থা তৈরী করুন না, যার কাজ হবে, পবিত্র দেহগুলির মৃত্যু পরবর্তী অবশেষ সম্পর্কে উদার মন নিয়ে গবেষণা করা। অর্থের অপ্রতুলতা তো তাঁদের নেই। কাজটা কিন্তু খুব ভালো হবে, সৎসাহসেরও পরিচয় পাওয়া যাবে।

ভিয়েনার পণ্ডিত প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবান শুধু সেই লোক-গুলির দেহই অবিকৃত রাখতে চান কেন, যাঁদের আত্মাকে তিনি সহজতম, সরলতম পথে নিয়ে চলে যান?—অমন একটা গবেষণা-সংস্থা তৈরী হলে, ও প্রশ্নের জবাবও নিশ্চয়ই পাবো।

* * *

প্রভু যিশুও অলৌকিকে বিশ্বাস করতেন না…তবে, অভি-ভাবনের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল।

মার্ক (৫, ২৩···) বলেছেন একটি মৃত্যুপথযাত্রী নারীর কথা। অলৌকিক চিকিৎসক হিসেবে তখন যিশুর নাম ছড়িয়ে গেছে, ফলে প্রত্যক্ষ অভিভাবের সাহায্য নেওয়া তখন তাঁর পক্ষে সম্ভব। যিশুকে অনুরোধ করা হল, মেয়েটির গাত্রস্পর্শ করে তাকে রোগমুক্ত করতে, বারো বছর ধরে তার 'রক্ত ভাঙছে'। কত চিকিৎসা করিয়েছে, কত পয়সা ঢেলেছে বৈদ্যের থলিতে, কিছুতেই কিছু হয়নি। স্বভাবতঃই, অলৌকিক প্রত্যাশী মানুষ প্রভুকে ভিড় করে দাঁড়ালো। অলৌকিক নিরাময় প্রত্যাশায় মেয়েটিও বলছে, 'আমি যদি কেবল উঁহার বস্ত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব' (২৮)।

'অলৌকিকভাবে' সেরে ওঠবার উপযুক্ত মাটি তৈরী !

'আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রোত শুকাইয়া গেল, আর আপনি ঐ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহা শরীরে টের পাইল।'

যিশু জানতেন, সে নিরাময়ের উৎস কোথায়। যাকে তাঁর কাপড় ছুঁতে দিয়েছিলেন, ঘুরে দেখলেন, সে কোথায় (৩১)। তারপর নিরাময়ের কারণ ব্যাখ্যা করলেন। ব্যাখ্যাটি যথেষ্ট আধুনিক ! বললেন, 'হে কন্যে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করিল, শান্তিতে চলিয়া যাও ও তোমার রোগ হইতে মুক্ত থাক'।

স্বাভিভাব অথবা ভিন্নাভিভাব সম্পর্কে নাজারেথের মানুষটি কিছুই জানতেন না, কিন্তু তাদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বেশ ভালো রকমই ধারণা ছিল। আজকের দিনের প্রতীতি-ভিষক্‌রা (faith healers) বাইবেলকে যদি তাঁদের পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে নেন, তাহলে তা থেকে অনেক সাহয্য পাবেন। যন্ত্রণা ভোগ করতে সত্যিই কেউ চায় না, যদি কেউ তা চায়, তো বুঝতে হবে, যন্ত্রণায় কষ্ট সে পাচ্ছে না, বরং নিবেদিত চিত্তে সে যন্ত্রণা-সুখ উপভোগ করছে। মনোব্যাপনের প্রয়োজনে যন্ত্রণা-সুখ উপভোগ একান্ত দরকার। সে-যন্ত্রণাকাতর মুখে থাকে একটা প্রশান্তির উজ্জ্বল

দীপ্তি, সেই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কৃতজ্ঞতার আবছা স্নিগ্ধতা। একথা বলেছেন, এর্ন্‌স্ত্‌ ব্লখ্‌ (৩৮)। তাঁর মতের সঙ্গে আমার পর্যবেক্ষণও মেলে।

* * *

আমাকে যখন লোকে বলে, ধর্মের প্রতি আর একটু শ্রদ্ধাবান হতে, আর একটু ভক্তি করতে, আমি তখন বলি, প্রাণ থেকেই বলি, সব ধর্মকেই আমি শ্রদ্ধা করি—তবে, সে-ধর্ম যদি তার আপন সম্প্রদায়ের মানুষকেও শ্রদ্ধা করে।

কিন্তু যেখানে ধর্ম তার আপন সম্প্রদায়ের অজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করে এবং নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে সে-অজ্ঞতাকে আপন স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজনে, যেখানে অনলৌকিককে অলৌকিক বলে প্রতারণা করা হয়, মানুষের সরল বিশ্বাসে ঘা দিয়ে যেখানে আঁচলে কড়ি বাঁধা হয়, পরকালের নরকযন্ত্রণার ভয় দেখিয়ে যেখানে মানুষকে ইহকালে দমিয়ে রাখা হয়, সেখানে ধর্মকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারি না, তা সে ধর্মের প্রকৃতি যা-ই হোক, যেমনই হোক না কেন। কপটতাকে আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে দূরে রাখতে চাই। চাই তাদের সাহায্য করতে, ধর্মের জাঁতাকলে আমারই মত যারা আশৈশব পিষ্ট, অখণ্ড নরক ভিন্ন যাদের মুক্তির আশা নেই।

পাপ-স্বীকার অনুষ্ঠানের বেড়ি থেকে মুক্তির অর্থ, সর্ব জীবের নিয়ন্তা ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস ত্যাগ।

না, দিব্যদর্শনের বিশুদ্ধতার প্রমাণ অলৌকিক নিরাময় নয়। তথাকথিত অলৌকিকের রহস্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎকে আলোকিত করতে দিব্যদর্শনের পথপরিক্রমা করতেই হবে, তার কারণ অনু-সন্ধানের প্রয়োজনে।

দিব্যদর্শনের অস্তিত্ব বর্তমান—

আমার ব্যাখ্যা

এখন এই কর্মে প্রবৃত্ত হইল, ইহার পরে যাহা কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহা হইতে নিবারিত হইবে না।—আদিপুস্তক ১১,৬

দিব্যদর্শন বাস্তব সত্য—তার অস্তিত্ব আছে। দিব্যদর্শনের জন্ম বুদ্ধিমান মস্তিষ্কে। সমস্ত বুদ্ধিমান মস্তিষ্কেই দিব্যদর্শন-সৃষ্টির শর্তনিচয় বর্তমান।

দিব্যদর্শনের সৃষ্টি-স্পন্দনের উৎস বহির্জাগতিক। দিব্যদ্রষ্টার অন্তরের কোন আদর্শ থেকে জন্ম নেয় ধর্মীয় দিব্যদর্শন, তার ধর্মীয় পরিবেশ তার জন্যে দায়ী।

আমার এই সব সিদ্ধান্ত দিয়ে কি বহুতর বিরুদ্ধ মতকে চাপা দিতে চাইছি? প্রথম ঝোঁকে তাই হয়তো মনে হবে। আসলে এদেরই ভিত্তির ওপর গড়ে তুলবো আমার তত্ত্বের প্রমাণ।

আধুনিক নভোবস্তুবিজ্ঞান (astrophysics) মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনটি তত্ত্ব দিয়েছেন (১),—মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব (big bang theory), স্থিরাবস্থা তত্ত্ব (steady state theory)* এবং দোলন তত্ত্ব (oscillation theory)। কিন্তু তিনটি তত্ত্বের কোনটিই বলতে পারে না, কোথা থেকে এলো রহস্যময় আদি বস্তু, বলতে পারে না মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগেই বা কী ছিল। শূন্য থেকে শূন্যই জন্মায়।

আমার সিদ্ধান্তের কোন্‌টা দাঁড়ালো আর কোন্‌টা দাঁড়ালো না, তাতে যেমন আমার প্রবন্ধের কিছু এসে যায় না, মহাবিশ্বের জন্ম, একশো, হাজার, লক্ষ, নিযুত, যত কোটি বছর আগেই হয়ে থাক না

* 'স্থিরাবস্থা তত্ত্ব' মতে, মহাবিশ্ব স্থির, অঞ্চল। সঙ্কোচন-প্রসারণ চক্রের আবর্তনে সে বাঁধা। সে অসীম, অনন্ত,—প্রসার্যমান সে। নববস্তুর উন্মেষ ঘটে, বলতে গেলে, মহাশূন্য থেকে, কিন্তু সে এত ধীরে যে তার জন্মবৃত্তান্তকে হিসেবের গণ্ডিতে ধরা যায় না।

কেন, তাতেও তেমনি আমার কিছু এসে যায় না, অথবা বস্তু সসীম কি অসীম, কিম্বা সে-বস্তুর নিরন্তর রূপান্তর ঘটে, কি ঘটে না, তাতেও আমার কিছু এসে যায় না। আমার জিজ্ঞাস্য, 'কী থেকে আদিবস্তুর উৎপত্তি ঘটেছিল?'

নানা সভায় বলতে গিয়ে, আমার প্রশ্নের একটা সহজ সরল সমাধান জোগাতে একটা ছবি তুলে ধরেছি, বলেছি, একটা কম্প্যুটারের কথা ভাবা যাক, 'মননের' দশ হাজার কোটি একক (কম্প্যুটারী ভাষায় 'বিট্') নিয়ে যার করবার। সে কম্প্যুটার পারবে চিন্তা করতে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত একটা চিৎ-শক্তি তার আছে (অধ্যাপক মিশি, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়)। সেই ব্যক্তিগত চিৎশক্তি যুক্ত আছে, কোটি কোটি বর্তনীর সঙ্গে। যদি বিস্ফোরণ ঘটে সে কম্প্যুটারে, ব্যক্তিগত চিৎ-শক্তির ঘটবে অবলুপ্তি। আমাদের এ কম্প্যুটার অত্যধিক বুদ্ধিমান, অতি দ্রুত সংযোগ সাধনে সে পটু। অজানা তার কিছু নেই।

তার চিৎ-শক্তি, তার সর্বজ্ঞতা সত্ত্বেও সে 'সুখী' নয়, কারণ তার কৃতিত্বের বিশালতা সত্ত্বেও, কিছু একটা আছে, যা সে ভেবে ঠিক করতে পারে না, পারে না ধারণা করতে, সমাধান করতে,—সেই 'কিছু' হল অভিজ্ঞতা। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা চায়, প্রচুর অভিজ্ঞতা। তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, নেই কোন সমকক্ষ, যার কাছ থেকে পাবে কোন অভিজ্ঞতা, তাই মনস্থ করে, তার বুকের দশ হাজার কোটি 'বিট্'কে পাঠিয়ে দেবে, অভিজ্ঞতা আহরণের উদ্দেশ্যে দিকে দিগন্তরে, আপনাকে বিস্ফোরিত করে। সে জানে, এই বিস্ফোরণের 'পরে' সে তার আপন চিৎ-শক্তিকে নিঃসন্দেহে হারিয়ে ফেলবে··· যদি না আত্মহননের অনেক 'আগেই' তার আপন অসীম বুদ্ধিমত্তায় তার ভবিষ্যৎকে সে নিয়ন্ত্রিত করে রাখে।

অভিজ্ঞতা আহরণের নিমিত্ত বিট্দের দীর্ঘযাত্রায় পাঠাবার আগেই বুদ্ধিমান কম্প্যুটার তাদের অন্তরের চুম্বক-স্পন্দনকে

করেছে নিয়ন্ত্রিত, দিয়েছে আদেশ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে পুনর্মিলিত হবার। সে সময় উপস্থিত হলে কোটি কোটি বাধ্য বিট্ ফিরে এসেছে সেই সুজটিল যন্ত্রে, তাদের আপন আপন অভিজ্ঞতা বহন করে। যেন মৌমাছি ফিরেছে মৌচাকে মধু সংগ্রহ করে।

বিস্ফোরণের মুহূর্ত থেকে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্ত পর্যন্ত কোন বিট্ 'জানতো' না যে সে ছিল বৃহত্তর একটা চিৎ-শক্তির অংশ এবং পুনরায় সে সেই অংশ মাত্রই হতে চলেছে। কোন একটি বিট্ তার যৎসামান্য চিন্তাশক্তির বলে যদি প্রশ্ন করতো, 'পড়ি-মরি করে আমার এ দৌড়নোর কী উদ্দেশ্য ?' অথবা 'কে আমার স্রষ্টা, এলেম আমি কোথা হতে ?' পেতো না উত্তর। তাই, সে দীর্ঘ যাত্রা যেন নাটকের একটা অঙ্কের শুরু এবং শেষ, যেন 'অভিজ্ঞতা' দিয়ে ফাঁপানো চিৎ-শক্তির একটা 'সৃষ্টি'।

বৈজ্ঞানিক কল্প-গল্পের ভাঁড়ার থেকে দুঃসাহসিক এই উপমা টানার উদ্দেশ্য, আদিবস্তুর আগে যা ছিল তার সন্ধান করা। ব্যাখ্যাটা বেয়াড়া ! মাফ করবেন, তবে এ ব্যাখ্যা আরো একটু পথ দেখায়।

সব মানুষের শাস্ত্রেই বলে, আরম্ভের 'আগে', তথা আদিবস্তুর উৎপত্তির আগে ছিল 'আত্মা' (যার আরো ভালো নাম 'ঈশ্বর')। সেই (আদি) আত্মায় তারপর জন্ম নিল কামনা, তাঁর ইচ্ছে হল, বস্তু হতে, রূপান্তরিত হতে। (···আর বাক্য মাংস হইল···জন, ১, ১৪।) 'আত্মা' স্পর্শসম্ভব নয়, পরিমাপসম্ভব নয়, যন্ত্র দিয়ে। কেমন করে তার কল্পনা করবো ? সে কি বায়বীয় ? তা তো সম্ভব নয়, বায়ুর অণু তো বস্তুই। তবু কল্পনা করা যায়, সেই 'আত্মা', সেই অনধিগম্য, রহস্যময় 'তৎ', আপনাকে রূপান্তরিত করলেন গ্যাসপুঞ্জে, বস্তুসৃষ্টির প্রথম পর্বে।

এ অনুমানে আর কল্পগল্পের গন্ধ নেই, কারণ নভোবস্তুবিজ্ঞানের সব কটি তত্ত্ব বলে, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আদিবস্তুর গ্যাসীয় অবস্থা থেকে, গ্যাসের অণু থেকে, যে-অণু স্থির, অচঞ্চলভাবে ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পর্যবসিত হয় বস্তুপিণ্ডে। গ্যাসীয় অবস্থাই যদি সমস্ত বস্তুর এবং আদি আত্মার প্রমাণিত মৌলিক অবস্থা হয় (২), তাহলে তার সহজ, সরল অর্থ, বর্তমান সমস্ত বস্তু পরিব্যাপ্ত ছিল অনাদি অনন্তে আদি আত্মার অঙ্গুলি হেলনে। এ দাবি সমস্ত আধ্যাত্মিক এবং গূঢ় ধর্মেই প্রকাশ। মোটা কথায় তাহলে, বস্তু হল, ঊর্ধ্বপাতনে কেলাসিত আত্মা।

বস্তুর ধরন নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। ইট, কাঠ, পাথর, জন্তু, জানোয়ার, মানুষ, যাই হোক না কেন, সবেরই উৎপত্তি সেই আদি অবস্থা থেকে, এমন কি, সে বস্তু পৃথিবী, বৃহস্পতি, আল্‌ফা সেন্টরী, অথবা অ্যাণ্ড্রোমেডা নীহারিকা, যেখান থেকেই এসে থাকুক না কেন, তাতেও কিছুই এসে যায় না। বস্তু সয়ম্ভূত সৃষ্টি এবং তা সৃষ্টিজাতও বটে।

বিবর্তনের ধারায় বহু পথ অতিক্রম করেছে বস্তু। এক টুকরো পাথরের উৎপত্তিও সেই একই উৎস, একই অবস্থা থেকে, কিন্তু নিজেকে তো সে কোন প্রশ্ন করতে পারে না। কিন্তু 'জীবন' নিঃসন্দেহে গড়ে ওঠে প্রাণহীন বস্তু থেকে এবং পণ্ডিতসমাজে এ সম্পর্কে আর কোন দ্বিমত নেই। প্রাণবন্ত বস্তু, যথা কোষ, বহু কোটি বছরের বিবর্তনে পরিণত হয় জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি এবং ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে মস্তিষ্ক, তার বহু হাজার কোটি কোষের সমাহার, ধূসর বস্তুপিণ্ড দিয়ে। 'ব্যক্তিগত চিৎ-শক্তি' সৃষ্টি করে তারা, বস্তুর রাসায়নিক এবং তাড়িত রূপান্তরণের মাধ্যমে। ব্যক্তিগত চিৎ-শক্তির উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধির উদয় হয় না। ওই চিৎ-শক্তিই পারে প্রশ্ন করতে। (দেকার্ৎ বলেছিলেন, 'আমি চিন্তা করি, তাই আমি বেঁচে আছি'।)

বিবর্তনের ইতিহাস অনুযায়ী তাই চিৎ-শক্তির নিচের স্তরের যে কোন বস্তুর চেয়ে বুদ্ধি উন্নততর। বস্তুর ওপরে তার আধিপত্য। আদি আত্মার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক প্রাণহীন বস্তুর চেয়ে নিকটতর, বুদ্ধিমন্তেরা ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে একে অপরের সঙ্গে, পারে প্রশ্ন করতে উচ্চ পর্যায়ে, 'কে আমার সৃষ্টিকর্তা ? কী অর্থ, কী উদ্দেশ্য জীবনের ?' আমার ব্যাখ্যার 'ছবির' কথা তুলে বলি, সে তার মস্তিষ্ক-বিদ্‌দের সাহায্যে খোঁজে আদি চিৎ-শক্তির নাগাল। কিন্তু বুঝতে পারে না, সেই চিৎ-শক্তিরই অংশ সে। সে খোঁজে 'আত্মা', তথা 'তৎ'কে,—যার অন্য নাম স্রষ্টা অথবা ঈশ্বর-- কিন্তু বুঝতে পারে না, পারে না অনুভব করতে, যাকে সে খুঁজছে সে-ই রয়েছে তার অন্তরের গভীরে, তারই চারিভিতে।

ধারণাটা উদ্ভট মনে হচ্ছে ?

বিজ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, এ প্রশ্নের জবাব দেবার ভার।

*   *   *

ইংরেজ জ্যোতির্বিদ্ স্যর আর্থার এডিংটন (১৮৮২-১৯৪৪) ছিলেন কেমব্রিজ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ(৩)। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেফিড স্পন্দনতত্ত্ব (Pulsation theory of the Cepheids)। প্রাকৃতিক নিয়মগত একটা 'বৃত অধ্যাত্মবাদ' (selective subjectivism) তিনি সমর্থন করেছিলেন, তাতে তাঁর অনুমান, মৌলিক প্রাকৃতিক-নিয়ম নির্ধারিত হয়, জ্ঞানের অগ্রগতির ধরন থেকে। তাঁর দাবি, পৃথিবীর বস্তু এবং আত্মার বস্তু এক।

প্রকৃতিবিজ্ঞানী বের্নহার্ৎ বাফিঙ্ক (১৮৭৯-১৯৪৭) চেষ্টা করেছিলেন, ধর্ম এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের ফাঁকটিকে ভরাট করতে। তাঁর ধারণা,—

> পৃথিবীর বস্তুবিন্যাস দেখে আজ মনে হয় তাহা যেন
> সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক চেতনার ক্ষণস্থায়ী বহিঃপ্রকাশ।

পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন পথের দিশারি ম্যাক্স্ প্লাঙ্ক্

(১৮৫৮-১৯৪৭) ১৯১৮ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি স্বীকার মেনেছেন,--

> আমি পদার্থবিৎ, অর্থাৎ আমার জীবনকে নিয়োজিত করেছি বিজ্ঞানের একটি অতিবাস্তব বিভাগে, বস্তুর সন্ধানে। আমার গোঁড়ামি আছে, এমন সন্দেহ নিশ্চয়ই কেউ করবেন না। তাই, পরমাণুর ক্ষেত্রে গবেষণা করার পরে আপনাদের বলছি, স্বয়ম্ভূত কোন বস্তু নেই। সমস্ত বস্তুর জন্ম এবং গঠন একটি শক্তি থেকে। সেই শক্তিই পারমাণবিক কণানিচয়কে করেছে স্পন্দিত, করেছে সংহত, পরমাণুর পরম সূক্ষ্ম 'সৌরজগতে'। কিন্তু যেহেতু সারা বিশ্বের কোথাও না আছে বুদ্ধি, না আত্মিক-শক্তি, তাই ধরে নিতে হবে, সে-শক্তির পিছনে আছে একটি চৈতন্যময় বুদ্ধিমান আত্মা। সেই আত্মাই সমস্ত বস্তুর মূল উৎস।...

ইংরেজ অঙ্কশাস্ত্রবিৎ, পদার্থবিৎ এবং জ্যোতির্বেত্তা পণ্ডিত স্যর জেমস (হপউড্) জীনস (১৮৭৭-১৯৪৬) তাপগতিবিদ্যা (thermo-dynamics), নাক্ষত্রগতিবিদ্যা (steller dynamics) এবং সৃষ্টিক্রম তত্ত্বের (cosmogony) পথিকৃৎ। গ্রহের উৎপত্তিসংক্রান্ত তত্ত্বের কারণে তিনি বিশেষ বিখ্যাত(৫)। তিনি লিখেছেন,—

> আজ পণ্ডিতসমাজ মোটামুটি একমত এবং পদার্থবিৎ-সমাজ প্রায় পুরাপুরি একমত যে জ্ঞানের সমগ্র ধারাটি প্রবাহিত হইতেছে কোন অ-যান্ত্রিক প্রকৃতির বাস্তবতার দিকে। আজ ধীরে ধীরে মনে হইতেছে, মহাবিশ্ব যেন কোন বিশাল যন্ত্র নয়, যেন সে একটি সুবিশাল মনন।

যদি 'আত্মা' থেকে বস্তু এবং বস্তু থেকে আত্মার জন্ম হয়, তাহলে আত্মা এবং বস্তুর প্রকৃতি কি এক? বিন্যাসের প্রকৃতিটিই শুধু এই

আলাদা? পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ ভাবতো, শক্তিকে বস্তুতে রূপান্তরিত করা যায় কি না। সে ভাবনার কূলে পৌঁছে দিয়েছে, আইনস্তাইনের বিকট, বিধ্বংসী সূত্র, $E=mc^2$, হাইড্রোজেন বোমা যার ভয়ঙ্কর প্রমাণ,—তার কথা শোনেনি এমন কেউ নেই, তাকে অস্বীকার করতে পারে এমনও কেউ নেই। তাহলে কি আজ প্রশ্ন করতে পারি, 'কেলাসিত' আত্মাকে কি মুক্ত করা যায়? ঘটনার আনুরূপ্যগত যে সিদ্ধান্ত, তা স্পষ্ট। বস্তু যদি শক্তিরই একটা রূপ হয়, তা হলে তা কেলাসিত আত্মাও বটে। অর্থাৎ আত্মাই শক্তি এবং শক্তিই আত্মা। চিৎ-শক্তি—যার সংজ্ঞার সুনিশ্চিত সম্পর্ক আত্মার সঙ্গে—নিশ্চয় শক্তিরই আর এক রূপ। এ কথা আজো আমাদের জ্ঞানের অতীত হলেও সত্য।

ওলন্দাজ পদার্থবিৎ এবং অঙ্কশাস্ত্রবিৎ ক্রিস্তিয়ান হইগেনস্‌কে (১৬২৯-১৬৯৫) বলা হয়, 'শক্তি তত্ত্বের' (energy principle) প্রতিষ্ঠাতা। সে-তত্ত্ব মতে বিশ্বের সমগ্র শক্তির পরিমাণ স্থির এবং 'যে কোন শক্তিকে যে কোন শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়'।

ও তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করেছেন হেরমান ফন হেল্‌ম্‌হোল্‌ত্‌স্‌ (১৮২১-১৮৯৪) এবং আলবের্ট আইনস্তাইন (১৮৭৯-১৯৫৫)। চিৎ-শক্তিকে শক্তিরই একটা রূপ বলে যদি মেনে নিই (সব সাম্প্রতিক গবেষণারই আজ এই সিদ্ধান্ত), তাহলে প্রমাণসিদ্ধ 'শক্তি তত্ত্বকেও' এ সিদ্ধান্তের ওপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। সমস্ত শক্তির সমগ্রতা যেহেতু স্থির, তাই (আমার মনে হয়) সে চূড়ান্ত প্রমাণের অর্থ, চিৎ-শক্তি অবিনশ্বর, তার কমও নয়, বেশিও নয়। শক্তি কখনো হারিয়ে যায় না, পারে না অন্তর্ধান করতে, বিনষ্টও হতে পারে না, মহাশূন্যে বিলীনও হয়ে যেতে পারে না,—পারে শুধু আর একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে।

রূপান্তরিত শক্তিতে রূপান্তরণের আগের চরিত্র থাকে না।

মৃত্যুতে চেতনা তার আগের সক্রিয় কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে, সে আর এখন 'চেতনা' নয়, সে এখন রূপান্তরিত অন্য কোন শক্তি। (বরফেরই অন্য রূপ বাষ্প, জলের ভিন্ন রূপ বরফ। বাষ্প, জল এবং বরফ, একে অন্যে রূপান্তরিত হয় সহজে, কিন্তু তিনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্।)

তাহলে কি শেষ কথা, শেষ যুক্তিসিদ্ধ পরিণতি, 'সমষ্টি' এক এবং 'একই' 'সমষ্টি'? তা-ই যদি হয়—যুক্তিরে কে করে খণ্ডন?—তাহলে কি 'চেতন' বুদ্ধিমান শক্তির পক্ষে 'অচেতনকে' প্রভাবিত করা অসম্ভব? প্রযুক্তি এবং বলবিদ্যা মারফত এমনটা তো প্রতি-নিয়তই ঘটছে। কাঠুরে যখন গাছ কেটে মাটিতে ফেলে, তখন সে তার চেতন বুদ্ধিমান শক্তিকে কাজে লাগায় অচল বনস্পতিকে ধরাশায়ী করতে। কামার তার চেতন বুদ্ধিমান শক্তির সাহায্যে ভিন্ন রূপের শক্তিকে (আগুন, হাতুড়ি, নেয়াই) ব্যবহার করে, লোহাকে নব রূপ দিতে।

চেতন বুদ্ধিমান শক্তি জানা সবরকম উপযুক্ত পন্থা ব্যবহার করে, উপযুক্ত কাজের জন্যে শক্তিকে রূপান্তরিত করতে। প্রযুক্তি এবং বলবিদ্যা যদি চেতন বুদ্ধি ছাড়াই রূপান্তরণে সক্ষম হয়, তাহলে কি চেতন বুদ্ধিমান শক্তি অন্য শক্তির রূপান্তরণও নিশ্চিতভাবেই ঘটাতে পারে না, আকাঙ্ক্ষিত বিক্রিয়া ঘটিয়ে?

এ প্রশ্ন সত্যিই অবান্তর, কেননা, অমন বিক্রিয়া মানবেতিহাসে নয়ত ঘটেছে, আজো ঘটছে। 'শক্তিদানব-মস্তিষ্ক' যে রহস্য লুকিয়ে রেখেছে, প্রায়ই তো দেখি, চেতনে অথবা অচেতনে মানুষ তা খুঁজে বের করেছে, অবাক্ করে দিয়েছে মানুষকে নতুন জ্ঞান, নতুন শক্তি উপহার দিয়ে। কিন্তু আজ যখন সে-জ্ঞান, সে-শক্তি ব্যবহৃত হয়, নতুন ধর্ম নির্মাণ করার কাজে, অথবা পুরোন ধর্ম 'পালিশ' করার কাজে, তখন তাকে আমি জঘন্যতম আধুনিক দুর্বৃত্তি ছাড়া

আর কিছু বলতে পারি না, কারণ তাতে অজ্ঞ মানুষকে নিয়ে তখন যে এক অসহ্য নির্দয় খেলা খেলা হয়।

* * *

ডাঃ আলবের্ৎ ফ্রাইহের ফন শ্রেঙ্ক-নৎসিংকে বলা হয়, পরা-মনোবিজ্ঞানের (parapsychology) জনক। এ বিদ্যার আজ খুব চল। মিডিয়ামের দেহনিঃসৃত ধোঁয়াটে 'পদার্থের' (tele-অথবা ectoplasm) বর্ণনা দেবার আগেই তিনি জানতেন, কী জাতের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন তাঁকে হতে হবে। ডাঃ শ্রেঙ্ক্-নৎসিং রোমে গেছেন, পারীতে গেছেন, জাল 'বাস্তবায়ন' দেখতে। মিডিয়াম তার দেহের খাঁজে কিছু লুকিয়ে রেখে তাকে বের করতো সেখানকার সভার সামনে, ঝুটো, ভুয়ো সম্মোহিত অবস্থায়। সে সব ছল-চাতুরীর সবটুকুর সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন ডাঃ শ্রেঙ্ক্।

ইভা সি. ছিল ডাঃ শ্রেঙ্কের পরীক্ষার বিষয়। ১৯০৯ সালে নাট্যকার আলেকজাণ্ডার বিসন্-এর বাড়িতে বসতো 'আত্মিক' সভা (séance = আত্মাসম্পর্কীয় গবেষণা)। সে সব সভায় অনেকেই জুটতেন, ডাক্তাররাও আসতেন। পরে লণ্ডনে, মিউনিখেও অমন সভা বসেছে, অনেক গণ্য-মান্য ভদ্রলোকও গেছেন সেখানে। প্রত্যেক বারেই ইভার পোষাক-পরিচ্ছদ, তার ঘরের আলোর ব্যবস্থা, দরজার তালা, দেয়ালের কাঠ-কাগজ, ইত্যাদি সব পরীক্ষা করে দেখা হত। শুরু করার আগে ইভা নিজের দেহ পুরোপুরি নগ্ন করে দেখিয়ে দিতো, সন্দেহ নিরসনের প্রয়োজনে। মাদাম বিসন করতেন স্ত্রীরোগ সম্পর্কিত পরীক্ষা। সে পরীক্ষার হাত থেকে যোনি-পায়ুও বাদ যেত না। 'প্রতিটি অনুষ্ঠানের পূর্বে লেখক পরীক্ষা করতেন, তার কেশ, নাসারন্ধ্র (ফুঁ দেওয়া হত), কান, মুখগহ্বর, দাঁত, বক্ষপুট, পা, নখ, সব,...উদ্দেশ্য, দেখা, মিডিয়ামের দেহের কোথাও কিছু গুটিয়ে গুঁজে রাখা হয়েছে কি না।'

এই রকম কড়া পরীক্ষার পর বেচারা ইভাকে পরানো হত একটা কালো জামা, যে জামা সে আগে কোন দিন দেখেওনি, ছোঁওয়া তো দূরের কথা। ইভার দেহে সাদা কিছু থাকতো না বলে (ব্লাউস কিম্বা একটা রুমালও নয়) কালো পটভূমির ওপরে পাঁশটে সাদা বাষ্পাকার বস্তুকে ভালো করেই দেখা যেত।

ডাঃ শ্রেঙ্ক্-নৎসিং সে-বস্তুর ছবি তুলেছিলেন আলো ফেলে। প্রমাণস্বরূপ, তাঁর Materializations Phänomene গ্রন্থে(৬) ছেপেছিলেন সেই সব গা-ঘিন-ঘিন করা ছবি।

ওই সব মিডিয়ামগত আত্মিক সভায় আসলে ব্যাপারটা কী হত? নথিপত্র থেকে গোটাকতক নজির তুলে দিই,—

> ১৭ই মে ১৯১০।...গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস এবং পেশীর আক্ষেপের সহিত একটি বিশাল এবং ডোরা ডোরা, লঘু, নরম পশমের মত বস্তু গড়িয়া উঠিল আমারই দৃষ্টির সম্মুখে। মনে হইল, বস্তুটি তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে এবং ক্রমে বর্ধিত হইতে হইতে স্থূলতা প্রাপ্ত হইতেছে। সম্ভবতঃ তাহা দুই-তিন ইঞ্চি চওড়া এবং পনেরো-কুড়ি ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা। উত্তমরূপে দেখিবার নিমিত্ত আমি তাহার সাত-আট ইঞ্চি নিকটে গিয়া দেখিলাম, সেই 'বস্তু' যেন সূক্ষ্ম ডোরা-কাটা অতিসূক্ষ্ম ধূসর বর্ণের বস্ত্রের একটি স্তূপ ধীর গতিতে পতিত হইতেছে। মিডিয়ামের মস্তক সঞ্চালনের সহিত বস্তুটিও সঞ্চালিত হইতেছে বটে, কিন্তু মনে হইতেছে তাহা যেন মুখ হইতে বিচ্ছিন্নও হইয়া পড়িতেছে।...আশ্চর্যের কথা, আমরা তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছি না, কেননা তাহার সমগ্র মুখমণ্ডল আবৃত, অতি সূক্ষ্ম মেঘের ন্যায় একটি বস্ত্রসদৃশ বস্তুর দ্বারা। সেই মেঘপুঞ্জ হইতে আজানুলম্বিত ছিল

যেন অনুজ্জ্বল বর্ণের কিছু বস্ত্রখণ্ড। তাহার পর সে বস্তু মেঘের মতই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বাতাসে মিলাইয়া গেল। আবার তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম।...

১লা জুন ১৯১০।...আজিকার 'ছায়ার' অনুজ্জ্বল বস্তু-রূপের আবির্ভাব ঘটিল প্রথমে তাহার ক্রোড় এবং তাহার দক্ষিণ নিতম্ব-দেশের মধ্যবর্তী স্থান হইতে।...সে-বস্তুর সহিত তাহার মুখের যে কোন সম্পর্ক ছিল না, তাহা তাহার মুখের মধ্যে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়াই বুঝিতে পারিলাম।...

২রা সেপ্টেম্বর ১৯১০।...মাদাম বিসন আজ একটি আত্মিক সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। ইভার অঙ্গে একটি রাত্রিবাস ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।... সম্মোহিত মিডিয়ামকে তিনি আদেশ করিলেন, তাহার একমাত্র আচ্ছাদন রাত্রিবাসটিও পরিত্যাগ করিতে। সেই প্রথম দেখিলাম, দেহস্থ বায়ুর বহির্মুখ নিঃসৃতি (tele-or cctoplasm)। তাহা নিঃসৃত হইতেছিল প্রধানতঃ মুখ, স্তনবৃন্ত, যোনি হইতে...সে নিঃসরণের প্রকৃতি ধোঁয়ার ন্যায়, ক্রমে তাহা মেঘের রূপ ধারণ করিল এবং সেই সূক্ষ্ম বস্ত্রসদৃশ বস্তু হইতে মনুষ্যদেহের সর্বপ্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপ প্রকাশিত হইতে লাগিল।...

অধ্যাপক শার্ল রিশে (১৮৫০-১৯৩৫) ওই বছরের ৫ই নভেম্বরের আত্মিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই ফরাসী ডাক্তার উপলব্ধি করেছিলেন, সংক্রমিত পরীক্ষাধীন জীবের রক্তের প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। অ্যানাফিল্যাক্সিসের (anaphylaxis) আবিষ্কর্তা তিনিই। ওই আবিষ্কারের জন্যেই তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সে আত্মিক সভা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, —

> আজ সভারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইল দেহস্থ বায়ুর নিঃসরণ। ···ধূসর বস্তুটির যে সমস্ত স্থানে বেশ ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্থানগুলিতে দেখিলাম যেন এক সিতাভ-রক্তিম উজ্জ্বলতা, শ্বেত শিফনের বস্ত্রখণ্ডের মত।

পারীর প্রায় সমস্ত আত্মিক সভায় সব রকম পণ্ডিত উপস্থিত থাকতেন—অধ্যাপক ফন্টেনের মত গুণিজনও থাকতেন। তাঁরা দেহগত ব্যাপারাদি পরীক্ষা করতেন। মিউনিখের সভায় ডাঃ স্পেখৎ এবং ডাঃ কাফ্‌কার মত অধ্যাপকদেরও আমন্ত্রণ করেছিলেন ডাঃ শ্রেঙ্ক।

এর পর কয়েক বছর নানান রূপের আবির্ভাব ঘটিয়েছে ইভা, ফুটিয়ে তুলেছে পরিষ্কার মুখাবয়ব। সে সব মুখের ছবি তুলে নেওয়াও সম্ভব হয়েছে। পারী এবং লণ্ডনের সন্দিগ্ধমনা ডাক্তাররা মিডিয়ামকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেছেন, তার চামড়ার তলায় দেখতেও কসুর করেননি। পরীক্ষা করেছেন তার নিকট পরিবেশও, কিন্তু তার দেহস্থ বায়ুর প্রবহণ ব্যাহত হয়নি কোন কিছুতেই।

ইভা বড় ঘরের মেয়ে। অর্থের চিন্তা তার ছিল না, টাকা-পয়সাও নিতো না কখনো। দেহস্থ বায়ুর বাস্তব রূপের আবির্ভাব ঘটাতো পণ্ডিত এবং সাংবাদিকদের সামনে। আত্মিক সভায় সমাগত পণ্ডিতদের নামের তালিকা ছোটখাটো নয়—হেগ-এর সোসাইটি ফর সাইকিক স্টাডিজ-এর অধ্যাপক, দাইমুর ভান তুইস্ত, সরবোনের ফিজিওলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষ, অধ্যাপক কুতিয়ে, এমন কি ইংলিশ সোসাইটি ফর সাইকিক রিসার্চ-এর সভা, স্যর উইলিয়াম ক্রুক্‌সের মত পণ্ডিতও থাকতেন। ১৮৬১ সালে থ্যালিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন ক্রুক্‌স্ আর ১৮৭৪ সালে আবিষ্কার করেছিলেন রেডিওমীটার। ব্রিটিশ কমিটি ইভাকে তাঁদের লণ্ডনের ১০ নম্বর হ্যানোভার স্কোয়ারের বাড়িতে ডেকেছিলেন। সেখানকার

আত্মিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল দুর্ভেদ্য বৈজ্ঞানিক বেড়াজালের ভেতর।

১৯২০ সালের ১০ই মে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে চারটে ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়েছিল, তার একটা ছিল স্টিরিওস্কোপিক (সে ক্যামেরায় তোলা ছবিকে ত্রিমাত্রিক বলে মনে হয়)। একটা ছবিতে ছিল বাঁ কাঁধের ওপর একটা ছোট্ট হাত, আর একটায় ছিল আলোকের একটি কম্পমান শিখা।

আটাশে মে'র সভায় ইভার মুখ, মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল। তবু দর্শকদের মনে হল, বস্তুটা বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে কাপড় ভেদ করে। সভায় সন্দেহবাদী, অবিশ্বাসী অনেক ছিলেন, তাঁরাও কিন্তু ইভার ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। ইংলিশ সোসাইটি তাঁদের পত্রিকায় এবং একটি বিশেষ ইস্তাহারে সে ব্যাপারের বিবরণ ছেপেছিলেন।

পারীতে জেনিভার অধ্যাপক এচ. ক্লারাপেডে এবং সরবোনের অধ্যাপক ছ্য ফন্‌টেনে এবং সেই সঙ্গে পারীর নানা হাসপাতালের বড় বড় ডাক্তার ইভার প্রদর্শন দর্শন করেছিলেন। ডাঃ বুর্বঁ সেবারের বিবরণে লিপিবদ্ধ করেছেন,—

> আজ পর্যন্ত যত আত্মিক সভায় আবির্ভাব দেখেছি, তাতে বুঝেছি, সেখানে যে ধরনের আবির্ভাব ঘটে, তার উৎস কোথায়, জীববিজ্ঞানের কোন্ ক্ষেত্রে—তা আমাদের জ্ঞানের সম্পূর্ণ বহির্ভূত।…

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চার্লস্ রিকেট ডাঃ ফন শ্রেঙ্ক-নৎসিংকে লিখেছিলেন,—

> সেই মহৎ এবং অভিজাত পণ্ডিত স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌সের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলি, 'যা বলছি, তার একটি কথারও নড়চড় করবো না'। আমার আগেকার

> সমস্ত পরীক্ষার ফল স্মরণে রেখেই বলছি, সমালোচনাকে সহ্য করতেই হবে, বিজ্ঞানের অঙ্গ সেটা। সময়ে সত্য ঠিকই প্রকাশিত হবে, তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে, তবে তাকে নিয়ে আসতে হবে, কিন্তু সে আনা মূর্খকে দিয়ে, অযোগ্যকে দিয়ে হবে না। যে কিছু দেখেনি, শোনেনি, পরীক্ষা করেনি, এমন কি যত্ন করে নথি-পত্রও উল্টে দেখেনি, তেমন লোককে দিয়ে নৈব নৈব চ। বরং যে পণ্ডিত পরীক্ষার পর পরীক্ষা যে করেছে সত্যনিষ্ঠ চিত্তে, সম্ভাব্যের চেয়ে সত্যে যার মন স্থির, সত্যকে আনবার অধিকার শুধু তারই।…আধিবিদ্যক ক্ষেত্রে যদি এত অসম্ভব, এত অসঙ্গতি থেকে, থাকে তাহলে তার জন্যে তো আমরা দায়ী হতে পারি না।…

ইভার ব্যাপারে নথি-পত্রের নজির যতদূর বলে, তা থেকে পরিষ্কার বলা যায়, ধাপ্পাবাজির কথা টেঁকে না। আরো বলা যায়, ইভা পরীক্ষা দিয়েছে, নানা বিজ্ঞানসংস্থার সামনে আর একশোরও বেশি লোক তার দেহস্থ 'বায়ুর' প্রত্যক্ষ রূপের প্রকাশ দেখেছে এবং স্বীকার করেছে তার বাস্তবতাকে। ডাঃ নৎসিঙের একটা কথা আমার খুব মনে লাগে—ইভা কেন, কিসের প্রয়োজনে অমন অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়াতো? পরিবর্তে তো কিছুই আশা করতো না সে। অমন আরো অনেক মিডিয়ামের ব্যাপারের সাঁচ্চাই সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু ইভার ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। আজো সে বিশেষ আসনে প্রতিষ্ঠিত, কারণ আর কারুর ব্যাপার অমন যত্ন করে, অমন কষ্ট করে নথিভুক্ত করা হয়নি। ইভার ক্ষেত্রে যেহেতু তা হয়েছে, তাই তার ঘটনা পরামনোবিদ্যার বিজ্ঞানভিত্তিক পুঁথি-পত্রে উদাহরণস্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়।

ইভার ব্যাপারে শেষ মন্তব্যটি বাকি আছে। সে মন্তব্য জেনোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিকুস্কার।

> অতএব এ বস্তু ভবিষ্যতের এক গূঢ়-জীববিজ্ঞানের (occult biology) জন্য তোলা থাক। সেই বিজ্ঞানই গবেষণা করবে জীবনরহস্যের গভীরে, খুঁজে বের করবে যোগসূত্র আত্মার সঙ্গে বস্তুর, দেহের সঙ্গে আত্মার, জীবনের সঙ্গে জড়ের। আজ ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি দেহস্থ বায়ুর বাস্তব রূপের আবির্ভাবের পেছনে কাজ করছে আত্মা, ইচ্ছা, ধারণা। তাই আমাদের আশা, অদূর ভবিষ্যতে একদিন দাঁড়াতে পারবো মহারহস্যের দ্বারপ্রান্তে, আভাষ পাবো, কেমন করে সীমাহীন সম্প্রসারণ এবং পূর্ণতার পথে মহাজাগতিক কর্মকাণ্ড সাধিত হয় এবং সমগ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়, বিশ্ব-আত্মার ইচ্ছার সৃজনক্রিয়ার মাধ্যমে।

* * *

দেহস্থ বায়ুর বাস্তবায়নের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন যোগ নেই, যোগ নেই গূঢ়-তন্ত্রের সঙ্গে। সে-'বস্তু' দর্শনসম্ভব, স্পর্শনসম্ভব, তাছাড়া তার ছবি তোলাও সম্ভব ছিল যে। যে-ঘটনা ঘটেছিল, তা নিশ্চয় অভূতপূর্ব, অদ্বিতীয় কিছু নয়। ডাঃ শ্রেঙ্ক্ নৎসিং এবং তাঁর বিজ্ঞানী সহকর্মীদের প্রতিবেদনে সন্দেহ প্রকাশ করছি না, বরং একটা প্রশ্ন করছি,—সেকালে এ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক ছিল না,—কী ধরনের শক্তি ইভার ক্ষেত্রে কাজ করেছিল? আত্মিক সভা-সমূহে ইভা থাকতো সম্মোহিত অবস্থায়, অর্থাৎ চেতনার এমন একটা পর্যায়ে, যেখানে স্বাধীন ইচ্ছার পথ আগেই বন্ধ করা হয়েছে। (দেহস্থ বায়ুর বাস্তব রূপ প্রকাশের প্রয়োজনে) অবচেতনকে এক ধরনের শক্তি বলে কল্পনা করা যেতে পারে, যদিও তা আজো অপ্রমাণিত, তবু। কিন্তু মৃত ব্যক্তিদের শক্তিকে কি কাজে লাগানো সম্ভব? এ অনুমানকে যতটা অসম্ভব মনে হচ্ছে, বোধ হয়

সত্যিই ততটা অসম্ভব নয়। যাই হোক, পরামনোবিজ্ঞানের প্রায়-অকর্ষিত ক্ষেত্রে এ অনুমান শক্তি তত্ত্বেরই যুক্তিসম্মত সম্প্রসারণ। সব রকম শক্তিই যদি একে অন্যে রূপান্তরিত হতে পারে—(অল্প সংখ্যক সম্পূর্ণ স্বীকৃত মতবাদের একটা) —মৃত ব্যক্তিদের চিৎ-শক্তির রূপান্তরণও তাহলে নিশ্চয় সম্ভব।

ধোঁয়াটে দার্শনিক এবং ধর্মীয় ধারণার কথা বাদ দিলে, মৃত্যুর পরে চিৎ-শক্তির কী পরিণতি ঘটে, হাজার হাজার বছর ধরে আমরা সে কথা জানি না। (আত্মা স্বর্গে চলে যায়, অর্থাৎ আত্মাতে আগেই অমরত্ব আরোপ করা হয়ে গেছে।) আধুনিক গবেষণা নাকি অব্যাখ্যাত রহস্যের কৃষ্ণ-যবনিকা উত্তোলন করলেন বলে, আর ইতিমধ্যেই যা সে আবিষ্কার করেছে, তাতে মনে হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির চেতনা (অহং, চিৎ-শক্তি) মরে যায় না। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে, সেই ছোট্ট মেয়ে কনচিত্তার জিবে যে 'পবিত্র রুটির অলৌকিক দর্শন' পাওয়া গিয়েছিল, সে রুটির দর্শনের পেছনে কাজ করেছিল কোন মৃতব্যক্তির চিৎ-শক্তি? অমন ব্যাপারকে কাজে লাগানো আজ কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে?

প্রাণচাঞ্চল্যের সাময়িক বিরতি (suspended animation) ঘটে শ্বাসকেন্দ্রের (অ্যাসফিক্সিয়া) পক্ষাঘাতের দরুন, যখন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, ঘটে রক্তপ্রবাহ-রোধজনিত হৃৎপেশীর বৈকল্য (myocardial infarction) হেতু, ঘটে আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত (trauma) আঘাত থেকে, বিষক্রিয়া থেকে এবং আরো নানা কারণ থেকে। জাঁ বাপ্তিস্তে দালাকুর্ (৭) বলেছেন, এমত অবস্থায় আবার যারা প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছে, তারা বলেছে, 'অন্য জগতে', সাময়িক বাসকালে তাদের যে চেতনা ছিল, সে-চেতনা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বলেছে, 'জীবৎ' চেতনার সঙ্গে সে-চেতনার কোন সাদৃশ্য নেই। বলেছে, সে-জগৎ যেন কালহীন, ছন্দে-বর্ণে ভরা স্পন্দমান

সে-জগৎ। সে-জগতে অগণিত 'চেতনা' যোগাযোগ করছে একে অপরের সঙ্গে, করছে আলাপচারী। যদিও দেহহীন, সংবেদ-ইন্দ্রিয়াদি বর্জিত, তবু একে অন্যকে দেখতে পায়, আদান-প্রদান করে স্মৃতির। 'ওপারের' সবকিছু এমনই সীমাহীন সুন্দর যে 'ওখান' থেকে যে ফিরে এসেছে, সেই বলেছে, মরদেহে হঠাৎ ফিরে এসে জীবনটাকে মনে হয়েছে ভারী বোঝা, বিরক্তিকর।

ডাক্তাররা বলেছেন, 'পুনর্জীবিত' ব্যক্তিদের দেওয়া 'ওপারের' বিবরণ, অবাস্তর, অর্থহীন প্রলাপোক্তি, কেননা প্রাণচাঞ্চল্যের বিরতিকালেও মস্তিষ্কের চেতনার স্তরগুলি সচেতন থাকে। সেই সব স্তরের নিচের তলা থেকে তুলে চেতন মনের ওপরে আনা রূপকথার জগতের যত আজগুবি ছবি, ওই সব বিবরণ।

ডাক্তারবাবুদের বক্তব্য যদি ঠিক হয়, তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু ভয়াবহ। আমি নেবেছি নিচের তলার ওই কাঠের সিন্দুকের ভেতরে। আমার রক্তে-মাংসে পোকা কিলবিল করছে, কিন্তু আমার মস্তিষ্কের নিচের তলার স্তরগুলো তখনো সক্রিয়। কী বিশ্রী ব্যাপার! কে জানে, কতক্ষণ তারা সক্রিয় থাকে? হয়তো, যতক্ষণ না চিৎ-শক্তিসমূহের রূপান্তর ঘটে ততক্ষণ! তবু ভালো যে সাময়িক বিরতির চেয়ে সে-রূপান্তর ঘটে আরো তাড়াতাড়ি আসল মৃত্যুর ক্ষেত্রে।

কিন্তু যারা মরে গেছে অনেক কাল আগে, তাদের চিৎ-শক্তির কী পরিণতি ঘটেছে?

* * *

১৯৬৪ সালে সুইডেনবাসী ফ্রীদ্‌রিখ্‌ য়ুয়ের্গেন্‌সন্‌ বলেছিলেন, বহুদিন আগে মৃত মানুষের কণ্ঠস্বর তিনি ধরতে সক্ষম হয়েছেন, মাইক্রোফোন এবং টেপের সাহায্যে।

পরামনোবিদ্যায় সুপণ্ডিত ডাঃ রাউদিভে কন্‌স্তান্তিন্‌কে ব্যাপারটা

আকৃষ্ট করে। জন্ম তাঁর লাৎভিয়ায়, ১৯০৯ সালে। অল্প বয়সেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি। লেখাপড়া করেছিলেন পারীতে আর মাদ্রিদে। সেখানে ওর্তেগা ই. গাসেৎ-এর (১৮৮৩-১৯৫৫) সঙ্গে সাক্ষাৎকারই তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। ('আত্মা' ব্যক্তিত্বের মেরুদণ্ড—নৃবিজ্ঞানগত এ-তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন ওর্তেগা।)

য়ুয়ের্গেন্‌সনের দাবিটিকে রাউদিভে পরীক্ষা করলেন চার বছর ধরে। সম্পূর্ণ শব্দরোধী ধ্বনি-গ্রহণ কক্ষ তৈরী করিয়ে চুম্বকিত রেকর্ড দিয়ে কাজ শুরু করলেন। সে-রেকর্ডে মাইক্রোফোন ইত্যাদির সামান্যতম শব্দও ব্যতিচার সৃষ্টি করিতে পারে না।

তাঁর সমস্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করলেন।

সে সমস্ত পরীক্ষাই করা হয়েছিল কঠোর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে। সে-পদ্ধতিকে সমর্থন করেছেন শত শত দর্শক, তাঁদের ভেতর ছিলেন, ফ্রাইবুর্কের ইনস্টিট্যুট ফুয়ের গ্রেন্‌ৎস্‌ভিসেন্‌শাফতেন্-এর অধ্যক্ষ, অধ্যাপক হান্‌স্ বেন্দের, পদার্থবিৎ ডাঃ জি. রোয়েনিকে, ডাঃ জে. ব্রিবের্, ডাঃ আর্নল্ট্ রাইঙ্কে, সুইস্ পরামনোবিদ্যা সংস্থার সভাপতি, ডাঃ হান্‌স্ নায়েগেলি, অধ্যাপক আতিস্ তাইখ্-মানিস, অধ্যাপক ভের্নের ব্রুন্নের—জুরিখের একজন শল্যচিকিৎসক, তারপর অধ্যাপক আলেক্‌স্ শ্লাইডের, মার্কিন অধ্যাপক, ওঅল্টার এচ্. আপহফ, ডাঃ জুল আইজেনবাণ্ড, ডাঃ ভিলহেলমিন সি. হেন্নেকুইন, ডাঃ আর. ফাৎসের্ এবং আরো অনেকে।

কনস্তান্তিন রাউদিভে রেকর্ড করেছিলেন ৭২০০০ কণ্ঠস্বর। সুইৎসারল্যাণ্ডের আইদ্‌গেনোয়েস্‌সিশেন্ তেক্‌নিশেন হখ্‌স্কুল-এর পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক বলেছেন,—

> কণ্ঠস্বরের ব্যাপারে পদার্থবিদ্যার আপাতত কোন আপত্তি নেই। আরো অনুসন্ধানের ফল আমাদের লক্ষ্য

করতে হবে অসীম ধৈর্যে, তাতে তড়িৎ-চুম্বকীয় জ্ঞান আমাদের বাড়বে।

বাড়িতে বসে যে কেউ কণ্ঠস্বর ধরতে পারেন, খরচ তাতে সামান্যই। পদ্ধতিটা মোটামুটি এই রকম। একটা সময় আর একটা ঘর ঠিক করুন। বাইরের শব্দ ঘরে যত কম ঢোকে তার ব্যবস্থা করুন। এবার, একা অথবা সঙ্গী-সাথী নিয়ে টেপ্-রেকর্ডারের মাইক্রোফোন তুলে মৃত ব্যক্তিদের কাউকে ডেকে তাঁকে আসতে বলুন। বলুন, তাঁর আগমন ঘোষণা করতে। আপনার রেকর্ডার যেন চালু থাকে। আধ মিনিট অপেক্ষা করে আবার ডাকুন। সমস্ত ব্যাপারটা আধ ঘণ্টার বেশি চালাবার দরকার নেই।

এবার টেপটাকে উল্টো গুটিয়ে শুনুন, শুনতে পাবেন, বিভিন্ন ভাষায় তাড়াতাড়ি বলা কত কথা। আপনার নিজের কথা, বাইরের শব্দ ইত্যাদির জগাখিচুড়ির ভেতর থেকে নানা ভাষায় দ্রুত উচ্চারিত শব্দসমষ্টিকে প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট করে উদ্ধার করতে হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখবেন—শব্দ, কথা, কিম্বা বাক্যের অংশ বলা হয়েছে খুব আস্তে, ফিসফিস করে।

যা শোনা যাবে, লিখে রাখবেন, তা না হলে কথা কিম্বা ভাষা বুঝতে পারবেন না। সব চেয়ে ভালো হয়, স্পষ্ট, পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত শব্দগুলোকে যদি আর একটা টেপে তুলে নেন, তাহলে অপেক্ষা করার সময়ে যেখানটা ফাঁকা গেছে, অথবা যেখানটায় বাইরের শব্দ এসে পড়েছে, সে সবগুলো বাদ দিয়ে আসল কথাটা শুনতে, বুঝতে সুবিধে হবে। কথাগুলোকে যে পরিষ্কার সাধারণ কথার মত বুঝতে পারবেন, সে আশা করবেন না। আকাশে-বাতাসে যে লাখো শব্দের ভিড়! দেখবেন, খাস্তখুড়ির দিদিশাশুড়ির ডাকসাইটে সুন্দরী সৎমায়ের কোকিল কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে

পাবেন, ভবানী পাঠকের বজ্র গম্ভীর চাপা কণ্ঠস্বর, সেটা শেষ হবার আগেই হয়তো ভেসে আসবে আয়েশার ভরাট মধুর কণ্ঠ, তার পায়ে পায়েই হয়তো উঠবে, বিরাটদেহী 'স্বর সারেণ্ডার নট'এর উদাত্ত গম্ভীর নিনাদ, আশ্চর্য হবার কিছু নেই, যদি তার পাশেই শুনতে পান, আপনারই মৃত বন্ধু, নিখিলেশের মেয়েলি গলার ডাক। মজা দেখবেন, কেউ একজনও অপরের কথা শেষ করতে দিচ্ছেন না। ওপারেও সবাই বোধ হয় বকবক করতে ভালোবাসেন!

কণ্ঠস্বর ধরবার আরো একটা ভালো উপায় আছে। আপনার টেপরেকর্ডারের তারটাকে রেডিওর সঙ্গে লাগিয়ে কোন দুটো 'প্রেরকের' মাঝখানে সুর বাঁধুন। এতে অসুবিধে একটা আছে, আবহ ব্যতিচারের কারণে কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যেতে পারে, আর সুবিধে হচ্ছে, বাকি সমস্ত ব্যতিচারজনিত উৎপাতের প্রভাব মাইক্রোফোনের ওপর পড়বে না। প্রমাণ পাওয়া গেছে, আবহ-ব্যতিচার সত্ত্বেও আবহমণ্ডল থেকে কণ্ঠস্বর ধরা যায় (১০)।

*　　　*　　　*

গবেষণাকালে ডাঃ রাউদিভের ঘরে কোন শব্দ ছিল না। যে সব পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরাও নীরব ছিলেন। মৃত আত্মীয়-বন্ধুর গলা চেনা গেল। যদি অতি অথবা অবচেতন ধরনের কোন শক্তির কারণে এ ব্যাপার ঘটে থাকে, তাহলে তা ঘটেছে অচেতন অবস্থায়, তবে তাতে কিছু এসে যায় না, কেননা সে ক্ষেত্রেও, চিৎ-শক্তি যে রূপান্তরিত হয়েছে, প্রাযুক্তিক মিডিয়ামের টেপের শক্তিতে, এটা তারই প্রমাণ।

রেকর্ড করা প্রায় ১০০, ০০০ কণ্ঠস্বর রাখা আছে পৃথিবীর নানা জায়গায়। তার মানে, সাক্ষী-প্রমাণ যথেষ্টই আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যাখ্যা করা যায় কেমন করে? এতে জটিল যেটুকু, সেটুকু হচ্ছে ওই অতিপ্রাকৃত কণ্ঠস্বর যে সত্যিই মৃত ব্যক্তির, বৈজ্ঞানিক

নিশ্চয়তা দিয়ে সে কথা বলা যাচ্ছে না। এটা অবশ্য কল্পনা করা যেতে পারে, যে জীবিত ব্যক্তির চিৎ-শক্তি (সেই সঙ্গে অব- অথবা অতিচেতন) হয়তো ইলেকট্রনিক যন্ত্রকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে। এমনও হতে পারে, এ পরীক্ষায় যে একেবারেই কোন অংশ গ্রহণ করছে না, কোথাও হয়তো তেমন কেউ রয়েছে যে মুক্ত করছে অচেতন শক্তিকে এবং সেই শক্তিই তড়িৎ-চুম্বক স্পন্দনে রূপান্তরিত হয়ে টেপের ওপরে অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে। সে কণ্ঠস্বর মৃতেরই হোক বা জীবিত সমসাময়িক মানুষের আলাপচারীর টুকরোই হোক, আমার তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। দুক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়, অচেতনভাবে প্রভাবিত করবার ক্ষমতা চিৎ-শক্তির আছে।

আত্মার জগৎ থেকে কণ্ঠস্বর আহরণ চলছেই।

মরণোত্তর পরীক্ষার ইতিহাসে এই প্রথম এমন একটি বস্তু আমাদের হাতে এসেছে, যার বৈশিষ্ট্য 'পুনঃসজ্ঘটনে', এবং এইটিকেই তার অস্তিত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে ধরে নেওয়া উচিত। অতএব, এ বিষয়ে সুসম্বদ্ধ, গভীর গবেষণার সম্ভাবনা জেগেছে। এই গবেষণার ফল থেকে বলা যাবে, রেকর্ডভুক্ত কোন্ কথাটি ঠিক, কোন্‌টি বেঠিক। বিজ্ঞানের প্রকৃত ভাষা সত্য তথ্য।

*　　*　　*

প্রকৃতপক্ষে, প্রাণচাঞ্চল্যের সাময়িক বিরতির অভিজ্ঞতা যারা লাভ করেছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা অতিপ্রাকৃত কণ্ঠস্বরের খোঁজ করেও মরণোত্তর-চেতনা সম্পর্কিত প্রশ্নের চূড়ান্ত আলোচনা-মীমাংসা শেষ হয়ে যায়নি। সংবেশক অভিভাবের সাহায্যে সংবিষ্ট মানুষকে তার যৌবনেই শুধু নিয়ে যেতে পারে না, গর্ভে অবস্থানপূর্ব-জীবনেও তাকে নিয়ে যেতে সক্ষম।

মিউনিখের তরুণ সংবেশক থর্ভাল্ট দেৎলেফ্‌সেন-এর(১২) কাছে নানা আত্মিক সভার নিখুঁত বিবরণ আছে, সেখানে সংবিষ্টকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোলের ছেলের অবস্থায়, তারপর আরো অতীতে, তার জন্মপূর্ব অবস্থায়। জানা গেছে তার পূর্বজন্মের কথা। এমনি করে তার দুটি-তিনটি পূর্বজন্ম পরের অতীতকেও জানা গেছে। জানা গেছে, তার সে সব জন্মের নাম-ধাম-গোত্র। দেখা গেছে, কোন কোন জন্মে তার লিঙ্গেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সংবিষ্ট তার পূর্ব পূর্ব জন্মের নাম বলেছে, বলেছে জন্মতারিখ, কথা বলেছে যে দেশে জন্মেছিল সেই দেশের ভাষায়, বিবরণ দিয়েছে তার মৃত্যুর। সে বিবরণ পড়ে পাঠকের হাড়ে কাঁপন ধরে যায়, ফলে গবেষণাটা সত্যিই ভুতুড়ে হয়ে ওঠে।

মেরী বের্ন্‌স্তাইন শ্রীমতী রুথ সিমন্‌স্‌-কে সংবেশিত করে প্রথমে নিয়ে গেছেন তাঁর চার বছর বয়সে, তারপর ক্রমে ক্রমে তিন, দুই, এক বছর বয়সে। বের্ন্‌স্তাইন শ্রীমতী সিমন্‌স্‌কে ভাবতে বলেন, আরো দূর অতীতের কথা, তাঁর ইহজন্মেরও আগেকার কথা। হঠাৎ তিনি শুরু করলেন ভিন্ন নামে কথা বলতে, অন্য এক জন্মের নামে। সে নাম ব্রিডী মার্ফী, জন্মস্থান আয়ার্ল্যাণ্ড, জন্ম-কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। রুথ সিমন্‌সের প্রতিটি কথা বিধৃত হয়েছে টেপ-রেকর্ডারে। তারপর, তার ভাষা (গেলিক), গির্জের রেজিষ্ট্রি, গ্রামের নথিপত্রাদি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রুথ (পূর্বজন্মের নাম ব্রিডী মার্ফী) যা বলেছেন, সব ঠিক। স্থান, কাল, পাত্রের বিবরণে কোথাও এতটুকু ত্রুটি, এতটুকু বিচ্যুতি নেই। এ কথা নিঃসন্দেহ যে রুথ সিমন্‌স্‌ সে সব পুরোন নথি দেখেননি। আর, টেলিপ্যাথি মারফতও সে সব কথা জানার উপায় নেই, কেননা 'দূরসংবহন' যে করবে, তাকে ধূলো ঘেঁটে নথিপত্রের নাগাল পেতে হবে তো, তা তো কেউ করে নি।

রুথ সিমন্‌স্‌ তাঁর সমাধির ভেতর গত শতাব্দীর মাঝখানে 'মূর্তি ধরে' গিয়ে সব দেখে এলেন? কথাটাকে ঠিক মানা যায় না, কল্পনাটাকে টেনে-হিঁচড়ে অত লম্বা করার দরকার কি, তাছাড়া আজকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে সে যে বড় বেশি চাওয়া হয়ে যাবে। পদার্থবিৎ জর্জ ক্রিস্তফ লিখ্‌তেনবের্ক্‌ (১৭৪২-১৭৯৯) বলেছেন, তবু, 'যাকে ধরে নেওয়া হয় ঠিক বলে, তাকেই পরীক্ষা করা প্রয়োজন বেশি করে'।

এ কথা পুরোন, অনেক পুরোন। এসব ব্যাপারে যাঁদের আগ্রহ বেশি, উৎসাহ বেশি এ সবের ব্যাখ্যায়, বস্তুবাদীদের তাঁরা এসব কথা বলে সময় নষ্ট করেন না। বস্তুবাদীরা যে সব কিছুকে ধরা-ছোঁওয়ার আওতায় পেতে চান, প্রমাণ করতে চান মেপে, জোপে, অঙ্ক কষে। ভালো কথা, বস্তুবাদীদের কিন্তু 'আমার' ত্রিত্ববাদে, তথা আত্মা-বস্তু-শক্তি তত্ত্বে একমত হওয়া উচিত, কেননা, তাঁদের জগৎ-চিন্তার কেন্দ্রে যে ওই ত্রয়ী স্পন্দমান। আমার খেলনা-ঘোড়ার রাশ আলগাই রেখে দেবো, মরণ পানে ছুটবো না, কারণ তাকে যে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছেন, ভের্ন্‌হের ফন ব্রাউনের মত মনীষী(১৪), বলেছেন,—

> বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে, নিশ্চিহ্ন হইয়া কিছুই লুপ্ত হয় না। প্রকৃতিতে ধ্বংস নাই, আছে রূপান্তরণ।

আত্মার ধর্মীয় ব্যাখ্যার (আত্মা অমর) চেয়ে তার বাস্তব ব্যাখ্যাকেই বেশি উপযুক্ত মনে করি, অর্থাৎ বলতে চাই, মৃতব্যক্তির চিৎশক্তি আমাদের চতুর্মাত্রিক জগতের অন্তর্গত অন্য কোন রূপান্তরিত শক্তি হতে পারে। 'পরজগতে'র শক্তি যদি ইহজগতে উপলব্ধ হতে পারে, তাহলে উল্টো দিক দিয়ে ইহজগতের শক্তিও পরজগতে নিশ্চয় উপলব্ধ হবে। আমাদের চেতন অবস্থা চতুর্থ

মাত্রায় (fourth dimension), তথা কালের প্রকাশমানতায় সীমাবদ্ধ। এমন সম্পর্ক বোধ হয় পরলোকে সম্ভব নয়।

* * *

জগদ্বিখ্যাত ফরাসী আলোকদ্রষ্টা বেলিনে-এর বয়স পঞ্চাশ। সালে তাঁর কুড়ি বছরের ছেলে, একমাত্র ছেলে মিশেল মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায়। বেলিনে তাঁর আলোক-দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে প্রায় দুবছর ধরে চেষ্টা করলেন, মিশেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। বৃথা চেষ্টা। কিন্তু হঠাৎ তিনি একটা 'অদৃশ্য নৈকট্য' অনুভব করতে লাগলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন, 'তৃতীয় শ্রবণ' অথবা 'অশ্রুত শ্রবণ' বলে। বেলিনের ভয় হল, শোকে হয়ত কোন মায়া-প্রভাবের শিকার হয়ে পড়েছেন। মিশেলের সমস্ত কথা তিনি টেপে তুলে নিতে লাগলেন। তারপর ১৯৭৩ সালে সেই সব কথা একটি বইয়ের (১৪) আকারে বের করলেন। সে বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন ইন্‌স্তিতুৎ দ্য ফ্রাঁসের মার্সেল গাব্রিয়েল, তাছাড়া আরো নব্বইজন কলা এবং বিজ্ঞানজগতের পণ্ডিত তাঁদের মতামত দিয়েছেন, তাঁর পরীক্ষা সম্পর্কে।

সে নথি থেকে পরলোকের চতুর্থমাত্রিক কালের অন্তহীনতার কথা পরিষ্কার বোঝা যায়।

৮ই এপ্রিল, সকাল আটটা।

বেলিনে—মিশেল, ওখানকার ব্যাপারটা কেমনতরো ?

মিশেল—এটা আর একটা জগৎ, একটা স্বপ্ন, যাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সবই এখানে স্বচ্ছ, সুনির্মল। গতি আছে এখানে, আর আছে চিন্তন-মনন। পার্থিব ভালো-মন্দ এখানে অনুপস্থিত। এ যেন এক ধরনের গৃহহীনতা, যেন অসংখ্য মাত্রা এবং স্পন্দনে একটা স্বপ্ন। ···তোমাদের হিসেবের কাল, যেমনটি এই মুহূর্তে

তুমি ভাবতে পারো, সে কাল এখানে অর্থহীন, হাস্যকর।
এইটুকুই আমি বলতে পারি।

যদি কখনো ইহলোক থেকে পরলোকে চিৎশক্তির প্রেরণ সম্ভব হয়, তাহলে আমরা সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য চাইতে পারবো। কারণ, পরলোকবাসীরা বাস করে কালহীন মাত্রায়, তাদের জীবন কালের বাঁধনে বাঁধা নয় বলেই মনে হয়।

পদার্থবিদ্যার ধারণায় এ সম্ভাবনা যথেষ্ট বর্তমান। শক্তির পরিবর্তনীয় অবস্থায়—ধরুন, মৌলিক কণানিচয়ের কথা, যারা একে অপরে রূপান্তরিত হয়, যথা নিউট্রন থেকে প্রোটনে, ইলেকট্রন থেকে নিউট্রিনোতে—এদের জীবৎকাল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এদের অনেকের জীবন এতই ক্ষণস্থায়ী যে তাদের থাকাই উচিত ছিল না। পজিট্রন অথবা সিগমা-কণার জীবৎকাল এক সেকেণ্ডের $\frac{১}{১০০০০০০^{৩}}$ ভাগ। সে জীবন কি কল্পনাসাধ্য? অক্রিয় পাইয়নএর (neutral pion) জীবন কাঁটায় কাঁটায় $১০^{-২৫}$ সেকেণ্ড আর গতিহীন অবস্থায় বেচারা নিউট্রিনোর জীবনের স্থায়িত্ব একেবারেই নেই (গতিহীন ভর = rest mass = 0)। কিন্তু সেই নিউট্রিনোই যদি আবার গতিশীল হয়, তাহলেই তার জীবন ফিরে আসে।

অবিশ্বাস্যরকম ক্ষণস্থায়ী জীবন হওয়া সত্ত্বেও মৌলিক কণাদের ভেতর ঘুমিয়ে থাকে $১০^{১২}$ ইলেক্ট্রন-ভোল্ট শক্তি। কত সৌরমণ্ডল ভেদ করে তারা ছুটে চলে মহাবিশ্বের তেপান্তর পেরিয়ে, মাইঅন আর নিউট্রিনোর রূপ নেবে বলে—সেকেণ্ডের শত, সহস্রতম ভাগে

চল্লিশ বছর আগে পদার্থবিদ্‌দের ধারণা হয়েছিল, পরমাণুগর্ভের ক্ষুদ্রতম কণিকাটিকে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। আজ তাঁরা জানেন যে পরমাণু কেন্দ্রের চেয়েও ক্ষুদ্রতর একটা অবপারমাণবিক (subatomic) জগৎ আছে এবং সেখানে এত শক্তি আছে যে যাকে

আমরা 'জায়মান শক্তি' বলে কল্পনা করতে পারি, তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি।

কালের ধারণা ভেঙে ভেঙে যায় সে জগতে। পদার্থবিদ্ আজও জানেন না, কোথায় কেমন করে বস্তুর সেই আদি নির্মাণকণা, পরমাণুর আবরণ, ইলেক্‌ট্রনকে শ্রেণীভুক্ত করবেন। গেরাল্ট ফাইনবেক্ অঙ্কশাস্ত্র মারফৎ যাদের প্রমাণ করেছেন, আলোকের চেয়ে দ্রুতগতি সেই ট্যাকিয়ন-ট্র্যাডিয়ন-লাকসিয়নদের কাছে কালের সমস্ত ধারণা নিঃসন্দেহে ভেঙে খান খান হয়ে যায়। ওরা আমাদের স্বাভাবিক আদিকণাসমূহের ঠিক উল্টো পথে চলে যে।

যখন তারা আলোর গতির নাগাল ধরে তখন অসীম ভরের সঙ্গে অসীম শক্তির বিকাশ না করে—আইনস্তাইন যেমন বলেছিলেন—দ্রুত ধাবনের সঙ্গে তারা ভর এবং শক্তি হারিয়ে ফেলে। যা সত্যিই ধারণার অতীত, তা হল, আলোর গতি এদের গতির নিম্নতম সীমা, কিন্তু তার ওপরে গেলেই তারা আলোর গতির শতপরার্ধগুণ দ্রুততর গতিতে পৌঁছে যায়। আন্তর্নাক্ষত্র যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সময়ের কল্পনা যদি ইতিমধ্যেই ঝাপসা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আলোর চেয়ে দ্রুততর গতিবিশিষ্ট কণাসমূহের কথা ভাবতে গেলে তো সে কল্পনা হাওয়া হয়ে যাবে। এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক ধারণা যে কাজের পেছনে কারণ থাকবেই। এখানে কিন্তু সবই উল্টো। যে-কণা আলোর চেয়ে দ্রুততর গতিবিশিষ্ট, তার ক্ষেত্রে 'আগে' এসে উপস্থিত হয় ঘটনা, কারণ আসে তার 'পেছনে'। কিছু একটা ঘটে চলেছে, কিন্তু আমরা জানি না কী সেটা।

তাই পদার্থবিৎ সমাজ যেমন অপরাবস্তুর* (antimatter) অস্তিত্ব স্বীকার করেন, আমরাও তেমনি দাবি করতে পারি, দূর

---

* যে পরমাণুর বস্তুপিণ্ড শুধু মাত্র অপরাকণার (antiparticle) সমষ্টি দিয়ে তৈরী। সে-বস্তুপিণ্ড স্বাভাবিক বস্তুপিণ্ডের সম্মুখীন হলে দুটোই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

ভবিষ্যতে একদিন একটা অপরাবস্তু দেখা দেবে, যাতে প্রকাশিত হবে 'বিপরীত কাল' (counter-time), আমাদের 'স্বাভাবিক কালের' বিপরীতে। তখন তো তাহলে—কেমন করে বোঝাই ?—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান থাকবে না। ভবিষ্যতের স্মৃতি উন্মোচিত হয়ে চলেছে, এখনই, আজই, এই মুহূর্তে! কালের ধারণা পরিণত হচ্ছে চেতন অবস্থার আধ্যাত্মিক প্রকাশে। এ প্রসঙ্গে যদি আজো আমরা চিৎ-শক্তির কথা উচ্চারণ করতে পারি···

যেহেতু মৃতের চিৎ-শক্তির অস্তিত্ব কালের বাঁধন মুক্ত, আর জাগতিক চিৎ-শক্তি তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম, তাই ভবিষ্যদ্বাণীর রহস্যও উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। আজো যা নিছক প্রকল্প, ভবিষ্যতে তা যে প্রাযুক্তিক গবেষণায় প্রমাণসিদ্ধ হবে, তাই নয়, তাকে কাজেও প্রয়োগ করা যাবে। 'স্বীকৃত অনুমান' হিসেবে প্রকল্পনিচয় সমস্ত উন্নতির প্রাথমিক শর্ত। তবে, সে কথা আলোচনা করতে বুকের পাটা একটু চওড়া হওয়া দরকার। আমার বুকের পাটা কিছু কম 'চওড়া' নয়।

ধরা যাক, যে কোন কারণেই হোক, কোন 'পরলোকবাসী' আত্মা (চিৎ-শক্তি) কোন একজন মানুষের অথবা এক সঙ্গে অনেকের (জনসমষ্টি, দেশ, ধর্ম, রাজ্য) আচরণকে প্রভাবিত করতে উৎসুক। তার কালহীন দেশ ছেড়ে যোগাযোগ স্থাপন করবে জাগতিক কোন চিৎ-শক্তির সঙ্গে। আবার, এর ঠিক উল্টোটাও কল্পনা সম্ভব। ইহলোকের কোন চিৎ-শক্তি (যোগীর ছাড়া আর কার হবে?) কোন বিশেষ অবস্থায় পরলোকের কালহীন কোন চিৎ-শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। মৃত বন্ধুর চিৎ-শক্তির কাছ থেকে সে জেনে নিতে পারে, 'ভবিষ্যতে' কী ঘটবে। ইতিহাসের জ্ঞান থেকে সে জানে, সে চিৎ-শক্তি যা বলেছে, তা এখনো ঘটেনি, অতএব তাকেই সে প্রচার করে ('ভবিষ্যৎ বাণী' বলে) বলবে, ভবিষ্যতে ঘটবে।

আপাত সম্ভাব্যতাবিরোধী হলেও ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্ঘটনকে বন্ধ করাও যায় না, প্রতিরোধ করাও যায় না 'কখনো'। অতখানি পুণ্যি কোন সাধু-সন্ন্যেসীরই নেই। (কথাটা আমাদের কানে যেন কেমন কেমন ঠেকে। ভারতবাসী যে ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বামা খেপা, বিশুদ্ধানন্দদের দেখেছে। কত অবশ্যম্ভাবীকেই তো শুনি, তাঁরা ঠেকিয়েছেন, চিরকালের জন্যে না হলেও সাময়িকভাবেও,—অনুবাদক।)

মানুষ মরে যায়। তার চেতনা চলে যায় 'কালহীন রাজ্যে', শক্তির রূপ ধরে। সে রাজ্যে বসে সে 'দেখছে', তার ছেড়ে-আসা গ্রাম বন্যাপ্লাবিত। কিন্তু সে-ঘটনা তো তার জীবদ্দশায় ঘটেনি, তাহলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে ঘটবে। যে-চেতনা মৃত্যুর পরে 'কালহীন' হয়ে পড়েছে, তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, ও-দুর্ঘটনার তারিখ কবে নির্দিষ্ট হয়েছে। পরোলোকগত 'আত্মার' (শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও) তো মর্তবাসী পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধুর সঙ্গে এখনো যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। সে চেষ্টা করে, ফেলে আসা পৃথিবীর আত্মীয়-স্বজনের চিৎ-শক্তিকে প্রভাবিত করতে, ভবিষ্যতের দুর্ঘটনার কথা জানাতে, সাবধান করে দিতে।

নিত্যদিনের কাজে বাঁধা মর্তবাসী তার মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে তো নিয়ন্ত্রণ করতে শেখেনি আর, মস্তিষ্ক ছাড়া আর কেউ তো সে-অলৌকিক প্রভাব অনুভব করতে পারে না, 'চাক্ষুষ' করতে পারে না, সে-ভবিষ্যৎ ঘটনার সঙ্ঘটন, তাই শক্তির রূপান্তরণের ফলে বিকিরিত পরলোকের স্পন্দন তার কাছে পৌঁছায় না। পরলোকবাসীকে তাই তার প্রভাব উপলব্ধি করাতে হবে মিডিয়ামের সাহায্যে (মিডিয়ামের মানসিক শক্তি যে পরলোকের স্পন্দন গ্রহণে শিক্ষিত)। সমাধিস্থ অবস্থায় (পরামনঃশক্তি জাগ্রত করবার উপযুক্ত অবস্থা সমাধি) চিৎ-শক্তির ক্রিয়ার মাধ্যমে মিডিয়াম দেখতে পায়, একটা গ্রাম

প্লাবিত হয়ে গেল, কিন্তু সে ঘটনা কবে ঘটলো (ঘটবে), তা তো সে জানে না। ব্যাপারটা ন্যায়সঙ্গত, কারণ পরলোকবাসী তার কালহীন রাজ্যে বাস করেও সে কথা জানে না। অতএব, যদি কোন মিডিয়াম (প্রচারক, পুরোহিত অথবা ভবিষ্যদ্বক্তা) প্রচার করতে শুরু করেন, 'প্রার্থনা কর, মন-প্রাণ ঢেলে তাঁকে ডাকো, না হলে তোমাদের গ্রাম বন্যায় ভেসে যাবে!'—তাহলে, সে-বাণী ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু বক্তব্যের সত্যতায় ত্রুটি আছে, কেননা আজ না হোক কাল, বন্যায় গ্রামটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই। তা যদি না হত, তাহলে কালহীন পরলোক-বাসীরা ও দুর্ঘটনার কথা ঘোষণাই করতো না।

* * *

আর একটা ঘটনা দেখা যাক্। শক্তির রূপান্তরণ মারফত, ধরা যাক্, কোন যোগী তাঁর মানসিক শক্তিকে পরলোকে পাঠালেন। সেখানে তিনি এমন সব ঘটনা 'প্রত্যক্ষ করলেন' যা ঘটবে কোন এক 'ভবিষ্যৎ দিনে', কারণ তাঁর জানা ইতিহাসের কালে তারা ঘটেনি। কথাটাকে ঘুরিয়ে বললে, বলতে হয়, অলোকদ্রষ্টা সে-মিডিয়াম জানেন না, পাঁজির ঠিক কোন তারিখে সে-অঘটন ঘটবে। তবে একটা কাজ তিনি করতে পারেন, যদি তিনি সে ঘটনাকে নিখুঁত করে 'দেখে' থাকেন তাহলে মোটামুটি একটা সময় সীমা বেঁধে দিতে পারেন। কিন্তু একটি কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়, যত বড় যোগীই তিনি হন না কেন। তাঁর 'দেখা' ঘটনার সঙ্ঘটন তিনি কিছুতেই বন্ধ করতে পারবেন না! অনির্দিষ্ট কোন ভবিষ্যৎ দিনে ঘটবেই, এমন কোন কথা যদি না থাকতো, তাহলে পরলোকের কোন চিৎ-শক্তি সে-প্রেরণা পাঠাতোও না, এবং জাগতিক চিৎ-শক্তি তা 'দেখতেও' পেতো না। ইতিহাসের পাতায় সে ঘটনার কথা থাকলে তো সে হত বাসী খবর। ভৌত এবং আধিবিদ্যক প্রকল্প থেকেই কি প্রমাণিত হয় না যে 'অলোকদর্শন' মারফত যে 'বাণী' আসে, তাতে শুধু আসন্ন

ঘটনা সম্পর্কে সাবধান বাণীর ঘোষণাই থাকে এবং প্রতিরোধ তাকে কখনো করা যায় না ? আর তা থেকেই কি পরিষ্কার বোঝা যায় না, ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কেন অমন ধোঁয়াটে, 'রহস্যময়' এবং দ্ব্যর্থক হয় ? যোগী ভবিষ্যৎ-বক্তারা তাঁদের বর্তমান চিৎ-শক্তি দিয়ে সত্যিই 'দেখতে' পান, ভবিষ্যৎ ঘটনার সঙ্ঘটন, কিন্তু তার উচিত মূল্যায়ন তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় না, শুধু পারেন একটা অনিশ্চিত, ধোঁয়াটে ভবিষ্যদ্বাণী দিতে।

'নূতন নিয়মের' (বাইবেল) শেষ পুঁথিটি সন্ত জনের 'প্রকাশিত বাক্য'। সে পুঁথি এক অলোকদ্রষ্টা-লিখিত। সে-দ্রষ্টা দেখেছেন বিমান, হেলিকপ্টার, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, দেখেছেন পরিবেশ দূষণ, এমনি আরো কত কি। 'ওপারের' চিৎ-শক্তি 'প্রেরিত' দৃশ্যসমূহ যা দেখেছেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর আপন ভাষায়।

> '...আর রক্তমিশ্রিত শিলা ও অগ্নি উপস্থিত হইয়া পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে পৃথিবীর তৃতীয় অংশ পুড়িয়া গেল ও বৃক্ষসমূহের তৃতীয় অংশ পুড়িয়া গেল, এবং সমুদয় হরিদ্বর্ণ তৃণ পুড়িয়া গেল...আর যেন অগ্নিতে প্রজ্বলিত এক মহাপর্বত সমুদ্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে সমুদ্রের তৃতীয় অংশ রক্ত হইয়া গেল (তেজস্ক্রিয় ?) ও সমুদ্র-মধ্যস্থ তৃতীয় অংশ জীবনবিশিষ্ট সৃষ্ট জন্তু মরিয়া গেল... এবং জাহাজ সমুদয়ের তৃতীয় অংশ নষ্ট হইল...(৮ম পরিচ্ছেদ)।
>
> আর তাহাদের (পঙ্গপালদিগের) বুক-পাটা লৌহ-বুক-পাটার ন্যায় ও তাহাদের পক্ষের শব্দ রথের, যুদ্ধে ধাবমান অশ্বের শব্দতুল্য। ...আর বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাদের লাঙ্গুল ও হুল আছে।...আর...অশ্বগণ ও তদারোহী ব্যক্তিদিগকে এইরূপ দেখিতে পাইলাম, তাহাদের বুক-পাটা

অগ্নিময় ও নীলবর্ণ ও গন্ধকময় এবং অশ্বগণের মস্তক সিংহমস্তকের ন্যায় ও তাহাদের মুখ হইতে অগ্নি, ধূম ও গন্ধক বাহির হইতেছে…(৯ম পরিচ্ছেদ)।

কেন যে জন তাঁর 'আপন' কল্পনার জগৎ সম্পর্কে 'আপন' ভাষায় অমন নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গেছেন, তার কি আরো ব্যাখ্যা প্রয়োজন? আমাদের কালের প্রাযুক্তিক শব্দসম্ভার তো তাঁর আয়ত্তে ছিল না। পরমাণু-পদার্থবিৎ বের্নহার্ট্ ফিল্‌বের্থ্ 'প্রকাশিত বাক্যের' একটা আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়ে বেশ ভালো একখানা বই লিখেছেন (১৬), তবে, তার একটা জিনিস আমার ভালো লাগে না,—প্রাযুক্তিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে, শেষ পুঁথিটির ভবিষ্যদ্বাণীর কথায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভগবানের দোহাই পেড়েছেন তাঁর নিজের মত করে। ওটা আমার ভালো লাগে না। যুক্তি দিয়ে যেখানে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, সেখানে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেই সর্বোচ্চ সত্তা, ভগবানের দোহাই পাড়বো কেন?

*　　*　　*

স্বপ্নচারিতার ব্যাখ্যা আর এ ব্যাপারের ব্যাখ্যা প্রায় এক। যে কালে সে সব ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সে কালটাও বড় কথা।

কবি য়ুস্তিনুস কের্নের (১৭৮৬-১৮৬২) ছিলেন সোয়েবীয় (সোয়েবিয়া মধ্যযুগের দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীর এক ডিউক শাসিত রাজ্য) কবিকুলের মধ্যমণি। যুগ যুগ ধরে তাঁর কবিতা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে, বহু কবিতা লোক-সঙ্গীতের মর্যাদাও লাভ করেছে। কের্নের আসলে ছিলেন ডাক্তার। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল অতিপ্রাকৃত শক্তি। বৈজ্ঞানিকসুলভ নিষ্ঠায় সব ফলাফল তিনি লিখে রাখতেন, তাঁর রোজনামচায়। বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর গবেষণার মাধ্যম ছিল এক ব্যবসায়ীর স্ত্রী, ফ্রিদেরিখে হাউফে। শ্রীমতী

হাউফের স্বপ্নচারিতার সমস্ত ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর 'ডি সেহেরিন্ ফন প্রেফস্ত´' গ্রন্থে। আমার কাছে ১৮২৯ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণটিই আছে। ভুয়ের্তেম্‌বের্কের লোয়েভেনস্তাইন শহরের কাছে প্রেফস্ত´গাঁয়ের ফ্রিদেরিখে হাউফে। জায়গাটা পাহাড়ি আর, কের্নের বলেছেন, সেখানকার লোকের ওপর নাক্ষত্র এবং চৌম্বক প্রভাব বড্ড বেশি। ফ্রিদেরিখের বাবা ছিলেন পশুপালক। শ্রীমতী মানুষ হয়েছিলেন 'সরল, স্বাভাবিক' ভাবে, আদরে আদরে কোনদিনই নষ্ট হননি, বরং বেড়ে উঠেছিলেন, হাসিখুসি, প্রাণোচ্ছল রূপসী তন্বী হয়ে। ভাই-বোনদের মত তিনি ভূতের ভয় পেতেন না বটে, তবে একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর ছিল, ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন তিনি আর সে-বাণী নাকি পেতেন স্বপ্নে। তারপর তাঁর বিয়ে হল। স্বামী পয়সাওলা। ছেলেপুলে হল। ধনী গিন্নির মতই তাঁর জীবন কাটে। সবই ভালো, কিন্তু তাঁর মনোজীবন এমনি তীব্র অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠলো যে বহু দূরের কথাও তিনি শুনতে পেতেন, দূরতম ঘটনার অনুভূতিও সজাগ হয়ে উঠতো তাঁর মনে। শেষ পর্যন্ত চোখে তাঁর আলো সহ্য হত না। একদিন দুপুরবেলায় তাঁর এক পাদ্রী আত্মীয় তাঁর ঘরের জানলা খুলে দেওয়ায় যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠলেন। সে-যন্ত্রণার ভোগ ছিল পুরো তিন দিন।

> সে সময় তার মনে হত, একটা ভূত তাকে দেখা দিচ্ছে আর রোজ সন্ধ্যে সাতটায় তাকে চুম্বকিত করছে। এমনিতরো চলেছিল সাত দিন ধরে। সে ভূতটা তিনটে আঙুল এগিয়ে দিতো তার দিকে, যেন তিনটে রশ্মি ছড়িয়ে দিচ্ছে তার দেহে-মনে। (সম্ভবতঃ পরলোকের চিৎ-শক্তির প্রস্তুতি-পর্ব এবং প্রথম স্পন্দন।)

'ভৌতিক' চুম্বকত্বের প্রভাবে সে গভীর ঘুমে ঢুলে পড়েছে। সেই ঘুমের মাঝেই বলেছে, 'একমাত্র চুম্বকন মারফত তাকে বাঁচিয়ে রাখা

যাবে'। কের্নের বলেছেন, তার 'ঘুমন্ত' অবস্থায় কেউ তার কাছে এলে সে দেখতো, 'আরো একজন মানুষ তার পেছনে আসছে ভাবাবিষ্টের মত, যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে'। (এ ধরনের ব্যাপার ঠিক একই রকম ভাবে দেখেছেন অনেক অলোকদ্রষ্টা।)

ডাক্তার লিখেছেন, "তখন আমার মনে জাগতিক সাধারণ মানুষের মিথ্যা প্রচারই জেগে রয়েছে ফ্রিদেরিখে সম্পর্কে, তাই তাকে বললুম, 'তোমার ওই দীর্ঘ নিদ্রা-জাগর অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামিও না, তাছাড়া অনেক দিন তো হল, বাড়ির লোকজন যে হাঁপিয়ে উঠেছে, এবার ক্ষমা দাও' "।

'অনেকদিন ধরে দেহ-মনের চিকিৎসার পর একদিন তার গভীর ঘুমের ভেতরেই জিজ্ঞেস করলুম,

> তোমার কি মনে হয়, নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত চৌম্বক চিকিৎসায় তোমাকে বাঁচানো যাবে? সে বললে, 'কাল সন্ধ্যা সাতটায় সাতবার চৌম্বক আঘাত না পাওয়া পর্যন্ত সে কথা বলতে পারছি না।'···(অন্য জগতের কোন চিৎ-শক্তি কি তাকে সে কথা জানিয়েছিল?)···সাতবার চৌম্বক আঘাত দেবার পর অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল, পরের দিন সকালবেলা সে সহজভাবেই উঠে বসলো। অবাক কাণ্ড, অবাক সে নিজেও হয়েছে, এমনটা যে হবে, তা তো সে জানতো না। এত ওষুধ, এত বিষুধে যা হয়নি, এবার তাই হল, দেহে তার অনেক শক্তি ফিরে এসেছে।'

কের্নের তাঁকে নিয়মিত ভাবে চৌম্বক আঘাত দিতে লাগলেন, মাথা থেকে পেট পর্যন্ত।

> আমার চৌম্বক চিকিৎসায় শ্রীমতী হাউফে এমন এক স্বপ্নচারী অবস্থায় ছিল যে যখন মনে হয় সে জাগ্রত,

তখনো কিন্তু সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এ কথা মানতেই হবে যে অন্য লোকের চেয়ে তখনো কিন্তু সে বেশি জাগ্রত। তার সে-অবস্থা সর্বাংশে জাগ্রত অবস্থা, তবে তা অন্তর্মুখী।

বইয়ে তাঁর অন্তর্মুখী জাগ্রত অবস্থার কোন সাল-তারিখ লেখা নেই। ফ্রিদেরিখে লিখে রেখে গেছেন,—

> প্রায়ই মনে হয়, আমি যেন আমার দেহের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, যেন ভাসছি দেহের ওপরে, চিন্তাও করছি দেহের উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা আমার কিন্তু খারাপ লাগে না, কেননা দেহ সম্পর্কে আমি এখনো সচেতন। যদি আমার আত্মা, আমার 'স্নায়বীয়-সত্তার' (!) সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তাহলে তা আমার স্নায়ুর সঙ্গেও দৃঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ থাকবে, কিন্তু আমার স্নায়বীয়-সত্তার (nerve spirit) অস্থিবন্ধন শিথিল হতে শিথিলতর হতে থাকবে।

চৌম্বক নিদ্রায় ফিদেরিখে তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দেখতে পেতেন।

> একবার আপাত-জাগ্রৎ অবস্থায় তার চোখ বুজে গেল আর খুলতে পারলো না। ফ্রিদেরিখে বললে, সে দেখতে পাচ্ছে, তার পেটের ভেতর একটা সূর্য ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছে। বললে, ইচ্ছে করছে চোখ খুলতে, যাতে সে সূর্যকে আর দেখতে না হয়। তারপর সে প্রায়ই 'দেখেছে', সূর্যটা তার পাকস্থলীর সূর্যগন্থির (solar plexus) দিকে সরে যাচ্ছে। সে সম্পর্কে ফ্রিদেরিখে বললে, 'আমি আগেই বলেছি, আমি তাকে দেখতে পাই একটা ছোট্ট সূর্যের মত, ছোট ছোট আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে তা থেকে, কিন্তু যত বেশি করে চেয়ে দেখি তার দিকে, তত বেশি করে যেন জেগে উঠি'।···

বহু বছর ধরে কের্নের অলোকদৃষ্টি এবং ভবিষ্যৎ দর্শনের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, সে সব ঘটনা জানা-অজানা বহু লোকের। প্রত্যেকটা ঘটনাকে, প্রত্যেকটি উক্তিকে যাচাই করেছেন, আলোচনা করেছেন সে সম্পর্কে, অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গে। শ্রীমতী হাউফে সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা, সমস্ত পরীক্ষা বলে একটা 'স্নায়বীয়-সত্তার' কথা, সে-সত্তা তাঁর অন্তরে বিরাজমান সুদৃঢ় বন্ধনে এবং মুক্ত সে-সত্তা···।

ডাঃ য়ুস্তিনুস কের্নের-এর দুখণ্ডের সেই সমীক্ষা-পুস্তক প্রায় দেড়শো বছরের পুরোন। একটা ব্যাপারের ভেষজ এবং বিজ্ঞানগত সমীক্ষার এমন দলিল আর দেখিনি। ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিক হিসেবে ফ্রিদেরিখের ব্যাপারকে নিদানিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত তিনিই প্রথম করেছিলেন। তিনি তাঁর জন্ম, শৈশব, তাঁর পরিবেশের খুঁটিনাটি বিচার করেছেন, প্রবেশ করেছেন তাঁর প্রকৃতির গভীরে। চেষ্টা করেছেন, গোটা ব্যাপারটার অন্তস্তলে পেঁৗছতে। এত ঝঞ্ঝাটের পর যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তিনি পেঁৗছেছেন, তার মূল কথা হল, চৌম্বক-নিদ্রার অবস্থায় অলোকদৃষ্টির একটা বিশেষ ক্ষমতা জাগে। প্রত্যেকটি 'প্রাক্-জ্ঞানের' ঘটনাকে তাঁর মনে হয়েছে, প্রায়-অলৌকিক, তাদের প্রত্যেকটিকে যে পরীক্ষা করেছেন নিখুঁত যাথাযথ্যে, নিপুণ নিষ্ঠায়। সে নিষ্ঠা, সে যথাযথতা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও সম্ভবে না। কের্নেরের বহু বিচিত্র দৃষ্টান্ত থেকে আমি একটিমাত্র ঘটনা আপনাদের কাছে পরিবেশন করবো।

১৮২৬ সালের ২৫শে নভেম্বর ফ্রিদেরিখে গেলেন কের্নেরের ভাইনস্পের্কের বাড়িতে। সে শহর তিনি আগে কখনো দেখেননি, সেখানকার মানুষজনও তাঁর অপরিচিত। বাড়িটা আদালতের কাছেই। কয়েক বছর আগে সে বাড়িতে এক ভদ্রলোক মারা গিয়েছিলেন, ধরুন, তাঁর নাম 'ক'। তিনি অন্য এক ভদ্রলোকের

(ধরুন, তাঁর নাম 'খ') ব্যবসা দেখতেন। কিন্তু দেখার এমনি ধরন যে ব্যবসাটি লাটে উঠেছিল। চৌম্বক-নিদ্রায় নিদ্রিত ফ্রিদেরিখে বললেন,—

> সেই 'খ' বাবু আবার এসেছেন, এবং আমায় বিরক্ত করছেন।···কী দেখাচ্ছেন ওটা? খাতার একটা পাতা, গোটা পাতা নয়, একটা পৃষ্ঠা মাত্র, তাতে হিসেব লেখা রয়েছে। ওপরে ডান কোণটা একটু মোড়া, বাঁ কোণে একটা অঙ্ক।···পাতাটা রয়েছে অনেকগুলো দলিলের তলায়, কেউ ওটা দেখছেও না। উনি বলছেন, আমি যেন আমার ডাক্তারকে ব্যাপারটা বলি আর তাঁর মারফত যেন জানান দিই।···পাতাটা যে বাড়িতে রয়েছে, সে বাড়ি আমার বিছানা থেকে ষাট পা তফাতে। সেখানে একটা বড় ঘরের পাশে একটা ছোট ঘর। সে ঘরে একটা লম্বা মতন লোক টেবিলে বসে কাজ করছে। লোকটা বেরিয়ে গেল, আবার এসে ঢুকলো। ও ঘরটার পেছনে রয়েছে আরো বড় একটা ঘর। তাতে অনেক লম্বা লম্বা সিন্দুক রয়েছে, ঘরে ঢোকার মুখে রয়েছে একটা আধ-খোলা আলমারি।···টেবিলের ওপর দিকে কাঠের তৈরী কী একটা রয়েছে, তার ওপর কাগজ-পত্তোর পড়ে রয়েছে···কাগজগুলো তিন থাকে সাজানো। ডান দিকের থাকে এ-ভদ্রলোকের কিছু নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে, উনি বলছেন, পরের থাক দুটোয় আছে,—না, না, ঠিক মধ্যিখানের থাকটাতেই রয়েছে, আর যে কাগজটার জন্যে ওঁর মন খারাপ, সেটা রয়েছে, ওই থাকটার ঠিক মধ্যিখানে নয়, আর একটু নিচে।

তাঁর বর্ণনা থেকে কের্নের বুঝলেন, বাড়িটি স্থানীয় আদালত বাড়ি, তবে, ও অলোকদর্শনকে তাঁর মনে হল, স্বপ্নে দেখা ছবি।

রোগিণীকে ঠাণ্ডা করার জন্যেই কের্নের জজের কাছে গেলেন। না গিয়ে উপায় কি, সে-'স্বপ্ন' যে রোগিণীকে অস্থির করে তুলছে বারেবারে। ডাক্তারের মুখে কাহিনীর বিবরণ শুনে জজসাহেব চমকে উঠলেন, সত্যিই তো, রোগিণীর বর্ণনার সময়ে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে পরক্ষণেই ফিরে এসেছিলেন নিজের ঘরে। সেই একই 'স্বপ্ন' শ্রীমতী আবার দেখলেন। কাগজের যে থাকের বর্ণনা ফ্রিদেরিখে অমন নিখুঁত করে দিয়েছিলেন, সেই থাকটিকে জজসাহেব এবং কের্নের পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখতে দেখতে দুজনেই অবাক্। খুঁজতে খুঁজতে একটা খামের ভেতর অলোকদ্রষ্টা রমণীর বর্ণনার অনুরূপ খাতার একটি পৃষ্ঠা দেখতে পেলেন, সে পৃষ্ঠা সেই লোকটির লেখা (শ্রীমতী হাউফে যাঁকে "দেখেছিলেন")···সেই পৃষ্ঠায় একটি এবং একমেবাদ্বিতীয় প্রমাণ ছিল যে 'ক' বাবু একটি গোপন খাতা রাখতেন, যে খাতাটি তাঁর মৃত্যুর পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সে খাতায় এমন সব হিসেব ছিল, যা কোনদিন জানা যায়নি।···'

ফ্রিদেরিখে তাঁর নিদ্রা-জাগর অবস্থায় একটা চিঠি লিখতে বললেন, মৃত শ্রী'খ'-এর স্ত্রীকে। বয়ানটা নিজেই বলে গেলেন।—তিনি (শ্রী'খ'-এর স্ত্রী) নির্দোষ, দেউলে হবার কারণে তিনি যেন ভয় না পান।—গোটা ব্যাপারটার ওপর জজসায়েব তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিলেন। দীর্ঘদিনের সে ব্যাপারের সুনিষ্পত্তি হওয়ায় শ্রীমতী হাউফে যেন পুনর্জীবন পেলেন।

১৮২৯ সালের ৫ই আগস্ট প্রেফর্স্তের অলোকদ্রষ্টা রমণী ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর ২রা মে তারিখের চৌম্বক-নিদ্রায় তিনি যেমনটি বলেছিলেন, মৃত্যু এলো হুবহু তেমনি ভাবে।

অসাধারণ ডাক্তার য়ুস্তিনুস কের্নের আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক-গবেষণার সিদ্ধান্তের কথা সেই দেড়শো বছর আগে জানলেন কেমন করে? শক্তি/কালের রূপান্তরণ সম্পর্কে কী তাঁর জানা সম্ভব ছিল? কেননা

শ্রীমতী হাউফের কাছে মৃত 'খ'-এর চিৎ-শক্তি ছাড়া আর কীই বা এসে থাকতে পারে? সে-ই তো চেয়েছিল তার স্ত্রীকে বিপন্মুক্ত করতে, তার আসন্ন দেউলে অবস্থায় তাকে সাহায্য করতে। শ্রী 'খ' ছাড়া আর কে জানতো ফাইলের গাদার ভেতরকার সব চেয়ে দরকারী চিঠিটির কথা?

কের্নের যে ঘটনার কথা বলেছেন, তা অলোকদর্শনেরও বেশি, কারণ এ ক্ষেত্রে যে রয়েছ ঘটনার নিখুত জ্ঞান। কের্নেরের বিবরণ কেন যে আজো বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা এখন বুঝতে পারি। গবেষণা এবং তার ফলের মান ঠিক করে দিয়েছে, কের্নেরের সিদ্ধান্ত। অলোকদ্রষ্টার দাবি, সমস্ত প্রেরণা, সব অলোকদর্শন সে লাভ করেছে একটা 'স্নায়বীয় সত্তার' কাছ থেকে। সমস্ত ঘটনার বিবরণের ভেতরে 'স্নায়বীয়-সত্তা' কথাটা যেন গানের ধূয়োর মত বারে বারে ফিরে ফিরে এসেছে। চিৎ-শক্তি খোঁজে উপযুক্ত মিডিয়াম এবং খুঁজে পায়ও, আমার এই তত্ত্বের প্রথম প্রমাণ জুগিয়েছেন কের্নের, এ কথা আমি বড় গলা করে দাবি করি।

* * *

সাধু-সন্ন্যেসীর কিম্বা তাঁদের ভয়াবহ যোগাযোগের কমতি আছে, এমন অভিযোগ মানুষ করবে না। ঘটনা পরবর্তী স্বীকৃতি না থাকলে বুঝতে পারবো না যে ইতিহাসের কালে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী বজ্রাঘাতের মত এসে পড়েছে, তাদের সবগুলোই দুর্ঘটনার পূর্বাভাষ কেন। পরলোকবাসী চিৎ-শক্তির কী দায় পড়েছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ-আনন্দ পরিবেশন করার? 'বাছারা, এ যুগ বড় সুন্দর! আনন্দ কর, খাজনা কমে যাচ্ছে! আজ তোমার যা আছে, বিশ বছর পরেও তা অটুট থাকবে! অস্ত্র ত্যাগ কর, মূর্খদের মতন যুদ্ধ আর কেউ করবে না!' অমনতরো আনন্দ-সংবাদ বোধ হয় কোন দিনই পরিবেশিত হবে না।

সর্বকালের মত 'ওপারের আত্মারা' আজো আসন্ন বিপদের বর্ণনাই দেয়, দেয় দুঃখ-দুর্দশা-দুর্ভিক্ষের ইঙ্গিত! বিপদের আশঙ্কা থাকলেই তো লোককে সাবধান করে দিতে হয়, আনন্দের খবরে, সুখের খবরে কে আর কবে সতর্ক করে থাকে? অলোকদ্রষ্টাদের ইতিহাস আলোচনা করলেও তো এ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।

পরিব্রাজক গ্রীক পুরোহিত পেরিগ্রিনুস প্রোটিউস প্রথমে ছিলেন খৃস্টান ধর্মপ্রচারক, পরে মনে সন্দেহ জাগে, তাই নীতি পরিবর্তন করে কৃচ্ছ্রব্রতী হয়ে পড়েন, অর্থাৎ সেই দার্শনিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন, যাঁদের নীতি কৃচ্ছ্রসাধন, কিন্তু সে কৃচ্ছ্রসাধন মূর্খতার নামান্তর। ধর্মান্তরিত পেরিগ্রিনুস কিন্তু সুখী হলেন না। তিনি 'দেখলেন' এবং প্রচারক হিসেবে সবাইকে বললেনও যে 'মানবজাতির ধ্বংস আসন্ন'। দলবদ্ধ-মৃত্যু এড়াতে তিনি অগ্নিপ্রবেশ করে আত্মবিসর্জন দিলেন ১৬৫ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ার সময়ে।

ফ্রিজীয় ঋষি মন্তানুস (১৫৬ খৃস্টাব্দ) ছিলেন প্রাচীন খৃস্টান-সম্প্রদায়ভুক্ত। সে সম্প্রদায় লোকের মনে জাগিয়ে তুলতো, যিশুর প্রত্যাবর্তনের একটা ক্ষীণ আশা। তার প্রস্তুতির প্রয়োজনে অনুগামীদের বলতেন, কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী হতে, কারণ তা না করলে, 'পৃথিবীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী'।

১৪০ সালে রোমক পুরোহিত হের্মাস তাঁর 'মেষপালক' নামক গ্রন্থে (গ্রন্থটি এককালে 'নূতন নিয়মের' অন্তর্ভুক্ত ছিল) 'আসন্ন রোজ-কেয়ামত' থেকে চরম মুক্তি লাভ করার উদ্দেশ্যে খৃস্টানদের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছিলেন।

চারশো বছর আগে (১৫৬৮ সালে) ফ্রান্সের প্রভাংসালবাসী মড়ক চিকিৎসক মিশেল নস্ত্রাদামাসের (১৫০৩-১৫৬৬) মৃত্যুর পর তাঁর 'ভবিষ্যদ্বাণী' নামক পুস্তক (১৭) প্রকাশিত হয়। সে বইয়ে তিনি আজকের কাল সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। পণ্ডিতদের

মতে সে সব ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে এবং এখনো মিলছে। সেখানেও আছে, এক নাগাড়ে যুদ্ধ, মহামারী এবং ধ্বংসের কথা। বেশির ভাগ ঘটনাই সুপরিকল্পিতভাবে সঙ্ঘটিত হয়েছে এ কথা সত্যি, কিন্তু তাতেই বা সান্ত্বনা কোথায় ?

সব ভবিষ্যদ্বাণীকে জড়ো করে যদি একটা বই বর করা যায়, তাহলে তার কলেবর নিউইয়র্কের টেলিফোন ডাইরেক্টরীর মত বিশাল হবে, কিন্তু বিপর্যয়ের বিবরণ পাঠে আনন্দ নেই, বিশেষ করে সে বিপর্যয় যদি আমাদেরই মাথার ওপর অপলকা সুতোয় বাঁধা খাঁড়ার মত ঝুলে থাকে। তবে, কোন জীবন্ত ভবিষ্যদ্বক্তার সঙ্গে আলাপ করা, নিশ্চয় মজার।

*　　　*　　　*

শ্রীমতী জীন ডিক্সন মার্কিন ধনী-মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়ে। ওয়াশিংটনে থাকেন। স্বামী জিমি পাকা ব্যবসাদার। কোঠা বাড়ি, বেশ সুখী পরিবার। বেরাল, মাইক খুব আদুরে। পোষাকে-পরিচ্ছদে রুচিশীলতার পরিচয় মেলে। জেম্‌স্ আই. ডিক্সন কোম্পানীতে চাকরী করেন, সচিব-কোষাধ্যক্ষের পদে। আপিসে দশ ঘণ্টা কাজের পরে দুশো মার্কিন দৈনিকের জন্যে 'কলম' লেখেন, হপ্তায় প্রায় হাজার তিনেক চিঠি পান, বক্তৃতা করেন, এর ওপর সামাজিক দায়-দায়িত্ব তো আছেই। শ্রীমতী ডিক্সন হিসেব করে দেখেছেন, যে কোন লোকের চেয়ে তিনি বছরে ২১৭ দিন বেশি খাটেন—৫২টা শনিবার, ৫২টা রবিবার, আর ৯টা ছুটির দিন (বড়দিন বাদে), তার ওপর আরো আছে ১৪ দিনের ছুটি (তিনি নেন না) আর ৯০ দিনের 'অধিকাল' (overtime)। জীন ডিক্সনের রসবোধ বেশ তীক্ষ্ণ, ধর্মভীরুও বটেন।

খবরের কাগজে অনেকবার তাঁর নাম বেরিয়েছে মোটা হরফে, এখনো বেরোয় ! ১৯৪৪ সালে তিনি বলেছিলেন, চীন গণসাম্যবাদী

হয়ে যাবে (হয়েও ছিল ১৯৪৯ সালে)। সাতচল্লিশ সালের গ্রীষ্মে বলেছিলেন, মহাত্মা গান্ধী ছমাসের ভেতর খুন হবেন (আটচল্লিশের ৩০শে জানুয়ারী এক ধর্মান্ধ হিন্দু তাঁকে গুলি করেছিল)। একষট্টি সালে বলেছিলেন, মার্লিন মন্‌রো আত্মহত্যা করবে ('৬২ সালের ৫ই অক্টোবর বেশি মাত্রায় ঘুমের বড়ি খেয়ে সে কাল-ঘুম ডেকে এনেছিল)।

ওই একষট্টি সালেরই সেপ্টেম্বরের গোড়ায়, তাঁর বন্ধু, জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ সচিব দাগ ইয়ালমার হামার্শোয়েল্‌দ-এর দেহরক্ষী, বিল রাওয়ালোর মৃত্যু 'দেখেছিলেন' (১৮ই সেপ্টেম্বর রহস্যজনকভাবে উড়োজাহাজ ভেঙে দলবল সমেত মারা গেলেন তিনি, রোডেশিয়ার ন্দোলার অদূরে)।

রেনি মুর্বের্গেন (১৮) জন্‌ এফ্‌. কেনেডির মৃত্যু সম্পর্কে এগারো (!) বছর আগে করা শ্রীমতী ডিক্‌সনের ভবিষ্যাণীর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর বইয়ে।

কেনেডির ড্যালাস যাওয়া সর্বরকমে বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন শ্রীমতী। তিনি বলেন, কেনেডি পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। আটষট্টি সালে একটা বড় সভায় তিনি বলেছিলেন, রবার্ট কেনেডি রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না, কেননা জুন মাসেই তিনি নিহত হবেন ক্যালিফর্নিয়ায়। (৫ই জুন বিশারা সিহান লস্‌ এঞ্জেলেসের অ্যাম্ব্যাসাডার হোটেলে তাঁকে গুলি করলো।)।

রেনি মুর্বের্গেন লাই-ডিটেক্‌টর বিশেষজ্ঞ ডাঃ ক্লাইড ব্যাক্‌স্টারের সঙ্গে শ্রীমতী ডিক্‌সনের ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। ব্যাক্‌স্টারের ধারণা, শ্রীমতী ডিক্‌সনের মনস্তরঙ্গের স্পন্দন-মাত্রা এমন এক উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যেখান থেকে 'মহা-বিশ্বে যোগাযোগ সম্ভব'। ব্যাক্‌স্টারের নিজের কথাতেই বলি, 'এ ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা যে আবহমান কাল থেকেই

আছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। সংস্কারবশে আমরা আমাদের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির (extrasensory perception) পথ রুদ্ধ করে দিয়েছি। আমরাও মনকে বোঝাই, আবার বিজ্ঞান এবং আমাদের পরিবেশও আমাদের বলে, অস্বাভাবিক চেতনা অর্থহীন…। মনে হয়, এমন একটা ক্ষমতা জীন ডিক্সনের আয়ত্তাধীন, যার বহুল ব্যবহার এক-কালে ছিল…'।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে গেলুম চুয়াত্তর সালের ৫ই মে তাঁর ওয়াশিংটনের বাড়িতে।

আমি—শ্রীমতী ডিক্সন, আপনি যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন ব্যাপারটা কী হয়, কী ধরনের উপলব্ধি আপনার মনে জাগে? কোন প্রত্যাদেশ অথবা কোন দিব্যদর্শন কিম্বা কোন অতি-প্রাকৃত আবির্ভাব ঘটে কি?

শ্রীমতী ডিক্সন—আমি যখন ভবিষ্যৎ 'দেখতে' পাই, তখন সে এক অপূর্ব সুন্দর অনুভূতি। সে কোন অতি-প্রাকৃত আবির্ভাবের রূপ নয়, কারণ সে আবির্ভাব তো এক রকম প্রেত। প্রত্যাদেশও নয়, কারণ প্রত্যাদেশে ঈশ্বরের ইচ্ছার ইঙ্গিত থাকে। আমি যা দেখতে পাই, তাহল অদৃষ্ট, নিয়তি, ঈশ্বর যা আমার, আপনার, সবাকার ক্ষেত্রে আগেই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অদৃষ্টকে খণ্ডন করা যায় না, বদলানো যায় না নিয়তিকে। ভাল কথা, রিচার্ড নিকসনকেও আমি এ কথা বলেছিলুম, সেই ঊনষাট সালে।

আমি—কী হয় তখন আপনার মনে? আপনার মাথায় তখন কী ধরনের উপলব্ধি জাগে?

শ্রীমতী—সে এক উচ্চ স্তরের স্বর্গীয় প্রভাব। সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে, তার জন্যে আমাকে তৈরী করে নেওয়া

হয়, আমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, আমার পরিবেশের প্রতিও ঘটে আমার মনোভাবের পরিবর্তন, পরিবর্তন ঘটে যুক্তিসম্মতভাবে আমার চিন্তা করার ক্ষমতার, আমার স্বাস্থ্যেরও পরিবর্তন ঘটে। তারপর হঠাৎ একদিন সকালবেলা বুঝতে পারি, ঐশ্বরিক প্রেরণা লাভের কাল আসন্ন। সে-কালের দৈর্ঘ্যকে সাধারণ জাগতিক কালের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

আমি—কাগজে পড়েছি, আপনি খুব ধার্মিক। পূজো-আচ্চা করেন নাকি ?

শ্রীমতী—তা করি। আজই তো সকালে গির্জেয় গিয়েছিলুম।

আমি—আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে গির্জে এবং বর্তমান প্রধান যাজক কী বলেন ?

শ্রীমতী—আমার সম্পর্কে কয়েকজন পুরোহিত কী বলেছেন, তা আপনার জানা উচিত! কাগজে নিশ্চয় পড়েছেন। ও সব ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে, ওঁদের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করাই সব চেয়ে ভালো।

আমি—ওঁরা কি সত্যিই খুব কড়া আক্রমণ চালিয়েছিলেন ?

শ্রীমতী—সে তো খুবই স্বাভাবিক। আক্রমণ এসেছিল, অনেক অনেক উঁচু স্তর থেকে। আক্রমণ কারা করে জানেন ? আক্রমণ করে তারাই যারা কিচ্ছু বোঝে না আর যারা সবজান্তা, তারা। নিষ্কর্মার গলার জোরই সবচেশে বেশি, কুঁড়ে চিরকালই বচনে দেড়ে।

আমি—কিন্তু আপনি তো খৃস্টানধর্মের বিরুদ্ধে কখনো কিছু বলেননি, তাহলে গির্জে আপনাকে গাল দেয় কেন ?

শ্রীমতী—খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে বোলবোও না কখনো। যিশুকে যে আমি সত্যিই 'দেখেছি', কিন্তু সে দেখা ভবিষ্যৎ-বাণীর পর্যায়ে পড়ে না।

আমি—সম্প্রতি কাগজে পড়লুম, আপনি অউবের (UFO) অস্তিত্বে দৃঢ়-বিশ্বাসী। তার বিষয়ে কিছু বলতে পারেন ?

শ্রীমতী—আমি বলতে পারি, জীবনে আমার নতুন কিছু নেই। অউবকে আমি অনেক কাল থেকেই জানি। লোকে জিজ্ঞেস করে, কবে থেকে জানি। কী করে জবাব দেবো সে কথার ? যেদিন থেকে হাঁটতে শিখেছি, বলতে গেলে সেদিন থেকেই তাদের জানি। কখনো কি ভেবে দেখেছেন, জ্ঞানতঃ কবে থেকে হাঁটতে শিখেছেন ?

আমি—তাহলে, আপনার মতে, অউব আছে। কোথা থেকে আসে ওগুলো ?

শ্রীমতী—অল্পদিন পরেই জানতে পারবেন, ওরা আসে, আমাদেরই সৌর-জগতের এক অনাবিষ্কৃত গ্রহ থেকে। ওদের চালকদের সঙ্গে সরকারীভাবেই আমরা যোগাযোগ করবো, জানতে পারবো তাদের কাছে, শক্তির বর্তমান উৎসগুলোকে আরো কত ভালো করে, কত সহজে কাজে লাগানো যায়।

আমি—আমাদের সৌরজগতের অভিকর্ষীয় সমস্ত শর্ত তো মাপা হয়ে গেছে, তাই, আর কোন অজ্ঞাত-পরিচয় গ্রহের তো সেখানে স্থান নেই। তাছাড়া, আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহ সূর্যের 'ওপারেও' গেছে, কোন নতুন গ্রহের সন্ধান তো সেদিকেও পাওয়া যায়নি।

শ্রীমতী—তাতে কিছু যায় আসে না। খুব শিগ্‌গিরই বৃহস্পতিরই কাছাকাছি এক অজানা নতুন গ্রহ আবিষ্কৃত হবে।

আমি—সূর্য থেকে বৃহস্পতি অনেক দূরে, তাছাড়া সে গ্রহ-দানব আমাদের সৌর-জগতের জীব-বলয়ের ভেতরেও পড়ে না। অমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বুদ্ধিমান জীবনের উৎপত্তি ঘটবে কেমন করে?

শ্রীমতী—দেখুন না, কি হয়, আর একটু অপেক্ষা করুন না। ভালো কথা, অউব চালায় কারা জানেন? মেয়েরা।

আমি—মেয়েরা চালায়? জানলেন কেমন করে?

শ্রীমতী—আমি দেহ-স্পন্দন অনুভব করতে পারি, বুঝতে পারি, ও স্পন্দন নারীদেহের।

আমি—শ্রীমতী ডিক্‌সন, আপনি আমার বইগুলো পড়েছেন। আমার তত্ত্বনিচয় সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

শ্রীমতী—অনেক ব্যাপারে আপনি পুরোপুরি ঠিক।

আমি—আপনি কি মনে করেন, বহির্জাগতিক মানুষ আবার আসবে পৃথিবীতে?

শ্রীমতী—নিশ্চয়। অতীতেও তারা এসেছিল,—আপনিও তো সে কথা বলেছেন…। আপনার হাতটা দেখি। এই দেখুন, এইখানে, আপনার আঙুলের ডগায় আপনার অভিচেতন-সীমাতিক্রান্ত শক্তির স্ফুরণ অনুভব করছি। দেখুন, শ্রীফন দানিকেন, আপনার জীবনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়…।

এই পর্যন্ত বলে আমার টেপ রেকর্ডার বন্ধ করতে বললেন। রেকর্ডার প্রায় দুঘণ্টা বন্ধ রইলো। সে দুঘণ্টায় যে সব আলোচনা

হল, তা প্রকাশ করার অনুমতি তিনি দিলেন না। আমাদের আলাপচারী শেষ হল এই ভাবে,—

আমি—আপনি মদ খান ?

শ্রীমতী—জীবনে একটি ফোঁটাও স্পর্শ করিনি। চা-কফিও আমি খাই না। মনে করতে পারেন, উনিশ বছর বয়সে যেদিন আপনার জীবনে একটা বিরাট সন্ধিক্ষণ এসে উপস্থিত হল, সেদিনকার কথা ? সে-সন্ধিক্ষণ 'আপনি' আনেননি, সে যেন আপনার কাছে এসে পড়েছিল। বাকি জীবনে আপনার অনেক দুর্ধর্ষ শত্রুর আবির্ভাব ঘটবে, কিন্তু তারা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হবে, আপনার পরিচালক-শক্তি আপনাকে দেবে সাহস, দেবে সহায়তা। আপনার প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেবেন না। আমাদের এই আলাপ-চারীর প্রতিবেদন ঠিক ভাবে প্রকাশ করবেন, সত্যের অপলাপ ঘটাবেন না। এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করেছি, তাকে উল্টে সাজালে আর কখনো আমার দেখা পাবেন না।

আমাদের শক্তির স্তর থেকে 'কিছু একটা' স্পন্দিত হয়, 'কিছু একটা' ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত দেখতে পাই, পরলোকের শক্তির স্তর থেকে 'কিছু একটা' স্পন্দিত হয় আমাদের মস্তিষ্কের কোষে-উপ-কোষে, তা থেকেই উৎপত্তি ঘটে দিব্যদর্শনের। তার মানে কি, জীন ডিক্সন এবং অন্যান্যেরা যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তার 'সবই' সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে ?

না, তা হয়নি, কিন্তু হলেও আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই। যদি বুঝতে পারেন, আধিভৌতিক-ধারণাতীত জগৎ 'কালহীন', তাহলে বিকীরিত শক্তিসমূহকে ধরা যাবে উপযুক্ত 'গ্রাহকযন্ত্রে' স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু আমাদের সময়ের মাপে ঠিক দিন-ক্ষণটি তো দেওয়া যাবে না, যদি কখনো যায়, তো সে হবে নেহাত বরাত জোরে।

যে সব পরলোকবাসীর চিৎ-শক্তি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চায়, তারা, হয় আবেগপ্রবণ, না হয় যুক্তিবহির্ভূত (কারণ তারা জাগতিক অভিজ্ঞতা এবং জাগতিক কাল-মানের অতীত), অথবা তারা আবেগপ্রবণও বটে এবং যুক্তিবহির্ভূতও বটে। নতুবা, যে 'আসন্ন' ঘটনা তাদের 'কালহীন রাজ্যে' ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে, তার জন্যে আমাদের সাবধান করে দিত না, কারণ সে-ঘটনার সংঘটন কোন উপায়েই যে তাদের দ্বারা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

অথবা

'ইহলোকের মানুষের' চিৎ-শক্তি পরলোকে প্রবেশ করে আশা করে, 'দৃষ্ট' ঘটনার সংঘটন রোধ করতে, কিন্তু সে হবে জাগতিক জীবের যোগাযোগের একতরফা চেষ্টা। সে ক্ষেত্রে আসন্ন ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে পরলোকবাসীদের কোন যোগই থাকবে না।

দ্বিতীয় অনুমানটাকেই আমি বেশি পছন্দ করি, এতে পরলোক-বাসীকে টানবার প্রয়োজন হয় না। কেননা সে ক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত চিৎ-শক্তিসমূহ 'প্রতীপগতি কালমাত্রার' জগতের (ট্যাকিয়ন!) সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে, বিশেষ বিশেষ সময়ে এবং পরলোকবাসী চিৎ-শক্তিসমূহের কাছ থেকে আদায় করে আনতে পারবে তুটো-পাঁচটা ভবিষ্যদ্বাণী।

* * *

'গ্রহান্তরের মানুষদের পৃথিবীতে আগমন' সংক্রান্ত আমার তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করবার সময় পুরাণ থেকে অনেক উদাহরণ বের করেছিলুম। প্রাচীন কাহিনীকারদের জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে গেছি। বাস্তব ঘটনার নিখুঁত বিবরণ তাঁরা মানুষকে দিয়ে গেছেন, যদিও জানি, সে-ঘটনার গুরুত্ব, তার তাৎপর্য তাঁরা বোঝেননি তাঁদের কালে। ভিনগ্রহের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পুরাণের ভাঁড়ার নানা খবরে ভরা। তু'একটা উদাহরণ দিই।

আর্য কেল্ট্‌ গোষ্ঠীকে জার্মানরা রাইন পার করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, পরে অবশ্য তারা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ দখল করেছিল। খৃস্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরে দ্বৈপায়ন কেল্টদের সঙ্গে সুন্দরী, অদ্ভুতকর্মা পরীদের খুব ভাব ছিল। সে-পরীরা প্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃত জগতের সঙ্গে হামেশা যোগাযোগ করতো। তাদের ভবিষ্যতের জ্ঞান দিয়ে দ্বৈপায়ন কেল্টদের তারা খুব অবাক করে দিত। তারা যখন পৃথিবীতে আসতো তখন তারা যে খাতির পেতো তা দেখবার মত, কারণ সেখান থেকে তারা পছন্দসই লোকদের নিয়ে যেতো 'তাদের রাজ্যে', আবার ফিরিয়েও নিয়ে আসতো।

উত্তর জার্মানীর বাসিন্দারা একটা 'দ্বিতীয় অহং'-এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো, তাকে তারা বলতো 'ফুইলগিয়া'। সে-অহং মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকতো অদৃশ্য ছায়ার মত। ফুইলগিয়া ছিল মানুষের ব্যক্তিগত চেতনার সঙ্গে একাত্ম, কিন্তু স্বাধীনভাবেও অন্যত্র আবির্ভূত হতে পারতো সে। স্কাণ্ডিনেভিয়রা ফুইলগিয়াকে মনে করতো 'শুভদাত্মা', প্রয়োজনের মুহূর্তে, বিশেষ করে বিপৎকালে সে ছুটে যেতে পারতো স্বর্গরাজ্যে, নিয়ে আসতে পারতো সেখান থেকে পার্থিব মানুষের বিপন্মুক্তির মন্ত্র।

ড্রুইডরা ছিল কেল্টদের অখৃস্টান পুরোহিত। ঋষি বলে তারা তাকেই মানতো, যে 'ড্রুইডের কড়া' দেখাতে পারতো। সে-কড়া ছিল এক অলৌকিক পাত্র, অপূর্ব সুন্দর এবং তা 'গড়া হত পরলোকের আত্মা দিয়ে'। সে কড়া থেকে ড্রুইড ঋষিরা যত ভবিষ্যদ্বাণী সাঁতলে তুলতো, তেমনটি কেউ কখনো পারেনি।

প্রেতবহুল সম্মোহন রাত্রে (ব্যাপারটা তন্ত্রশাস্ত্রগত) পার্থিব এবং অপার্থিব জগতের সীমারেখা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। সব রকমের অশরীরী আত্মা শূন্য থেকেই যেন মূর্ত হয়ে এসে আবির্ভূত হয়।

সর্বকালের অতীন্দ্রিয়, অতিপ্রাকৃত সাহিত্যে 'সূক্ষ্ম-দেহ' একটি

বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই সূক্ষ্ম-দেহ যেন দেহ এবং আত্মার 'সূক্ষ্ম আবরণ'। অতীন্দ্রিয় ধর্মতত্ত্ব (খৃস্টান রহস্যবাদ) বলে, জগতের রহস্যোপলব্ধিতেই নিহিত আছে মুক্তির উপায়। সে রহস্য-বাদের দাবি, ওই সূক্ষ্ম-দেহ স্থূল মানবদেহকে আশ্রয় করে পার্থিব এবং দিব্যশরীরের মাঝে এক সংযোগ-সূত্রের কাজ করে।

দেহজ্যোতিঃকে (aura) বাদ দিয়ে সূক্ষ্ম-দেহের কথা বলাই যায় না। গ্রীক ভাষায় 'অরা' (aura) বলতে বোঝায়, বায়ু অথবা শ্বাস। এই দেহজ্যোতির কথা সুপ্রাচীন কাল থেকে শুধু আলোচিতই হয়ে আসছে না, এর অস্তিত্বও সর্বকালে স্বীকৃত হয়েছে। মনুষ্য-দেহের চারপাশের সাধারণতঃ অদৃশ্য এই আবরণ (জ্যোতিঃ) আজ পরামনোবিদ্যার গবেষণার বিষয়বস্তু। (সত্যি কথা বলতে কি, আজো আমরা বলি, অমুক কবি, অমুক পণ্ডিত, এমন কি অমুক নেতাকে ঘিরে আছে একটা অলৌকিক আভা!)

ওই দেহজ্যোতিঃ অথবা অলৌকিক আভা, যাই বলুন, ঠিক মত কবে আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর ইচ্ছে নেই। তবে কার্ল্ লুটভিক্ ফ্রাইহের ফন রাইখেন্‌বাখের মত চিন্তাশীল পণ্ডিতও এ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। রাইখেন্‌বাখ (১৭৮৮-১৮৬৯) বৈজ্ঞানিক এবং রসায়নশাস্ত্রবিৎ। তিনি দারুজ আলকাতরা (wood tar) থেকে ক্রিয়োজোট এবং মোম (paraffin wax) বের করেছিলেন। অদৃশ্য আদি-শক্তির (Od force—জার্মান ভাষায় 'Od' শব্দের অর্থ 'আদি') অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁর ধারণা ছিল, সে শক্তিকে দৃশ্য করা সম্ভব। প্রত্যয়ের দৃঢ়তার কারণেই তাঁর কর্মজীবনের পুরো কুড়িটি বছর ব্যয় করেছেন, এই অদৃশ্য আদি-শক্তির সন্ধানে। ফ্রান্‌ৎস্ আন্তন মেস্‌মেরের মতন রাইখেন্‌বাখও বিশ্বাস করতেন, আদি-শক্তিকে একের কাছ থেকে অপরের কাছে পাঠানো সম্ভব। তবু, এই অসাধারণ 'বস্তু', ওই

সূক্ষ্মদেহ, দেহজ্যোতিঃ অথবা আদি-শক্তি প্রাযুক্তিকভাবে সমর্থিত হয়েছে হঠাৎ, মাত্র এই সেদিন।

চল্লিশের দশকের শেষের দিকে রুশী যন্ত্রবিৎ, সেমিয়োনফ্ দাভিদোভিচ্ কির্লিয়ান দেখলেন, তাড়িত চিকিৎসার (electrothera-peutic) একটি যন্ত্রের উচ্চ-স্পন্দন পর্যায়ের তড়িদ্‌দ্বার (electrode) এবং চিকিৎসাধীন রোগীর দেহের মাঝে তড়িৎ-প্রবাহের আবির্ভাব ঘটে। কির্লিয়ানের বাড়ি কুবান নদীর উপকণ্ঠে ক্রাস্নোদারে। কির্লিয়ান ভাবলেন, এ 'প্রবাহ' যখন চোখে দেখা যায়, তখন তার ছবিও নিশ্চয় তোলা যাবে। ছবি নিলেন, তারপর স্ত্রী ভালেন্তিনার সাহায্যে সে-ছবি তৈরীর দুরূহ কাজে মন দিলেন।

'কির্লিয়ান ছবির' ব্যবহার আজ সর্বত্র। সে-ছবির প্রত্যেকটাতে তথাকথিত 'কির্লিয়ান প্রভাব' বর্তমান থাকে। উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট পরিবর্তী তড়িৎপ্রবাহ ক্ষেত্রে (high frequency alternating current field) মানুষ, জন্তু অথবা গাছপালার ক্ষতি হয় না, কিন্তু তাদের দেহে একটা আভা ফুটে ওঠে, যার ছবি তোলা যায়, তবে উচ্চ তাপের ক্ষেত্রে সে আভা ফোটে না, তাই তাকে 'শীতল আভা'ও বলা হয়।

কির্লিয়ান-ছবিতে যে ব্যাপার দেখা যায়, তার দু'একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, অনেকগুলো পাপড়িওলা একটা ফুলের ছবি নেওয়া হল, তারপর সেই ফুলটারই কয়েকটা পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলে আবার ছবি নেওয়া হল, কয়েক মুহূর্ত পরে। এই দ্বিতীয় ছবিতে কাটা পাপড়িগুলো থাকবে না বটে, কিন্তু ফুলটার গোটা পাপড়ি-গুলোর পাশে কাটা পাপড়িগুলোর দেহ-রেখা দেখা যাবে। 'কির্লিয়ান প্রভাব' প্রয়োগ করে সারা পৃথিবীতে অসংখ্য অমন ছবি নেওয়া হয়েছে, সব ছবিতেই দেখা গেছে, মানবদেহের চারদিকে রয়েছে এক ধরনের 'বিকিরণ', কিন্তু সাদা চোখে তা দৃশ্য নয়।

আবার ধরুন, একটা হাত ব্যবচ্ছেদ করার পর ছবি নেওয়া হল, ছবিতে কাটা হাতের দেহরেখা ফুটে উঠবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, একটা লোক বিছানায় শুয়েছিল, সে উঠে চলে যাবার অব্যবহিত পরেই বিছানার ছবি নিয়ে দেখা গেল, লোকটার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তার শায়িত অবস্থার দেহ-রেখার নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে। স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যায়, একটা অজানা শক্তি দেহগত একটা ব্যাপার ঘটিয়েছে। ছবি নেবার এ কৌশলের আরো উন্নতি হলে মানুষের হাতে সম্পূর্ণ নতুন এক তত্ত্ব এসে উপস্থিত হবে। আজ অলৌকিক আভার—অথবা যে নামেই তাকে ডাকুন—ছবির গুণগত, অর্থাৎ স্পষ্টতার তারতম্য ঘটেই।

ভারী অবাক লাগে, যখন দেখি, আজ প্রতি মুহূর্তে পুরাণ-কিম্বদন্তী-ধর্মশাস্ত্রের কত অবোধ্য বর্ণনা, কত দুর্বোধ্য বিষয় সম্পূর্ণ বোধ্য, সম্পূর্ণ বাস্তব রূপ ধরে চোখের সামনে ফুটে উঠছে। লোকে বলতো, অমুক অমুক ঋষি-মহর্ষির মাথা ঘিরে একটা জ্যোর্তিবলয় থাকতো,—কথাটা তো মিথ্যে নয়, 'জ্যোর্তির্বলয়' যে সত্যিই থাকে। সে-জ্যোতির ছবিও তোলা যায়। কির্লিয়ান প্রভাব যে ভাবে কাজ করে, তা তো তত্ত্বগতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি দেহই যে 'বিকীর্ণ' করে, এ কথা পদার্থবিদ্‌ও অস্বীকার করেন না, তবে কারুর ক্ষেত্রে বিকিরণ কম, কারুর ক্ষেত্রে বেশি, তফাত শুধু এইটুকু। কির্লিয়ান আবিষ্কার করেছিলেন, কেমন করে বিকিরণের ছবি তুলতে হয়। কিন্তু ওই 'অদ্ভুত' ব্যাপারটার ব্যাখ্যা কোথায় পাবো? অবর্তমান বস্তুও কেমন করে 'বিকীর্ণ' করে অল্পক্ষণ আগে ছেড়ে যাওয়া জায়গায় (ছেঁড়া পাপড়ি, কেটে নেওয়া হাত, বিছানা ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষ)? তাহলে কি তারা ছেড়ে যাওয়া জায়গায় খানিক পরেও 'ক্রিয়াশীল' থাকে? তাদের দেহজ্যোতির গতি কি দেহের গতির চেয়েও শ্লথ? এত কথার পরেও পণ্ডিতদের দাবি, দেহই

বিকিরণের 'কারণ'। কিন্তু ব্যাপারটা কি তার উল্টো? কোথা থেকে শক্তি বিকিরিত হয়েছিল?

পদার্থবিদ্যাগত ধারণায় সব বিকিরণই 'বাস্তব'। এ যুক্তি প্রযোজ্য, আলোক বিকিরণের ক্ষেত্রে (quanta) এবং সব রকম কণা-বিকিরণের ক্ষেত্রে (particle radiation)। বিকিরিত শক্তি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্লিষ্ট হয়ে কী হয়? যায় কোথায়? শক্তি-তত্ত্ব মতে কিছুই শূন্যে বিলীন হয়ে যায় না, 'ফুরিয়ে' যায় না কিছুই। ওই একটি মাত্র জায়গায় পারমাণবিক পদার্থবিদ্যাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। শক্তিতে রূপান্তরিত হবার পর কতকগুলো পারমাণবিক কণার অস্তিত্বই প্রমাণ করা অসম্ভব। জেনিভার ইউরোপিয়ান কাউনসিল ফর নিউক্লিয়ার রীসার্চ-এর এক পদার্থবিৎ (নাম বলতে বারণ) আমায় বলেছিলেন,—

'অতিপ্রাকৃত অবস্থার সূত্রপাত ঘটে আমাদের প্রয়োজনে, এখানেই। কিছু 'প্রভাব', কিছু ফল আমরা দেখতে পাই, তারপর নিয়মের ধারায় প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করি তাদের কাজের ধারাকে। কিন্তু যেই সে প্রভাবের কারণের কথায় আসি, তখনই প্রশ্নের পাহাড় এসে সামনে দাঁড়ায়। ঠিক ওইখানেই আধ্যাত্মিক জগতের শুরু।'

* * *

ডাঃ লিওনিদ্ এল. ভাসিলেফ্ লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং 'অর্ডার অব লেনিন' খেতাবে ভূষিত। তিনি বলেছিলেন, 'অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি' (extrasensory perception) শক্তির আবিষ্কার, পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারের মতই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হবে। এ কথার ভেতর কি একটা বড় আশা প্রচ্ছন্ন রয়েছে?

* * *

'আবির্ভাবের' দেউড়িতে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে পরামনোবিদ্যাগত এই আপাত দীর্ঘ পথ পরিক্রমা, সত্যিই কিন্তু ঘুর পথ পরিক্রমা

নয়। দিব্যদর্শন এবং আবির্ভাব কিন্তু সত্যিই পরামনোবিদ্যাগত ব্যাপার। প্রতিটি দিব্যদর্শনের পেছনেই আছে শক্তির খেলা। কোথা থেকে আসে সে শক্তি? কেমন করে, কী শক্তির প্রভাবে কোটি কোটি পরমাণু একটি বিশেষ ক্ষণে, বিশেষ স্থানে দৃশ্যমান হয়ে বুদ্ধিমান আচরণের প্রকাশ ঘটায়? অল্প কয়েকটা লোকের ভাগ্যেই কেন দিব্যদর্শন লাভ ঘটে? উপস্থিত হাজার হাজার আরো লোক কেন কিছু দেখতে পায় না? দিব্যদ্রষ্টার কাছে বারেবারে কেন একই স্থানে দিব্যদর্শন ঘটে? একবার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেলে, আর কি বদলাতে পারে না? দিব্যদ্রষ্টাকে নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট দিনে এবং ক্ষণে উপস্থিত হতে বলা হয়। যেখানে যখন খুশী, ঠিক সেইখানে কি 'স্বর্গীয়' দর্শনের আবির্ভাব ঘটতে পারে না?

যে কটা দিব্যদর্শনের বর্ণনা আমি দিয়েছি, তা থেকে প্রমাণ করা যায় যে দিব্যদ্রষ্টারা সহসা অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবির্ভূত সম্পূর্ণ রূপ 'দেখেনি', যা দেখেছে, তা একটা 'আবছা, অবর্ণনীয়, পাংশুল-শ্বেত বস্তুপিণ্ড'। তারা বহু যত্নে, বহু আয়াসে (ভিন্নাভিভাব!) দেখতে পেয়েছে, অলৌকিক সে মূর্তি সেই বস্তুপিণ্ডের মাঝে। হেরল্টস্‌বাখের মেয়েরা উনপঞ্চাশ সালের ১২ই অক্টোবর 'দেখেছিল', শুধু একটা 'শুভ্র আভা', তার অনেক পরে সে-আভা রূপ পরিগ্রহ করেছিল এক শুভ্রবসনা রমণীর, তারও পরে সে দৃষ্ট হয়েছে ছেলেদের কাছে। সান দামিয়ানোর মামা রোজাও বলেছে, প্রথমে সে দেখেছিল একটা আবছায়া, পরে তা জমাট বেঁধে রূপ নিয়েছে মেরী মায়ের। (মনে করিয়ে দিই, জেস্যুইট আথানাসিউস কির্চের-এর কথা। তাঁর ধারণা, উপযুক্ত স্থানে বারিপবিত্রীকরণের কালে 'কুয়াশা এবং বাষ্প' অনেকখানি সাহায্য করে।)

ফতিমার ছেলে-মেয়েদের দেখা 'দর্শনের' ইতিহাস থেকে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যায়, যে সেখানে পদার্থবিদ্যাগত ব্যাপারই

ঘটেছিল। দিব্যদর্শনের আবির্ভাব প্রতিবারেই ঘোষিত হয়েছে, 'বজ্র বিদ্যুৎ সহ'। ছোট্ট লুসিয়া বলেছে, দিব্যরূপের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারেই শুনেছে, 'দূরে হাউই ফাটার মত শব্দ'! সে-ছেলে-মেয়েরা সতেরো সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর যখন পঞ্চম বার দিব্যদর্শন লাভ করে, তখন কয়েক হাজার দর্শক দেখেছে, আলোর একটা গোলা ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে ঊর্ধ্বে স্বর্গপানে। চব্বিশ সালের ১৩ই মে, দিব্যদর্শনের নির্ধারিত স্থানে, ওক গাছের মাথার ওপরে তীর্থযাত্রীরা দেখেছে, 'একটা অদ্ভুত সাদা মেঘ'। তারা বলেছে, সে-মেঘ থেকে তুষার কণার মত বস্তু ঝরে পড়ে মিলিয়ে যেতে দেখেছে মাটিতে পড়ার আগেই। পরে লুসিয়া লিখেছিল, প্রতিবারেই কুমারী মেরী এসেছেন, 'ধীরে ধীরে আলোর পিঠে চড়ে'। প্রতিবারেই মাদোন্না প্রথম দেখা দিয়েছেন, ওক গাছের মাথার ওপরে আলোকবিন্দু স্থির হয়ে দাঁড়াবার পর। সরকারীভাবে জিজ্ঞাসাবাদকালে লুসিয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আবির্ভাবের কালে কুমারী মেরীর মুখের পানে সোজা না তাকিয়ে তুমি চোখ নাবিয়ে নাও কেন?' লুসিয়া বলেছিল, 'বড্ড চোখ-ধাঁধিয়ে যায় যে' (১৯)।

লুর্দের ক্ষেত্রে ভিন জাতের কোন শক্তির মূর্ত রূপের ধারণা পরিবেশিত হয়েছিল। প্রথম বর্ণনায় অনলঙ্কৃত ভাষায় বের্নাদেৎ সুবিরু পরিষ্কার বলেছিল, প্রথমে সে ঝাপসা মতন কিছু একটা দেখেছিল,......'কেমন যেন উড়ন্ত সাদা কাপড়ের মত, ময়দার থলের মত' (২০), তাছাড়া গুহার সামনে শুনতে পেয়েছে বাতাসের ঝাপটার মত একটা চাপা আওয়াজ। (২৭।৩।১৮৫৮ তারিখের নথিভুক্ত এ তথ্য রেখে গেছেন তিনজন ডাক্তার, লাক্রাম্পে, বালেথিয়া আর পেইরুস। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেও বের্নাদেৎ এ বর্ণনা দিয়েছিল (২১)।

তিনটে সম্ভাবনা আমার মনে জাগে,—

১। দিব্যদর্শনের আবির্ভাব হঠাৎ ঘটে না, প্রথমে পরমাণু-গুলোকে বিন্যস্ত করে তাকে একটা দৃশ্য রূপ পরিগ্রহ করতে হয়। (লিপিবদ্ধ নথিপত্রে 'হঠাৎ' শব্দটার বহুল ব্যবহার দেখে মনে হয়, দিব্যদ্রষ্টাদের পরীক্ষকরা তাদের 'প্রথমোচ্চারিত' কথাগুলোয় কান দেননি [আবছায়া, আবরণ, সাদা কাপড়, ইত্যাদি]। প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাঁরা মূল লক্ষ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছেন, অর্থাৎ দিব্যদর্শনের বর্ণনা দিতে বলেছেন। অমনি করেই দিব্যদর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে 'হঠাৎ',—অন্ততঃ সরকারী নথিপত্রে!)

২। সম্ভবতঃ প্রবলভাবে আয়নিত (ionised) একটা তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র গঠিত হয়, দিব্যদর্শনের আবির্ভাব মুহূর্তে। বাতাস তখন সঙ্কুচিত হয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, ফলে বিভিন্ন গ্রামের এবং স্তরের শব্দ-স্পন্দন উত্থিত হয়ে একটা 'চাপা ঝঞ্ঝাবিক্ষোভের মত শব্দ তোলে। গুহা থেকে বায়ু শোষিত হয়, যেন বহির্মুখী রন্ধ্রপথে প্রবাহিত বায়ুকে শোষণ করে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে।

৩। আবির্ভূত রূপের যদি বিলোপ ঘটে, তাহলে তার শূন্য স্থানে বাতাস ছুটে যায় আর চুম্বকিত ক্ষেত্রের স্বতঃস্ফূর্ত বিলুপ্তির সঙ্গে সশব্দে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। সেই কারণেই নিষ্ক্রিয় দর্শকও অনেক দিব্যদর্শনের স্থানে 'বিস্ফোরণের' শব্দ শুনতে পায়।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেও বোঝা যায় যে দিব্যদর্শনের অজ্ঞাত কারণের পেছনেও কাজ করে পদার্থবিদ্যার নিয়ম। বিশ্বস্ত দূতেরা যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে এ সব কথা জানায়, তাহলে কি তিনি শিলালেখের মত অবিনশ্বর এ সব নিয়মের কাছে মাথা নত করবেন?

মনোরোগ চিকিৎসকের কক্ষটি ভুয়ো দিব্যদর্শনের ব্যাখ্যা দেবার, ভণ্ড দিব্যদ্রষ্টাদের সারাবার উপযুক্ত স্থান। খাঁটি দিব্যদর্শনের কারণ কিন্তু মানুষের যুক্তি-তর্ক, মানুষের মস্তিষ্কের অতীত আয়নিত

(ionised) বায়ু, বজ্রঘন শব্দ, বিদ্যুৎ গোলক, ইত্যাদি এমনই কটমটে জিনিস যে বুঝতে গেলে মাথা ঘুলিয়ে যায়। মহান 'মানিতু'* কে, কে সেই শক্তিমান আত্মা, দিব্যদর্শনের ব্যাপার যিনি সংঘটিত করেন? আমি কি বলতে চাইছি, খাঁটি দিব্যদর্শনের অস্তিত্ব সত্যিই বর্তমান?

হ্যাঁ, তাই চাইছি।

হাজার হাজার মানুষ যারা বজ্রঘন শব্দ শুনেছে, দেখেছে বিদ্যুৎ গোলক অথবা সৌর অলৌকিক, তাদের সবারই তো বুদ্ধি লোপ পায়নি। দিব্যদ্রষ্টাদের অনুসরণ করে যারা দিব্যদর্শনের স্থানে গেছে, তারা তো সবাই অন্ধ ভক্ত নয়, তাদের ভেতর যে সন্দিগ্ধমনা বিজ্ঞানীও ছিল, ছিল ছিদ্রান্বেষী সাংবাদিক, তাছাড়া আর যারা ছিল, তারাও অবিশ্বাসী, তাদের কারুর মনেই সংক্রামক ধর্ম-বীজের টিকে দেওয়া ছিল না।

জাখ্ হখ্মান (২১) ফ্রান্সের লায়ন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের মনোবিৎ এবং মনোরোগ চিকিৎসক। তিনি বলেছেন, চিরকালই যারা ধর্মপ্রাণ, অবিসম্বাদিতভাবে বিশ্বাসী যারা, 'পবিত্র ঘটনার' যৌথ অভিভাবে তারাই অনুপ্রাণিত হয়। মনোভিনয়ের (psychodrama) অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বলেছেন,—

> সমাজমিতির (Sociometry) একটা তত্ত্বগত আদর্শ আছে, যার কেন্দ্রে আছে সামাজিক পরমাণু (Social atom)। ধরে নিতে হবে, সেই পরমাণুই সুষুম্নাকেন্দ্র, একটি বিশেষ পরিবেশে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের সম্পর্কে যার উৎপত্তি। এ সম্বন্ধ পারস্পরিক সম্পর্কগত শৃঙ্খলজালের অন্তর্গত, যার উদ্ভব আবেগ-অনুভূতিগত প্রবাহ থেকে।

*উত্তর আমেরিকার ইণ্ডীয়দের এক অতিপ্রাকৃত আত্মা, প্রকৃতিকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করেন।—অনুবাদক।

কিন্তু 'সামাজিক পরমাণুর' সমসমাজ গঠিত হয় তীর্থক্ষেত্রের মত স্থানেই, যথা লুর্দের মত জায়গায়, তীর্থযাত্রীরা যেখানে পরস্পর সংযুক্ত 'আবেগ-অনুভূতির ধারায়'। যেখানে কৌতূহল এবং মানবগোষ্ঠীর অলৌকিক দর্শনাকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, সেখানে এর অস্তিত্ব থাকে না। দিব্যদ্রষ্টার কাছে অলৌকিক আবির্ভাবের ঘোষণা সূচিত হয় তখনই, যখন সে এক সম্মোহিত অবস্থার শাসনাধীন থাকে, সে অবস্থাকে আমি বলি, এক অসহায় অবস্থা। আবির্ভূত আত্মা সব সময়ে নিজেকে নিরাপদে রাখে স্থান এবং কাল নির্দেশ করে।

ফতিমার তিনটে ছেলে-মেয়ের ওপর দৈবাদেশ হয়েছিল, 'আগামী মাসের ১৩ই জুলাই তোমরা এখানে এসো'। মাদোন্না ঠিক সময়ে দেখা দিয়েছিলেন প্রতিশ্রুত স্থানে। সতেরো সালের ১৩ই জুলাই, বেলা আড়াইটে ছিল ফতিমার ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী কাঁটায় কাঁটায় জ্যোতিষিক দ্বিপ্রহর। রূপসী রমণী আবার ওই ছেলে-মেয়েদের ডাকলেন, সেই একই জায়গায় দেখা করার জন্যে। (কেন ?) দিব্যদর্শন (প্রেরক-যন্ত্র) থেকে দিব্যদ্রষ্টার (গ্রাহক-যন্ত্র) মাঝে প্রেরণার আদান-প্রদান চালু করা হয়েছিল !

এ পর্যন্ত তো বেশ ভালোই। কিন্তু স্থান এবং কালের গণ্ডিতে দিব্যদর্শন বাঁধা কেন ? আমি শুধু একটা উদ্ভট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে পারি, কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে আমাদের তথাকথিত জানা ব্যাপারগুলোর সঙ্গে এটা ঠিক খাপ খাবে না। তবে, আমার মনে হয় কাপুরুষের মতন মুখ লুকিয়ে বসে থাকার চেয়ে, পারলে একটা তত্ত্ব যোগানো অনেক ভালো। ঐতিহাসিক ইগন ফ্রিদেল-এর (১৮৭৮-১৯৩৮) সাবধানবাণীর কথা অবশ্য আমি জানি। অতি সাহসীদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন,—

> এইগুলিই প্রকৃত অলৌকিক। আমরা নিষিদ্ধকে (taboo) আঁকড়ে ধরি, তাতে শুধু হাতই পোড়ে না,

জিবটাও পোড়ে আর, আশ্চর্য হবার কিছু নেই, যদি
হঠাৎ দেখি, আমরা নিজেরাই সেই আগুনে পড়ে গেছি।

বহু আলোবছরের (এক আলোবছর=ছয় শঙ্খ পরিমাণ মাইল =৬,০০০,০০০,০০০,০০০) দূরত্ব পেরিয়ে ভিন জগতের মানুষ এ জগতের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে কেমন করে, কিম্বা এ পারের মানুষই বা ওপারের মানুষের নাগাল পায় কেমন করে? বেতার-তরঙ্গ মারফত? না কি আলোর ইশারা বা রেডার মারফত? সমস্ত তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গই আলোর গতিতে বাঁধা। বেতার অথবা রেডার যোগাযোগ করতে তো হাজার হাজার পুরুষ পার হয়ে যাবে।

যে তরঙ্গ দূরেক্ষণ ছবি বয়ে নিয়ে যায়, সে তরঙ্গ ডেসিমিটার-তরঙ্গ, তার চলন আলোক রশ্মির মত সরল রেখায়। যদি বেতার-প্রচার স্টেশনেব পোল ছুঁয়ে আলোক রশ্মির পিঠে চড়িয়ে কোন দূরেক্ষণ ছবি পাঠাতে চাই স্বাতি নক্ষত্রের হাতে, তাহলে তা ফেরত পাবো অন্ততঃ ৮২ বছর পরে, কেননা পৃথিবী থেকে স্বাতি নক্ষত্রের দূরত্ব ৪১ আলোবছর। একালের 'ডাক ব্যবস্থাতেও' সে যে অনেক দূরের পাড়ি!

আরো দুটো ঠিকানার কথা বলে রাখি,—একটা অগস্ত (Riegel আকাশের দক্ষিণ সীমান্তের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র) আর একটা স্থাণু অথবা বাণলিঙ্গ (Canopus—কালপুরুষের বাঁ পায়ের অত্যুজ্জ্বল দানব-নক্ষত্র)—তাদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে ৯০০ আলো-বছর। দূরের ওই দুই দোস্তদের কাছে যদি পত্তোর পাঠাতে চাই, তাহলে তো আগে জানা দরকার, তারা বেঁচে আছে, না তাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটেছে। আজ তাদের যে আলোটি নজরে পড়ছে, সে তো ঘর ছেড়েছে ৯০০ আলোবছর আগে! ইতিমধ্যে তো সেখানে কত কিছুই ঘটে যেতে পারে! তাহলে তাদের কাছে পত্তোর দিয়ে লাভ কি? যদি ধরেও নিই যে তারা সুখে, স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না করছে,

আছেও বহাল তবিয়তে, প্রাযুক্তিক সভ্যতাও তাদের বেশ উঁচু মানের, তাহলেও তো আমার চিঠির প্রাপ্তি সংবাদটা পেতে পেতে অন্ততঃ ১৮০০ আলোবছর। কে বসে থাকবে অতদিন, তাদের চিঠির প্রত্যাশায় ? কার অত রস আছে, বাপু ! আন্তর্নাক্ষত্র যোগা-যোগের ক্ষেত্রে তাই ভিন্নতর, সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা বের করতে হবে। সুবিশাল আধুনিক আধিবৃত্তিক প্রতিফলকেও কিচ্ছু হবে না। উপযুক্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের খবর আজো কেউ জানে না। সে ক্ষেত্রে এই বিশাল দূরত্বে বর্তমান বুদ্ধিমানদের ভেতর খবরাখবর করা কি সম্ভব ?

হ্যাঁ সম্ভব, দিব্যদর্শন মারফত সম্ভব।

যাঁর আগ্রহ আছে, আমার এই দূরকল্পী সমন্বয়ের ধারণা অনুযায়ী চিন্তা করবার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার এবং লক্ষ যাঁর স্থির, অচঞ্চল, তিনি একবার এ পথে পা বাড়িয়ে দেখুন। তারপর নিজেই উপলব্ধি করবেন, এক উচ্চতর চেতনার জগৎ থেকে এই বস্তুবাদী সমন্বয়কে কিঞ্চিৎ করুণার চোখে দেখতে পাচ্ছেন, সমস্ত অসার যুক্তি-তর্ক-সংস্কারকে অনেক পেছনে ফেলে।

বুদ্ধির প্রথম বিকাশ ঘটেছিল, কোন একদিন আমাদেরই ছায়া-পথের কোথাও। জ্যোতিষ্পদার্থবিৎ জানেন, আমাদের সৌরজগতের চেয়ে ঢের ঢের পুরোন সৌরজগৎ আরো অনেক আছে, বয়সের যাদের গাছ-পাথর নেই। অতএব, সে সব জায়গার কোথাও তেমনি বয়োজ্যেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীবও আছে, এমন কথা ধরে নিতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই। সে বুদ্ধিমানেরাও প্রশ্ন করেছে, আরো জানার প্রয়োজনে। বহির্বিশ্বে পাড়ি জমাবার আগে সে বুদ্ধিমানেরাও জ্যোতিষীয় এবং জ্যোতিষ্পদার্থগত কত গবেষণা নিশ্চয় করেছে, (ঠিক যেমন আমাদের বিজ্ঞানীরা করেছেন কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে পাঠাবার আগে)। তারা যখন মহাকাশযান তৈরীতে প্রথম হাত দিয়েছে, তখন তাদেরও অঙ্কশাস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতকুল একযোগে হিসেব করেছে,

বের করেছে, মহাকাশযানের উচ্চ বেগের পরিপ্রেক্ষিতে ছেড়ে যাওয়া গ্রহ এবং মহাকাশযানের মাঝে কালের মান হবে ভিন্নতরো।

অকল্পনীয় মনে হচ্ছে ?

বিজ্ঞান তো অনেক কাল আগেই প্রমাণ করেছে, উচ্চতর বেগে আন্তর্নাক্ষত্র যাত্রায় কাল-মানের ভিন্নতা, প্রতিষ্ঠিত সত্য। কাল-মানের এই ভিন্নতা, যার নাম কাল-প্রসরণ (time dilation), আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদের কালে প্রথম, কিন্তু এ নিয়ম চিরন্তন, প্রথম মহাকাশযাত্রীর বেলাতেও এ নিয়ম সমান কার্যকর ছিল। ফ্রীদ্‌রিখ্ শিলের্ তাঁর 'পৃথিবী বিভাজন' (Teilung der Erde) কবিতায় প্রশ্ন করেছেন, জিউসের জবাণীতে, 'আমি কী করবো ?' বহির্জাগতিক জীবও ওই একই প্রশ্ন করেছে, 'আমরা কী করবো ?' কেমন করে সে লক্ষ্যে পৌঁছবে অভিযানের শেষে ? জ্ঞানের দিগন্ত কেমন করে বিস্তৃততর করবে ? মহাকাশ পাড়ি দিয়ে যদি হাজার হাজার বছর লেগে যায় ঘরে ফিরে আসতে ? যদি ফিরে এসে দেখে, কেউ নেই, কেউ বেঁচে নেই, এ যাত্রার ফলাফল বিচার করতে কেউ নেই, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই ? কী লাভ তাহলে এমন যাত্রায় ?

বহির্জাগতিক পণ্ডিতসমাজ চিন্তা করেছেন, তারপর বুঝেছেন, দেশ এবং কালকে জয় করবার একমাত্র পন্থা, মহাবিশ্বের সম্ভাব্য নানা স্থানে, নানা কালে আপন উত্তরপুরুষের ব্যবস্থা করা— স্বভাবতঃই 'নিজ অবয়বে'! তাই, নভশ্চরদের শিক্ষা দিয়েছেন, দীক্ষা দিয়েছেন, আদেশ করেছেন দীর্ঘ যাত্রার পাড়িতে আপন গ্রহের অনুকূল সমস্ত গ্রহের সন্ধান করতে, সে সব জায়গায় অবতরণ করতে। তারপর, প্রত্যেকটি অনুকূল গ্রহের উন্নততম জীবকে আলাদা করে নিয়ে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত কৃত্রিম পরিব্যক্তির সাহায্যে তাদের বুদ্ধিমান করে তুলতে। বুদ্ধিমান তো করে তুলবে, কিন্তু কার আদলে ? নিঃসন্দেহে, 'তাদের আপন আদলে'।

এমনি করে কালকে তারা জয় করেছে, অমনই সহজ একটি কৌশল প্রয়োগ করে। তখন থেকে তাদেরই মতন এক একটি গোষ্ঠী—তাদেরই 'অবয়বে' তৈরী—তাদেরই আপন গ্রহের 'মতন' গ্রহে ঘর বেঁধেছে নানা সময়ে।

কালক্রম অনুযায়ী গড়ে তোলা সেই সুপরিকল্পিত প্রজননের ফলে সম্ভব হয়েছে, 'কাল-বদল' (time shift) সত্ত্বেও, এক আধা-অনন্ত বদলা-দৌড়ে (relay race) তাদের আপন আহৃত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার দান করা। সে সব অভিযানের লক্ষ্য ছিল জ্ঞানবৃদ্ধি, সে লক্ষ্য সাধিত হয়েছে এমনি করে।

এ কথা দাবি করা নেহাতই বাতুলতা যে মানব বুদ্ধি অপূর্ব এবং অনন্ত বিশ্বে একমেবাদ্বিতীয়। কোটি কোটি বুদ্ধিমান জীব থাকতে পারে মহাবিশ্বে, কিন্তু 'আমাদের' বুদ্ধির জন্যে যার কাছে আমরা ঋণী, তার থেকে ভিন্নতরো বুদ্ধিমান প্রাণী আমাদের এ গ্রহের সন্ধান করেনি। বৃহস্পতির বুদ্ধিমান জীব বুধে কেন যাবে, যদি সে গ্রহ তার আপন গ্রহের সমতুল না হয়? বহির্জাগতিক ব্যবস্থার নির্দেশ আছে হোমারের অডিসিতে,

সর্বত্র সমান সর্বকালে,
দেবতাও বিহার করে দেবতার সনে!

আমাদের মতন বুদ্ধিমান জীব ছায়াপথে আরো আছে, কেননা বহির্জাগতিক জীব তার অভীষ্ট সিদ্ধি করেছে, বহু গ্রহের আপন জীবকে রূপায়িত করে তার 'নিজ অবয়বে', কৃত্রিম পরিব্যক্তির সাহায্যে। আজো আমরা না জানলেও, আমাদের ছায়াপথে বুদ্ধিমান জীব এমন আরো অনেক আছে, যাদের চিন্তা-ধারা, যাদের কর্মপদ্ধতি আমাদেরই চিন্তা, আমাদের কর্মের সুরে বাঁধা, যাদের আনন্দ-বেদনার অনুভূতিও আমাদেরই মতন মধুর। এই মহা-জাগতিক পরিবারসমূহের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতি নিকট, তাদের

মস্তিষ্কও আমাদের মস্তিষ্কের ধারাতেই ক্রিয়াশীল, আমাদের উৎপত্তি যে সেই একই উৎস থেকে, গ্রহান্তরের সেই নভশ্চরদের 'আদলেই' যে তৈরী আমরা। আমাদের এই ক্ষুদ্র স্বল্পপটু চিন্তা-যন্ত্রটির মতই সেই সব মস্তিষ্কেও বাইরের প্রভাব সমান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দিব্যদর্শনের প্রথম শিখাটি কি তারাই প্রজ্বলিত করে?

নৃবিজ্ঞানী বলেন, বুদ্ধিমান জীবনের বিকাশ ঘটেছে, ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন, ক্রমবিকাশ এবং পরিব্যক্তির পথে। কেউ হয়তো ওই কথার জের টেনে বলবে, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কেন ওই 'প্রাকৃতিক নির্বাচন, ক্রমবিকাশ এবং পরিব্যক্তির পথে' বুদ্ধিমান হননি? বাঁদর পরিবারের (আমাদের পূর্বপুরুষ!) বাকী সবটাই আজো বনবাসী বলে! ক্রমবিকাশের পথে আমাদের মতন একই পরিমাণ সময় তাদেরও হাতে ছিল বলে! তাদের ক্রোমোসোমের* আকৃতি এবং সংখ্যা আমাদের গুলোর মত সমান আকৃতি, সমান সংখ্যাবিশিষ্ট নয় বলে!

আমাদের পূর্বপুরুষ, মানবাকৃতি বানরের ছিল ৪৮টি Y ক্রোমোসোম, আমাদের আছে ৪৬টি XY ক্রোমোসোম। প্রজননশাস্ত্রবিৎ (geneticist) পণ্ডিতকুলের কাছে (এবং নৃবিজ্ঞানীদের কাছেও বটে!) আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা আমায় বুঝিয়ে দিন, কেমন করে ৪৮টি Y ক্রোমোসোম, ৪৬টি XY ক্রোমোসোমে পরিবর্তিত হল এবং সেই ভিন্ন সংখ্যা এবং আকৃতির ক্রোমোসোমবিশিষ্ট জীবের প্রজনে সার্থক-বংশবৃদ্ধিই বা ঘটলো কেমন করে? আশা করি, জবাব

*ক্রোমোসোম—কোষ-কেন্দ্রস্থ ক্রোম্যাটিনের কাঠির মত অংশবিশেষ। কোষ-বিভাজনে এবং বংশগত বৈশিষ্ট্য প্রচালনে এর ক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি প্রজাতির একটি বিশেষ সংখ্যক এবং বিশেষ আকৃতির ক্রোমোসোম থাকে।

ক্রোম্যাটিন—সহজে রঞ্জন-সম্ভব কোষ-কেন্দ্রস্থ তন্ত্রী। সে বস্তু গঠিত ডি. এন. এ., আর. এন. এ. এবং নানা প্রোটিন দিয়ে। কোষ-বিভাজনের সময় তা থেকেই গঠিত হয় ক্রোমোসোম।

পাবো, ছুটো Y ক্রোমোসোম এক সঙ্গে থাকতে থাকতে দৈবাৎ একটা X ক্রোমোসোম সৃষ্টি করলো। অমনটা হবে না-ই বা কেন? কিন্তু, ওর ভেতরে একটা বড় 'কিন্তু' আছে। যে জীবের গঠনে জন্মসৃষ্টিগত এ ত্রুটি আছে, সে পুরুষই হোক বা নারীই হোক, অসম ক্রোমোসোম সংখ্যার কারণে নরাকৃতি বানরের সঙ্গে কখনোই সে জোড় বাঁধতে পারবে না।

ওই অযৌক্তিক ('দৈবাৎ') ব্যাখ্যাটি মেনে নিতে হলে,—অঙ্কশাস্ত্রের দিক্ থেকে অসম্ভব,—প্রায় একই সময়ে ঘটিত ক্রোমোসোমের দৈবাৎ-ত্রুটির ব্যাপারটির পুনরাবৃত্তির কথাও হজম করতে হয় এবং সেই দ্বিতীয় 'স্বতঃবৃত্ত পরিব্যক্তিও' প্রথম দৈবাৎ ঘটিত ব্যাপারটির সঙ্গে সঙ্গেই হয়েছে, তাও মেনে নিতে হয়। একটা জোড়ায় থাকে ছুটো ভাগ। যদি প্রজন ঘটাতে হয়, তাহলে ছুটো ভাগের প্রকৃতি এক হতে হবে। সমস্যার এমন একটা সমাধান আশা করা মানে, বড় বেশি আশা করা। বেখাপ্পা প্রশ্ন করা আপনার স্বভাব হলে, উত্তরটাও ওই এক জাতেরই হবে বৈকি!

ইংরেজ প্রজননশাস্ত্রী ফ্রান্সিস্ হ্যারি ক্রিক বাষট্টি সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তাঁর বংশগতি (DNA) সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে। বুদ্ধির উদয় সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে 'ইকারাস' (২৩) পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে তিনি দৃঢ়প্রত্যয় যে, পৃথিবীর জীবন সক্রিয় হয়ে উঠেছে, বহির্জাগতিক 'জীন' (বংশগতির একটি নিয়ন্ত্রক উপাদান) মারফত। এই বিশেষ প্রকল্পটি তুলে ধরার কারণে আমাকে অনেকে অনেক গালমন্দ দিয়েছেন। জগদ্বিখ্যাত প্রজননশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সে প্রবন্ধ পড়ে আমার চেয়ে বেশি আনন্দ বোধ হয় আর কেউ পায়নি।

*   *   *

আমাদের বুদ্ধির বহির্জাগতিক উৎসই যে বিশুদ্ধ দিব্যদর্শনের

ব্যাখ্যা, এ প্রকল্প প্রতিপন্ন করার আগে নভশ্চর সংক্রান্ত আমার তত্ত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তিটিকে সরাতে হবে।

নিউ ইয়র্কের জ্যোতির্বিদ্ এবং বহির্জীববিৎ (exobiologist) পণ্ডিত, অধ্যাপক কার্ল সেগান বলেন, বহির্বিশ্বের মানুষের আমাদের গ্রহে আসা অসম্ভব, কারণ—বিশাল সংখ্যক সম্ভাব্য অনুকূল গ্রহের অস্তিত্ব ধরে নিলেও,—মানুষের ক্রমবিকাশের গোটা ইতিহাসের ভেতর তার বুদ্ধিমান হয়ে ওঠার বিশেষ ক্ষণটির প্রাক্ স্থিরীকরণ বহির্জাগতিক মানুষের দ্বারা সম্ভব ছিল না। অতএব বহির্বিশ্বের মানুষ যদি পৃথিবীতে পদার্পণ করে থাকে, ধরা যাক, তিরিশ লাখ বছর আগে, তাহলে—আমার নানা বইয়ে যেমন দাবি করেছি,—পুরাণে-কিম্বদন্তীতে সে ঘটনার কথা লেখা থাকার কথা নয়। তাছাড়া বহির্জাগতিক মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে (ক) আমাদের গ্রহ একটি সম্ভাবনাময় লক্ষ্য, অথবা (খ) নরাকার বানর তাদের ক্রমবিকাশের পথে সবে মাত্র বুদ্ধি লাভ করেছে।

বহির্জাগতিক মানুষ আসার 'পরেই' পৃথিবীর মানুষ (Homo-sapiens) বুদ্ধিমান হয়েছে। তিরিশ লক্ষ বছর আগেই যদি তারা এসে থাকে, তাহলে বুদ্ধিও আছে সেই তখন থেকে। যদি তারা পাঁচ লাখ বছর আগে এসে থাকে তাহলে বুদ্ধির উদয়মুহূর্তটিও পেছিয়ে সেইখানে চলে যাবে। পার্থিব অনুমান অবাস্তব। বুদ্ধির উদয়ের ক্ষণটিকে যখনই ধরা হোক না কেন, বহির্জাগতিক মানুষের আগমনও ঘটেছে সেই তখনই। সেই ক্ষণটি কালের যাত্রাপথের যেখানেই থাক, তাতে কিছু যায় আসে না।

আন্তর্নাক্ষত্র পাড়ির ক্ষেত্রে আমাদের হাতে আজ যতটুকু প্রযুক্তি আছে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি প্রয়োজন। যে-বহির্জাগতিক মানুষ আমাদের বুদ্ধিমান করেছে কৃত্রিম পরিব্যক্তির সাহায্যে, প্রযুক্তির দিক্ থেকে তারা যে আমাদের চেয়ে অনেক

দূর এগিয়েছিল, তাই নয়, অবপারমাণবিক (subatomic) জগৎসমূহ সম্পর্কে 'এবং' মস্তিষ্কের 'সত্যিকার' ক্রিয়া-পদ্ধতি সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান ছিল সুদূর-প্রসারী। সে-জ্ঞান আমাদের নাগালের অনেক অনেক উর্ধ্বে।

মানব-মস্তিষ্কের ব্যাপারের সঙ্গে যদি দূর উচ্চস্তরের বুদ্ধিমত্তা যোগ করি, তাহলে আমাদের চেতনার সৃষ্টিকর্তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের (IQ = Intelligence quotient) একটা নেহাত সাদা-মাটা ধারণা করতে পারবো। অতীন্দ্রিয় কোন উপলব্ধি (extrasensory perception) সম্পর্কে নতুন কিছু নেই, কেননা সে যে আজ বড়-গবেষণার বস্তু। আজ আমরা যাকে অনেক যত্ন করে, অনেক ব্যয় করে পুনরাবিষ্কার করে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছি, চাইছি করতলগত করতে, তাকে যে অনেক কাল আগের সেই প্রাগিতিহাসের কালের কৃত্রিম পরিব্যক্তির দিনেই ভরে দেওয়া হয়েছিল আমাদের মস্তিষ্কের মণিকোঠায়।

এ কথা আজ সবাই জানে যে আমাদের মস্তিষ্কের মাত্র ১/১০ ভাগ সক্রিয়। বাকী প্রধান অংশ অর্থাৎ ৯/১০ ভাগ কী করছে? সেটাও তো আমাদের কাজে লাগতে পারতো? প্রাকৃতিক নির্বাচন, ক্রমবিকাশ এবং স্বাভাবিক পরিব্যক্তি ১৩০০ থেকে ১৮০০ গ্রাম ওজনের মস্তিষ্ক কেন তৈরী করলো, যদি মানুষ তা ব্যবহারই না করতে পারবে? তাছাড়া, অতীন্দ্রিয় সত্তার যারা অধিকারী, যথা আলোকদ্রষ্টা যারা, যারা চেতনা-সংবাহক (telepathist), যারা গতি-সংবাহক (telekinetist), যারা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, তারাই প্রমাণ করে যে দানব-মস্তিষ্কটার যেটুকু নিত্যকর্ম, তার চেয়ে তার ক্ষমতা বহু বহু গুণ বেশি, কত গুণ তা আমাদের ধারণার অতীত।

বহির্জাগতিক নভশ্চরেরা যখন তাদের আপন জন্মসৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের 'কলম' করে বসিয়ে দিয়েছিল নরাকৃতি বানরের মগজে,—

অমন 'কলম' আমরাও করি, ছোট আকারে গাছ-গাছড়া অথবা গৃহপালিত জন্তুর ক্ষেত্রে,—তখন তারা তাদের অত্যুন্নত অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি-শক্তিটিকেও স্থানান্তরিত করেছিল তাদের 'আপন অবয়বে অবয়বীদের' সত্তায়। নরবানরকে তারা 'মানুষ' করেছিল নিছক করুণা, প্রেম অথবা উপচিকীর্ষার বশে নিশ্চয়ই নয়, তাদের হাতে মধুসূদনদাদার ভাঁড় থাকলেও নয়,—ধর্মশাস্ত্র যা-ই বলুন না কেন।

ভিনগ্রহবাসীদের ওটা প্রয়োজন ছিল। যে-জ্ঞান তারা অর্জন করেছিল, তাকে রক্ষে করতে চেয়েছিল! তারা জানতো, 'দেশে' ফিরে যাবার অনেক অনেক আগেই সেখানকার মানুষ 'ধূলো হয়ে যাবে,' তাই তারা চেয়েছিল, নানান জায়গায় 'জ্ঞানের ভাঁড়ার' তৈরী করতে! সেই ভাঁড়ারগুলোই হয়ে উঠলো, তাদের আপন অবয়বে তৈরী ছেলে-মেয়েদের যোগাযোগ-কেন্দ্র।

তারপর, অনেক জায়গায় স্থাপিত হল প্রেরক এবং গ্রাহক স্টেশন। কিন্তু যোগাযোগ স্থাপিত হবে কেমন করে? অপরিহার্য মিশ্র ব্যতিচারের কারণে তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে নানান দিকে, দূরে দূরান্তরে, কিন্তু চিন্তার স্থানান্তরণ বাধাবন্ধ-হারা। চেতনা-সংবহনের (telepathy) ক্ষেত্রে আধুনিক গবেষকরা প্রমাণ করেছেন পরিষ্কারভাবে, প্রেরকের কাছ থেকে শত শত মাইল দূরে থাকা গ্রাহকের কাছেও চিন্তা-তরঙ্গের সংবহন কত সহজ। গ্রাহককে সীসের পাতে ঢাকা, সব রকম তরঙ্গরোধী ফ্যারাডে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয়েছে, কিন্তু চিন্তা-তরঙ্গের গতি থেকেছে অব্যাহত, কেউ তাকে আটকাতে পারেনি।

তা সত্ত্বেও চেতনা-সংবহনের ক্ষেত্রে ভাষা একটা অলঙ্ঘ্য বাধা। কৃত্রিম-পরিব্যক্তিতে বিশেষজ্ঞ নভশ্চরেরা তাদের দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিল, নানা ভাষার উদ্ভব। হুবহু নিজেদের মতন করে গড়া বলে তারা জানতো, নতুন এ জাত এবং তার নানা প্রজাতির শত্রুও থাকবে,

যুদ্ধবিগ্রহও হবে। অতএব, ভাষা সদ্যজাত জাতের একটা রক্ষাকবচ। কিন্তু ভাষার বিভিন্নতার সঙ্গে ন্যায়-নীতিরও তারতম্য ঘটবে, বৈজ্ঞানিক এবং প্রাযুক্তিক জ্ঞানও প্রকাশিত হবে ভিন্নভাবে। ভাষার বাধার কারণে একের বেতার-বার্তা অপরে বুঝবে না। শুধু একটি মাত্র উপায় বাকী ছিল, সে উপায়, আবেগ-অনুভূতি দিয়ে দেখা-বোঝা, চোখ দিয়ে শোনা। ভাষা যেখানে মূক, চোখই তো শ্রবণ সেখানে। প্রেম, বিশ্বাস, ঘৃণা, বিপদ, ইত্যাদির অনুভূতি সর্বত্র পরিচিত—সর্বত্র এক। ছবির ভাষা তো সর্বত্র বোধ্য, তা দা ভিঞ্চিরই আঁকা হোক, অথবা অবন ঠাকুরেরই হোক।

বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ দিব্যদর্শনের গোড়ায় থাকে একটা মিষ্টি খবর, 'তোমার ভালো হোক', 'ভয় পেয়ো না'। বুদ্ধিমান জীবদের ভেতর এমন আবেগ-অনুভূতি মারফত মন জানাজানি সম্ভবও বটে, কার্যকরও বটে। 'প্রেম' এবং 'শান্তির' মত শব্দ কোন 'একটি' ভাষায় প্রচারিত হয়নি, তাহলে তা সর্বত্র বোধ্য হত না। ('এস্পেরাণ্টোর' ইচ্ছে, সে একটা সর্বজনবোধ্য ভাষা হবে, কিন্তু সে আজো পড়ে আছে, ভাষা-গবেষণাগারের আঁস্তাকুড়ে) তাই, 'প্রেম' এবং 'শান্তির' অনুভূতিই পাঠানো হয়েছিল। অনুভূতির প্রেরণাকে দৃঢ় করা হয়েছে ছবি দিয়ে, প্রতীক দিয়ে। ছবির ভাষা চিরকালই আন্তর্জাতিক, বিশ্বজনীন। মোনালিসার হাসি পারীর মানুষকে যেমন আনন্দ দেয়, কলকাতার মানুষের মনকেও তেমনি আনন্দে ভরিয়ে দেয়।

সঙ্গীতকে ব্যবহার করা হয়েছে তৃতীয় স্পন্দন হিসেবে। ঝালা, তুন, ঝঙ্কারের পরস্পর সজ্ঘাতে মস্তিষ্ক-কোষ আবেগ-কম্পিত হয়ে মুক্তি দেয় দোলনকে, ঘটে শক্তির রূপান্তর।

বয়স্কেরা আধুনিক সঙ্গীতে প্রায়ই অত্যন্ত বিরক্ত হন। কিন্তু তার বিচিত্র স্পন্দনের তালে তালে আধুনিক যুব-মনে এক নতুন চেতনার উদয় হয়। যন্ত্রসৃষ্ট মহাজাগতিক স্পন্দন যেন তাদের দেহ

ভেদ করে অন্তরে প্রবেশ করে, মাদকের প্রভাবে যেমন মস্তিষ্কের অব- অথবা অতিচেতন স্তরে সাড়া জাগে, এ যেন কতকটা সেই রকম। 'নতুন গানের' ধ্বনি-প্রতিধ্বনির দ্যোতনা যুব-মনের প্রসারিত চেতনাকে উদ্দীপিত করে। ভাবতে ভারী অবাক লাগে যে, এই নতুন 'চেতনার' আবির্ভাব ঘটে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সর্বত্র এবং একই কালে। কোন একটি দেশের বিশেষ রুচির ব্যাপার তো নয়। রুচির এমন সর্বজনীনতা সত্যিই বিস্ময়কর।

কী সে শক্তি যে একই কালে কোরিয়ার এবং লণ্ডনের সঙ্গীতশিল্পীকে 'হঠাৎ' একই জাতের সঙ্গীত রচনার প্রেরণা যোগায়? কী কারণে ওই একই চেতনা পারী, বের্লিন, কোলকাতার শিল্পীর মনেও জাগে? কী কারণে ছবিতে হঠাৎ বিমূর্তন এবং অধিবাস্তবতার আধিপত্য ঘটলো? কোথা হতে আসে অমন চেনা-চেনা সীমিত প্রেরণা? নতুন ধরনের সঙ্গীতের, নতুন ঢঙের ছবির 'চাহিদার' কারণেই কি অমন সুর, অমন ছবি-সৃষ্টির প্রেরণা জেগেছে? নাকি 'আধুনিক' বলেই যুব-মন রস পেয়েছে? ওয়ল্ট্‌স্‌ নাচ-গানের খুব চল্‌ ছিল পাশ্চাত্য দুনিয়ায়, সে কালে তা আধুনিকও ছিল, যদিও হিন্দুদের, তথা ভারতীয়দের মনে সে-বস্তু কোনদিন সাড়া জাগায়নি। তাহলে কি সে সঙ্গীত-নৃত্য সর্বজনীন অনুভূতি জাগাবার উপযুক্ত চেতনার স্তর ভেদ করতে পারেনি?

আমার নজির-প্রমাণের শৃঙ্খলে ফাক থাকা সত্ত্বেও, মানব-মস্তিষ্কে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংবেদনশীল অনুভূতিনিচয় ধরা পড়ে, সে কথা স্বীকৃত সত্য বলেই ধরে নিচ্ছি। আমাদের অতিসূক্ষ্ম যন্ত্রও যে মানব-মস্তিষ্কের তুলনায় একান্ত নিরেস, সে কথা স্বীকার মানতেই হবে, অর্থাৎ মস্তিষ্ক যা পারে, আমাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রও তা পারে না। কোন্‌ পরিমাপ যন্ত্রে, কবে 'প্রেমের স্পন্দন' ধরা পড়েছে? কিন্তু, অতিবড় বিজ্ঞানীও তো প্রেমের আগুনে হাত পুড়িয়েছেন, তাঁরা তো

বলতে পারবেন না 'প্রেম' বলে কিছু নেই। পদার্থ এবং রসায়ন-শাস্ত্রে মৌল-পদার্থের রূপান্তরণ সম্পূর্ণ স্বীকৃত। মানব-মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে কি, আমাদের অজানা, আরো কোন মূল সূত্র আছে?

হিউস্টনের বেলর্ মেডিসিন কলেজের অধ্যাপক, জর্জ্ আংগার (২৪) হাজারো জন্তুর ওপর পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাড়িত-ঘাতের সাহায্যে মস্তিষ্কের কোষসমূহ সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং একটা নতুন বস্তুর সৃষ্টি করে—সে বস্তু, স্মৃতি-অণু। তিনি বলেছেন, 'আমরা চাই বা না চাই, একটা সত্য আমাদের ধরে নিতেই হবে যে শেষ পর্যন্ত আমাদের মস্তিষ্কই হবে কোটি কোটি স্মৃতি-অণুর ভাণ্ডার এবং প্রয়োজনে সে-স্মৃতিকে "বাজিয়ে" শোনাবার যন্ত্রও হবে সেই মস্তিষ্কই'।

মস্তিষ্কের ভেতর চিন্তা-অণুগুলো বর্তনীর (circuits) কাজ করে, যাদের মারফত অনুক্রমিত জ্ঞানকে 'ডেকে পাঠানো' যাবে। তারা বাস্তব। একবার স্পন্দিত করলেই তারা 'অপরাবাস্তব জগতের' (antimaterial world) সূক্ষ্ম অংশসমূহকে প্রভাবিত করবে। পদার্থবিৎ তাঁর সিংক্রোটন যন্ত্রে (Syncroton—মৌল-কণাসমূহকে উচ্চশক্তি প্রদানার্থে বেগবর্ধক যন্ত্র) ইলেকট্রন ভোল্ট প্রয়োগ করে যে প্রভাব ঘটান, মস্তিষ্কের ওপর আবেগও সেই প্রভাব সৃষ্টি করে। আমরা সবাই প্রেম, আনন্দ, বেদনা, সহানুভূতি, ঘৃণা, ঈর্ষারূপে নানা শক্তি-পরিবর্তক বহন করি। স্বাভাবিক অবস্থায় আবেগ-অনুভূতির প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। সম্মোহিত অথবা অভিভাবীয় উপায়ে আমরা মনের যে অবস্থায় পৌঁছোই, সেই সম্মোহিত অবস্থা আমাদের পরা-স্বাভাবিক (Paranormal) মনঃশক্তিসমূহকে উচ্চতর শক্তিতে উত্তোলিত করে। এই পর্যন্ত 'প্রমাণিত' হয়েছে, যদিও, যে সমস্ত শক্তি এ সব করে, তারা এখনো স্বীকৃত হয়নি।

বিখ্যাত রসায়ন এবং পদার্থবিৎ পণ্ডিত, স্যর উইলিয়ম ক্রুক্স্ তাঁর মিডিয়াম, ড্যানিয়েল ডগলাস হোমকে নিয়ে গবেষণাগারে

পরীক্ষা করেছিলেন। স্যর উইলিয়ামের বিশ্বাস, এমন একটা শক্তি আছে, যা কোন এক অজ্ঞাত উপায়ে দেহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। পরীক্ষাকালে ড্যানিয়েল হোম মাটি ছেড়ে কয়েক ফুট ওপরে ভেসে উঠলো, কোন এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে। স্যর উইলিয়াম লিখেছেন,—

> এ অদ্ভুত ঘটনা যে আবছা-আলোয় এক-আধবার ঘটানো হয়েছে, তা নয়, বারে বারে এ ব্যাপার ঘটানো হয়েছে, বহু শতবার এবং নানা বিভিন্ন অবস্থায়…। একবার হোম সত্তর ফুট ওপরের একটা জানালা দিয়ে ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে গিয়ে ভাসতে ভাসতেই আর একটা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। লর্ড ডানরাভেন, লর্ড লিণ্ডসে, এবং ক্যাপ্টেন উইনের মত বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন সবিস্ময়ে এবং কঠিন শপথ করে বলেছেন, 'আমরা এ ঘটনার স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত'।

ঠিক ওই রকম আর একটা ঘটনা ঘটেছিল, আটতিরিশ সালে, তিনশো দর্শকের সামনে। সে ঘটনার নায়ক ছিল, ইংরেজ মিডিয়াম, কলিন ইভান্‌স্‌। সেবারকার হাওয়ায়-ভাসার* ছবি তোলা হয়েছিল নানা দিক থেকে, নানা পর্যায়ে। এ সব ব্যাপারের পেছনে, কারণস্বরূপ যে সব শক্তি কাজ করে, তাদের সম্পর্কে মানুষ অনেক মাথা ঘামিয়েছে এবং আরো ঘামাবে। এ সব শক্তির উৎস কোথায়, সে কথা বলবার চেষ্টা করবো না। সে হবে অনেকটা 'জুয়োর দানের' মত, সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু জিতের বেলা অষ্টরম্ভা। এইটুকু জানলেই কি যথেষ্ট হবে না যে, সে শক্তিগুলোর অস্তিত্ব আছে, উপলব্ধি করা

*শূন্যে ভাসবার ক্ষমতা শুনেছি, সাধু-সন্ন্যেসীদের থাকে। মনোগতিবিদ্যাতেও (Psychokinesis) বস্তুর শূন্যে ভাসা স্বীকৃত।

যায় তাদের, প্রমাণও করা যায়? তাদের অস্তিত্বটুকুর জ্ঞানই যথেষ্ট, তা থেকেই বুঝতে পারবো, দৈবাবির্ভূত মূর্তিকে হাওয়ায় ভাসমান অবস্থায় কেন দেখা যায়, কেন মনে হয়, তারা ভারহীন। লুর্দের একটা মূর্তিকে যে বোরেঙের (Beauraing—বেলজিয়ামের নামুরের কাছে ছোট শহর) একটা বাগানে দেখা গিয়েছিল, সেও কি শূন্যে ভাসার ব্যাপার? অমন আরো অনেক বস্তুকে কি অন্যান্য দিব্যদর্শন স্থলে মনোগতীয় (Psychokinetic) উপায়ে ভাসিয়ে রাখা হয়নি? এ ধরনের বিতর্কিত বিষয়সমূহ আধুনিক গবেষণাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

*　　*　　*

বহির্জাগতিক জীব বিভিন্ন সৌরজগতে গিয়েছিল এবং অনুকূল গ্রহনিচয়ে তারা আপন বংশধর রেখে এসেছিল, আমার এই আশ্রয়-বাক্যেই অনড় থাকি। তাদের কিছু বংশধরদের সুবিধে আমাদের চেয়েও বেশি। আমাদের চেয়ে আগে তারা 'দানব-মস্তিষ্কটাকে' পোষ মানিয়েছে, করেছে উন্নত, শিক্ষিতও করেছে। (কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কাছে আগে গিয়েছিল বলে, কাল-প্রসরণ-জনিত দীর্ঘ অবকাশে, আমাদের চেয়ে কয়েক লক্ষ বছরের বেশি সুবিধে তারা পেয়েছে।) সে সুপরিপক্ক বুদ্ধিমানেরা শক্তিরূপী চেতন-অনুভূতি প্রেরণ করছে আমাদের কাছে, আমাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে, প্রসারিত করতে। আমরা যে তাদেরই ভাই-বোন, এক রক্ত যে প্রবাহিত আমাদের শিরা-উপশিরায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ থেকেই বুঝতে পারবো, আমাদের জাগতিক এবং ধর্মীয় একনায়কেরা মানব-চেতনাকে একই ধারায় কেন দীর্ঘদিন আবদ্ধ রাখতে পারেননি।

আমি জানি, একটা প্রশ্ন আমার জন্যে তোলা আছে, তার জন্যে আমি প্রস্তুত। সে প্রশ্ন, অতিবুদ্ধিমানেরা যোগাযোগ স্থাপনের

প্রয়োজনে একটা যন্ত্র কেন রেখে গেল না, তাহলে তো একটা বোতাম টিপেই কাজ হাসিল করা যেতো ?

ঠিক কথা, কিন্তু দূর যাত্রায় নভশ্চরেরা ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে যায় না, অবশ্য তেমন যন্ত্র যদি মহাকাশযান চালনার কাজে লাগে, তাহলে আলাদা কথা, তা না হলে নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহলে তাদের শত শত গ্রাহক-প্রেরক যন্ত্র মহাকাশযানে পুরে আনতে হত, কেননা তারা যে মহাবিশ্বের নানা গ্রহে বুদ্ধিমান সৃষ্টির কাজে বেরিয়েছে। তাদের সমস্ত প্রাযুক্তিক দক্ষতা দিয়ে নিশ্চয় তারা ভাবতে পারেনি যে আমরাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ কীর্তি, সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, তাহলে তারা নিজেরাই কেন নানা জায়গায় যোগাযোগকেন্দ্র স্থাপন করেনি ? কিন্তু যে মুহূর্তে তারা 'তাদের অবয়বে' আমাদের বুদ্ধিমান করেছে কৃত্রিম পরিব্যক্তির সাহায্যে, সেই মুহূর্তেই তারা দেখেছে, আমরা, তথা নররূপী বানরেরা অনুপযুক্ত। আন্তর্নাক্ষত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার পত্তন করতে প্রয়োজন হত বিশাল একটা কারখানার, তার নানা জটিল যন্ত্রপাতি তৈরী করার জন্যে, কিন্তু আমাদের বুদ্ধির উদয় মুহূর্তে সে জিনিস কোথায় ?

যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তারা উপযুক্ত গ্রহণ-প্রেরণ যন্ত্র সঙ্গে এনেছিল, তাহলেও তো সে যন্ত্র এখানে বসাতে পারতো না, এখানে যে ভূমিকম্প, বন্যা, যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা ছিল,—তারা মুখ্যু ছিল, এমন কথা তো বলতো পারবো না ! একা কালের যাত্রার পথেই সে বস্তু ধ্বংস হয়ে যেতো, তার ওপরে তো ছিল আবহাওয়ার বিধ্বংসী পরিবর্তন। চাঁদের মাটিতে রেখে আসা মার্কিন নভশ্চরদের যন্ত্রপাতি তো ইতিমধ্যেই খতম হয়ে গেছে, সেখানে তবু আবহাওয়া নেই, শুধু অতি-তাপ এবং অতি-শৈত্যেই এই অবস্থা।

মহাকাশের আগন্তুকদের পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি ছিল না ! তারা 'জানতো', যান্ত্রিক উপায়ে সৃষ্ট প্রেরক-তরঙ্গ আলোকের

গতিতে বাঁধা, তারা 'জানতো', বিশাল এই আন্তর্নাক্ষত্র দূরত্বে বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে পৌছোতে পারে না। তাহলে, মুখ্যুমী করে অযথা ও যন্ত্রপাতি বসিয়ে লাভ কী?

খাঁটি দিব্যদ্রষ্টাদের দিব্যদর্শনই মানুষকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে তার উন্নতির পথে। উন্নতির ক্ষেত্র তার যে কত বিশাল, কত বিচিত্র তা ভাবতেও অবাক লাগে। সে সব ক্ষেত্রের সম্ভাবনা বহু-ব্যাপক। এ প্রসঙ্গে আমার মনে হয়, একটা কথা অনুধাবন করা দরকার যে, শিক্ষা পেলে প্রত্যেক মস্তিষ্কই, তার উপযুক্ত পরিবেশে, অর্থাৎ মহাজাগতিক শক্তির নানা ক্ষেত্রে যোগাযোগে সক্ষম হলে, দিব্যদর্শন 'গ্রহণ' করতে পারে।

যখন বলি, আত্মকেন্দ্রিক পথে শিক্ষিত মানুষ দিব্যদর্শন লাভে উপযুক্ত, তখন কালেভদ্রে দেখা পাওয়া এক-আধটা অতিবিস্ময়কর ক্ষেত্রের কথাও বলি। বহির্জাগতিক মানুষ তাদেরই ভেতর খুঁজে পায়, 'সত্যযুগের গ্রাহকযন্ত্রকে'। সে গ্রাহকযন্ত্র আমাদের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা। তাঁদের মস্তিষ্কের ধূসরকোষসমূহ বহির্জাগতিক অনুভূতি গ্রহণের অপেক্ষায় সদা স্পন্দময়। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছিলেন ওই রকম এক 'সত্যযুগের গ্রাহকযন্ত্র'! ১৪৫২ সালে তাঁর জন্ম, মৃত্যু ১৫১৯ সালে। লোকে জানে, তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, স্থপতি এবং ভাস্কর। কম লোকেই জানে, প্রকৃতিবিজ্ঞানে এবং প্রযুক্তিশাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা সমান দক্ষ ছিল। সাম্প্রতিক কালে দা ভিঞ্চি সম্পর্কীয় পণ্ডিতেরা অদ্ভুত সব আবিষ্কার করেছেন তাঁর সম্পর্কে। চিত্রশিল্পী হিসেবে তিনি ছিলেন সে শাস্ত্রের চক্রশীর্ষে, কিন্তু বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি ছিলেন একেবারে আমাদের কালের।

মানুষের ইতিহাসে তিনি ছিলেন প্রথম প্রাযুক্তিক। তাঁর যান্ত্রিক কলা-কৌশলের নকশার খাতায় তিনি প্রবাহবিজ্ঞান (hydraulics), গতিবিজ্ঞান (dynamics) এবং স্থিতিবিজ্ঞান

(statics) সংক্রান্ত সমস্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। চেজারে বর্জার অধীনে তিনি প্রথম দুর্গ-পরিদর্শক ছিলেন। যে সমস্ত মানচিত্র তিনি এঁকেছিলেন, মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যার প্রথম নিদর্শন সেগুলো।

যুদ্ধকালীন যন্ত্রবিৎ হিসেবে তাঁর কাছে উপদেশ চাওয়া হয়েছিল এবং পরিকল্পনাও করতে বলা হয়েছিল, পিসার মানুষকে বঞ্চিত করে আর্নো নদীকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে, উদ্দেশ্য তাদের প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করা, তারা যে ফ্লোরেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

শবব্যবচ্ছেদ করে তিনি শারীরস্থানবিদ্যার ওপর বই লিখে-ছিলেন। পক্ষীর উড্ডয়ন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তিনি, মাথা ঘামিয়েছিলেন বায়ুগতিসংক্রান্ত ব্যাপারেও। বায়ুযান-নির্মাণের পরিকল্পনাতেও হাত দিয়েছিলেন।

তাঁর নকশায় প্রকৃতির আদি যান্ত্রিক-শক্তি সম্পর্কিত, সমগ্র সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদ চিত্রিত রয়েছে। ভূতত্ত্বীয় পর্যবেক্ষণ থেকে জীবাশ্মের সৃষ্টি সম্পর্কেও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। জীববিদ্যার অনুশীলনই তাঁকে বৈজ্ঞানিক নকশাকারে পরিণত করেছিল।

তিনি বুঝেছিলেন, মাধ্যাকর্ষণের কারণে কোন কিছুই চিরন্তন-গতিবিশিষ্ট হতে পারে না।

দ্বিতীয় সুলতান বায়াজিদের জন্যে বসফোরাসের ওপরে প্রকাণ্ড একটি সেতুর পরিকল্পনা করেছিলেন দা ভিঞ্চি। সে পোলের পরি-কল্পিত বিস্তৃতি ছিল, ডাঙায় ৬০০ ফুট আর জলে ১২০০০ ফুট,—অমন একটি সেতু চালু হয়েছে

দুই-পর্যায়ের একটি রকেটও আবিষ্কার করেছিলেন, সে রকেট 'তিন মাইলের বেশি উড়তে পারতো'। যন্ত্রচালিত একটি সাধনী (machine tool) তৈরী করেছিলেন, বেলনাকার গোল ছিদ্র করবার জন্যে, অমন যন্ত্র বল-বেয়ারিং তৈরীর কাজে আজ বিশেষ

প্রয়োজন। আধুনিক বোমারু বিমানে যেমন বহু-নলা মেশিনগান্ থাকে, দা ভিঞ্চির নকশায় ঠিক তেমনি একটি জিনিস পাওয়া গেছে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

সাতষটি বছর বেঁচেছিলেন তিনি।

তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর এবং স্থপতি। বিরাট প্রতিভা-শালী। তিনি যতখানি ছিলেন তার অণুমাত্র প্রকাশ করতে পেরেছি আমি।

জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখা আয়ত্ত করতে নিশ্চয় তাঁর বহু বছর লেগেছে। যে কোন একটি আবিষ্কারেই গোটা জীবন লেগে যাবার কথা।

লিওনার্দোর মস্তিষ্কে কত জ্ঞান ভরা ছিল? এ কথা মানতেই হবে, তাঁর শিল্পসৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাঝে মহাসাগরের ব্যবধান!

প্রতিভা শুধু পরিশ্রমের ফল নয়, নয় বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিতর্কের পরিণতি। আমার ধারণা, প্রতিভা প্রধানতঃ বহির্জাগতিক শক্তির কাছে অতিশিক্ষিত মস্তিষ্ককে উন্মোচন করবার ক্ষমতা। বহির্জাগতিক জীব 'জানে' কোন্ আদিশক্তি ভরা আছে মস্তিষ্কের ধূসর কোষসমূহের গর্ভে। তা যদি তারা না জানতো, তাহলে প্রতিভার আগুনের ফুলকি তারা ছড়াতে পারতো না।

এই কথাই সত্যি।

'দানব-মস্তিষ্কটা' যোগাযোগের মাধ্যম ছিলও বটে, আছেও বটে। আধুনিক গবেষণা থেকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ মিলেছে, মানুষ 'প্রাকৃতিক নিয়মের' অতীত পরামনঃশক্তির অধিকারী। তৃতীয় সহস্রাব্দের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি, আজ আমাদের মানসিক দক্ষতা যতটুকু বেড়েছে, তাতে মস্তিষ্কের সুপ্ত অজ্ঞাত শক্তিকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা আমাদের হয়েছে এবং

সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে একদিন তাকে জাগিয়ে প্রয়োজনমত, সুবিধেমত কাজেও লাগাতে পারবো। পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই আমাদের দ্বিধাগ্রস্ত প্রথম পদক্ষেপ।

কিছু 'দীক্ষিতের' কাছে—ধর্মে দীক্ষিতদের কথা বলছি না আমি—অচেতন মনের বিস্ময়কর জগতের দরজা সব সময়েই খোলা থাকে, সেখান থেকে দিব্যদর্শনরূপে অনেক অনেক বড় আবিষ্কার তাঁরা করেছেন।

দিনেমার বিজ্ঞানী, নীল্‌স্ বর্ (১৮৮৫-১৯৬২), পরমাণুতত্ত্বের যিনি শিলান্যাস করেছিলেন, বলেছিলেন, বহু বছরের ব্যর্থ গবেষণার পর কেমন করে তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলেন পরমাণুর রূপ (২৬)।

নীল্‌স্ বর্ একদিন স্বপ্ন দেখলেন, জ্বলন্ত গ্যাসের এক সূর্যের ওপর তিনি বসে রয়েছেন আর গ্রহগুলো তাঁকে ঘিরে সোঁ সোঁ করে ছুটে চলেছে, ছুটতে ছুটতে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে ক্রমাগত আর, যে-সূর্যকে তারা প্রদক্ষিণ করে চলেছে, মনে হল, তারা যেন সে-সূর্যের সঙ্গে বাঁধা অদৃশ্য কোন সুতো দিয়ে। হঠাৎ গ্যাস গেল জমে কঠিন হয়ে, গ্রহমণ্ডলসমেত সূর্য গেল থেমে নিথর হয়ে। নীল্‌স্ বর্ বলেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠলেন তিনি, বুঝলেন, স্বপ্নে যা দেখেছেন, তা-ই পরমাণুর রূপ।

সেই দিব্যদর্শনের কারণে ১৯২২ সালে নীল্‌স্ বর্‌কে ঋষিত্ব দান, থুড়ি, নোবেল পুরস্কার দান করা হয়েছিল:

আমার মতে, এ 'স্বপ্নের' মূল্য দিব্যদর্শনের সমান। ঘটনার পূর্বমুহূর্তের সোঁ সোঁ শব্দ, গ্যাসের জমে কঠিন হয়ে একটা বিশেষ রূপ নেওয়া···অন্য প্রসঙ্গে আমি এ সব কথা শুনেছি। পদার্থ-বিজ্ঞানীদের নিজস্ব একটা জগৎ আছে, সেখানে তাঁদের দিন কাটে নকশা-সূত্র-পরিকল্পনাদি নিয়ে। সে সব প্রত্যক্ষ সঙ্কেত তাঁদের নিত্যসঙ্গী। সহকর্মী এবং ছাত্রদের সঙ্গে সমস্যানিচয়ের

আলোচনা, তথা ধ্বনি-সঙ্কেতও তাঁদের নিত্যসঙ্গী। তাঁদের কাজের চাপ থেকে এক ধরনের মানসিক প্রতিপুষ্টি (Psycho-feedback) ঘটে, তা থেকে রেহাই তাঁদের নেই। আর, পদার্থবিজ্ঞানীরা তাঁদের আপন জগতের রূপের দিব্যদর্শনই শুধু লাভ করতে পারেন, যেমন নীল্স্ বর্ দেখেছিলেন 'তাঁর' পরমাণুর রূপ। তিনি বছরের পর বছর কাটিয়েছেন পরমাণুর রূপের ধ্যানে (গবেষণায়)। সে-রূপের আবির্ভাব ঘটলো একটি 'দিব্যদর্শনে'। আমরা জানি, ধার্মিকেরা কোথা থেকে তাঁদের প্রত্যক্ষ এবং ধ্বনি-সঙ্কেত পান।

আমার ধারণা, নীল্স্ বর্ স্বপ্ন পেয়েছিলেন বহির্জাগতিক প্রেরণা থেকে। অচেতন মনে অনুক্রমিত 'রূপকেই' তারা স্মরণ করেছিল —মানসিক প্রতিপুষ্টির কারণে পরমাণুর মডেল ছিল সেখানে। সেই অসাধারণ ঘটনার জন্য শিক্ষিত হয়েছিল বর্-এর মস্তিষ্ক। দিব্যদর্শন যে কেবল ধার্মিকদেরই একচেটে, এ অসম্ভব ধারণা ছাড়তে হবে। ধর্মের দাবীকেই যদি একান্তভাবে মেনে নিই, তবেই অমনটা সম্ভব হতে পারে। আমাদের বুদ্ধিমান জগতের মহৎ ব্যক্তিরা তাঁদের দিব্যদর্শনকে ভাঙিয়ে যে কিছু করবেন, তেমন বুদ্ধি তাঁদের নেই! হঠাৎ একটা ধারণা জাগলো তাঁদের মনে···বহুদিনের বহু পুরাতন প্রশ্নের জবাব তাঁরা 'দেখতে' পেলেন চোখের সামনে···অচেতন মন কিছু যেন একটা বলে দিল কানে কানে। সেই তো 'অন্তরতম সত্তা', যে কথা কয়ে উঠলো মনে মনে। বহু 'দর্শনের' সমন্বয়কে তাঁরা শুধু বলেন 'চমৎকার ধারণা'। আইনস্তাইনকে কেমন ধরনের সন্ত আখ্যা দিতেন, যদি, তাঁর চমৎকার ধারণাগুলোকে হঠাৎ পেতেন প্রেরণার বশে, তাঁদের অনুগামী ব্যক্তিবর্গের মত।

নীল্স্ বর্ই একমাত্র বিজ্ঞানী নন, যিনি খোলাখুলি স্বীকার করেছেন যে এক যুগান্তকারী ধারণার আবির্ভাব ঘটেছিল স্বপ্নে। আরো ছিলেন, যেমন অধ্যাপক ফ্রীদ্রিখ আউগুস্ত কেকালে ফন

স্ত্রাদোনিৎস (১৮২৯-১৮৯৬)। তাঁর প্রতিভার হঠাৎ আলোর ঝলকানি না পেলে পৃথিবীর কী অবস্থা হত? উনবিংশ শতাব্দীতে জৈব-রসায়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের গুরুত্ব বিরাট। কার্বন পরমাণুর চতুর্যোজ্যতার (quadrivalence) আবিষ্কারক কেকালে। তিনি বলেছিলেন, বেনজিনের (benzene) 'ঘনসন্নদ্ধ বলয়াকৃতির' অদ্ভুত বৈপ্লবিক রূপের দর্শন পেয়েছিলেন হঠাৎ, যেন স্বপ্নের ঘোরে। রাসায়নিক বস্তু উৎপাদনে সেই দিব্যদর্শনের রূপ আজো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান।

আমাদের কালের শারীরবৃত্তবিৎ (physiologist) এবং ভেষজ-বিজ্ঞানীর (pharmacologist) একটা দৃষ্টান্ত দিই। অধ্যাপক অটো লোঈ (১৮৭৩-১৯৬১) পড়াতেন গ্রাৎসে, পরে নিউ ইয়র্কে বসবাস করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, জৈবপদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার শারীরবৃত্ত এবং অক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রসংক্রান্ত ভেষজবিজ্ঞান। আবার শুধোই, লোঈ সেই দিব্য-স্বপ্ন না পেলে মানবসমাজের কী অবস্থা হত? তিনিই প্রথম মানুষ যিনি দেখিয়েছিলেন, স্নায়ুতন্ত্রে ধমনীর স্পন্দনের রাসায়নিক সংক্রমণ (আগে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল সে-সংক্রমণ বৈদ্যুতিক)। ১৯৩৬ সালে 'অটো' লোঈকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় (তাঁর স্বপ্নের জন্যে)। আমাদের এই চিন্তা-ভারাক্রান্ত দুনিয়ায় একটিও অবেদনিক ওষুধ নেই, এমন একটা অবস্থা কল্পনা করতে পারেন? যদি পারেন, তাহলে লোঈ-এর 'দিব্যদর্শনের' গুরুত্ব কতখানি, তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। যখন তিনি সে দর্শন 'পান', তখন তিনি প্রস্তুত। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত কাল উপস্থিত হলেই বহির্জাগতিক মানুষ 'পাঠিয়ে' দেয় দিব্যদর্শনের স্পন্দন।

আরো একটা কথা।

একখানা বই বেরিয়েছিল, নাম The Double

Helix। বইখানা পড়তে পড়তে কোথা দিয়ে যে সময় চলে গেছে, বুঝতেও পারিনি। অবাক হয়ে গেছি, বোবা হয়ে গেছি পড়তে পড়তে, দেখেছি, কেমন করে ধীরে ধীরে একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সংঘটিত হয়েছে। আবিষ্কারের কথা অনেক পড়েছি, কিন্তু এ আবিষ্কারটি মনকে যে এত বেশি নাড়া দিয়েছে, তার কারণ, জীবনের গূঢ়তম রহস্যের সমাধান মিলেছে এর ভেতর। সে-রহস্য ডি. এন. এ. অণুর গঠন, যার ভেতর নিহিত রয়েছে জীবের বংশ-গতির যাবতীয় তথ্য এবং কোষ-গঠনের পরিকল্পনা। সে আবিষ্কার-যজ্ঞের পুরোহিত হার্ভার্ডের অধ্যাপক জেম্‌স্‌ ডি. ওয়াটসন, ফ্রান্সিস এচ. সি. ক্রিক্‌ এবং মরিস এচ. এফ. উইলকিন্‌স্‌। বাষট্টি সালে গোটা দলটাকে ভেষজবিদ্যার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

'নেচার' পত্রিকার সমালোচকের সঙ্গে আমি একমত। তিনি লিখেছিলেন, ওয়াটসন ভেষজে নোবেল পুরস্কার না পেলে, সাহিত্যে নিশ্চয় পেতেন। আটষট্টি সালে যা পড়েছিলুম, তাতে আমার মনে একটা অবিস্মরণীয় ধারণা হয়েছিল যে ও-আবিষ্কারে যেন আমারও একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আছে। সে বইয়ের বিষয়বস্তু আমার মনে এত তাজা ছিল যে আমার অনুসন্ধানের পথে যখন দিব্যদর্শনের ব্যাপারে পৌঁছোলুম, তখন, সাত বছর পরে, বইখানি আবার তুলে নিলুম। সংকেতের যে ধারা গবেষকদের এগিয়ে নিয়ে যায়, আমার চোখে তা ফুটে উঠলো নতুন আলোর আভায়। ওয়াটসন বলেছেন, 'খেলাই করি, বেড়িয়েই বেড়াই, অথবা হালকা মনে ছুটিই কাটাই, আমার সমস্যার সম্ভাব্য নানা সমাধান এসেছে বারে বারে, প্রতিক্ষণে, বিদ্যুৎ-চমকের মত, অলৌকিক ছায়ামূর্তির মত'। তাঁর গবেষণার বিষয়সংক্রান্ত কোন সঙ্কেত এসেছে তাঁর মস্তিষ্কের দ্বারে অঘোষিত, অপ্রত্যাশিত, সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে এবং

এমন অবস্থায় যখন তাঁর মন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারের গণ্ডি থেকে অনেক অনেক দূরে……(তখন যে তিনি ফুর্তিতে মশগুল)।

> চিমনীর গা ঘেঁষে, কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে স্বপ্ন দেখছি, কেমন অদ্ভুত সুন্দর অথচ বিজ্ঞানসম্মত ব্যঞ্জনায় পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে কত ডি. এন. এ. শৃঙ্খল।……তার পরেই দেখি, রাত বারোটা বেজে গেল, মনটা বড় খুশি হয়ে উঠেছে। ফ্রান্সিস আর আমি কতদিন ভেবেছি, ডি. এন. এ.'র চেহারাটা, হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখবো, নেহাতই বিশ্রী বিরক্তিকর।……কিন্তু এখন বিস্ময়ে, আনন্দে ভরপুর মনে দেখছি, সমস্যার সমাধান কী অদ্ভুত সুন্দর, কী চমৎকার। আনন্দে বিভোর হয়ে পড়ে রইলুম দুঘণ্টা নিদ্রাহীন, দেখতে লাগলুম একজোড়া অ্যাডেনিন্ ঘুরপাক খাচ্ছে আমার চোখের ওপরে। হঠাৎ কদাচিৎ এক একটা মুহূর্তে একটা আলতো আশঙ্কা মন ছুঁয়ে যাচ্ছে, এমন সুন্দর ধারণাটা মিথ্যে নয়তো ?……

ওয়াটসনের বই থেকে এ উদ্ধৃতি কোন বিশেষ কারণে নিইনি, লক্ষ্যের পথে চলতে চলতে এমন শারদ বিদ্যুৎ-ঝলক সারা বইটির সেরা চমক। আমার দিব্যদর্শনের তত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে, ওয়াটসনের নিখুঁত বিবরণ থেকে বুঝতে পারি, তিনি এবং তাঁর সুবিদ্বান সহকর্মীরা কেমন একটার পর একটা প্রেরণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তারপর, সব শেষে এসেছে সেই আসল ধারণা, সমাধান করেছে তাঁদের কঠিন সমস্যার। সেই সব প্রেরণা, সেই সব ধারণা এসেছে একটা শক্তি-প্রেরক বুদ্ধিমান উৎস থেকে। যাঁরা চিন্তা করেছেন সূত্র এবং সঙ্কেতের ভাষায়, অণুর অবয়বের রূপ দর্শন করেছেন কল্পনায়, অনুমান করেছেন আলাপ-আলোচনায়, তাঁরাই হঠাৎ 'উপযুক্ত' হয়ে উঠেছেন, খুলে গেছে তাঁদের অচেতন মনের গোপন

দরজা, তারপর সেই বহির্জাগতিকেরা টেনে বের করেছেন তাঁদের আবিষ্কারের এক একটি রত্নকে। আমার এ যুক্তি স্বভাবতঃই এখনো অনুমান, তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে স্মরণাতীত কাল থেকে, অর্থাৎ সেই যেদিন আধুনিক মানুষকে (Homo sapiens) বুদ্ধিমান করে তোলা হয়েছিল কৃত্রিম পরিব্যক্তির সাহায্যে, সেই দিন বিশেষ করে বাছাই করা কিছু মানুষের মগজে যে জ্ঞান রাখা হয়েছিল, সেই জ্ঞানকেই বের করা হয়েছে, পূর্বনির্ধারিত ক্ষণটিতে।

অমন প্রেরণা, অমন স্বপ্ন আমার কাছে দিব্যদর্শনের সমতুল; পদার্থবিৎ এবং চিকিৎসকের নিজস্ব জগৎ আছে, সে দুনিয়ায় তাঁদের দিন কাটে তাঁদের কল্পনাকে সঙ্গী করে, তাঁদের সূত্র, তাঁদের নকশা নিয়ে, রঞ্জনরশ্মি-চিত্র, স্নায়ুতন্ত্রের গঠন এবং সুস্থ-অসুস্থ মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে। সেগুলি তাঁদের 'প্রত্যক্ষ' সঙ্কেত, তাঁদের নিত্যসঙ্গী। তাঁদের সমস্যা ঘিরে চলে কত আলাপ, কত আলোচনা, —সেই 'ধ্বনি' সঙ্কেতও তাঁদের নিত্যসহচর। তাঁদের গবেষণার একটানা চাপ থেকে একটা মানসিক প্রতিপুষ্টি গড়ে ওঠে, তা থেকে তাঁদের মুক্তি নেই। তাই, তাঁরা যে দিব্যদর্শন (=স্বপ্ন) লাভ করেন, সে তাঁদের আপন জগৎ থেকে। তাঁরা প্রেরণাকে বলেন ধারণা, এবং সহকর্মীদের ভয়ে ভীত না হলে, তাঁদের স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেন মুক্ত কণ্ঠে।

আমার মতে, স্বপ্ন—যার কথা আমি প্রমাণ করেছি কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে—ছাড়া পায় বহির্জাগতিক প্রেরণার সাহায্যে। তা থেকেই উত্তোলিত হয়, অচেতন মনে অনুক্রমিত 'মূর্তি', কারণ মস্তিষ্ককে শিক্ষিত করা হয়েছিল ওই বিশেষ ঘটনার জন্যে। জানি, গোঁড়া ধর্মান্ধেরা কোথা থেকে তাঁদের প্রত্যক্ষ এবং ধ্বনি সঙ্কেত পান।

আমার কাছে ব্যাপারটা মনে হচ্ছে, পরিষ্কার। বহির্জাগতিক

প্রেরণাই মস্তিষ্ককে প্ররোচিত করে দিব্যদর্শন সৃষ্টি করতে। দিব্যদর্শন আসলে বহির্জাগতিক 'নয়'। দিব্যদ্রষ্টা যে 'রূপ' দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে, মস্তিষ্ক সেই রূপই প্রকাশ করে। আরব দিব্যদ্রষ্টা 'দেখে' মহম্মদকে না হয়, তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা ফতিমাকে, হিন্দু 'দেখে' তার কোন দেবতাকে, মার্কিন ইণ্ডীয় 'দেখে' মানিতুকে···আর রোমান ক্যাথলিক 'দেখে' যিশুকে, মা মেরীকে, 'দেখে' দেবদূতদের, সাধুসন্তদের। দিব্যদর্শন প্রাপ্তদের প্রত্যেকে তাদের আপন পরিচিত ধর্মজগতের ধারণাই প্রকাশ করে।

কোন খৃস্টানের দিব্যদর্শনের কথা প্রচারিত হলে এবং তা যদি যথেষ্ট রহস্যময় এবং আকর্ষণীয় হয়, তাহলে পোপ কর্তৃক তা স্বীকৃত হবে (যদি অবশ্য ঐতিহ্যগত ধারায় তা খাপ খায়), না হলে, সেটিকে খোল-নলচে সমেত বিদেয় করা হবে, দিব্যদ্রষ্টা যদি তাঁর দিব্যদর্শনের রূপটিকে পোপের মনের মত করে সাজিয়ে না দেন।

যে মুহূর্তে দিব্যদ্রষ্টা বহির্জাগতিক প্রেরণার আওতায় এসে পড়ে—একে আমি এই নামে অভিহিত করতে ভালোবাসি—সে তখন একটা মিডিয়ামে পরিণত হয়। যে সব প্রেরণা তখন তার মস্তিষ্কে এসে ঘা দেয়, তাদের সে এড়িয়ে যেতে পারে না। মস্তিষ্ক তখন কয়েকটি রূপের প্রকাশ ঘটায়, যাদের দেখবার চোখ শুধু তারই আছে, অন্য কেউ সে রূপ দেখতে পায় না। দিব্যদর্শন অবাস্তবও হতে পারে, বাস্তবও (এক্‌টোপ্লাজম্‌-গত বাস্তবায়ন) হতে পারে, কিন্তু দিব্যদ্রষ্টার চোখে তা সব সময়েই 'বাস্তব'। আদালতে বিচার হয়তো হয়, কিন্তু দিব্যদর্শন খাঁটি কি খাঁটি নয়, তা বিচার করা এবং কোন সিদ্ধান্তে পৌছোন, নেহাতই ধৃষ্টতা। মা মেরী কাউকে স্তোত্র পাঠ করতে বলেন না। ও আদেশ আসে খৃস্টান দিব্যদ্রষ্টার ধার্মিক মনের ব্যাকুলতা থেকে। আর, সেইখান থেকেই আসে সুন্দরী রমণীদের, দেবদূতদের, সাধু-সন্তদের ছবি, সেই ছবিই হয়ে ওঠে দিব্যদর্শনের মূর্তি।

কী ঘটে শিশু দিব্যদ্রষ্টাদের মস্তিষ্কে ?

কিছু একটা তাদের মগজে ঝল্‌কে ওঠে (বহির্জাগতিক প্রেরণা বিকিরিত হয়)। বারে বারে ঘটে অমন ব্যাপার। শিশু ভীত হয়ে পড়ে, একটা আশ্রয় খোঁজে সে। হঠাৎ একটা নির্ভয়, একটা নিরাপত্তার ভাব আসে তার মনের অজান্তে, দেখতে পায় এক টুকরো কুয়াশা, এক ফালি সূক্ষ্ম কাপড়, মনে হয়, হাওয়া যেন কাঁপছে, কোথায় যেন আলোর একটা আভা। অবাস্তব সেই মায়া-ছায়ার ভেতর সে খুঁজে পায়, তার অতিপরিচিত যিশু অথবা মেরীর ছবি। তাদের মুখ থেকে শুনতে পায়, ভালোবাসার মিষ্টি কথা, শুনতে পায় শান্তির বাণী। মন তার আনন্দে ভরে ওঠে, ইচ্ছে করে ওই নিয়েই থাকতে।

বহির্জাগতিক জীবেরা বিশেষ করে যে বাচ্চাদেরই বেছে নেয়, তা নয়। তাদের প্রেরণার শক্তি-ক্ষেত্রে যে কেমন 'গ্রাহক' আছে, তা তাদের জানা নেই। সত্যি কথা বলতে কি, শিশুরা যে দিব্যদর্শন পায়, সে নেহাত দৈবাৎ। শিশু মস্তিষ্ক সরল বিশ্বাসে ভরা, খৃস্টান গল্প-গাথা-ছবিতে ঠাসা তার মগজ। এমন মনে যখন বহির্জাগতিক শক্তির প্রবেশ ঘটে, তখন নিছক ধর্মীয় 'দর্শনই' ফুটে ওঠে। বলতে গেলে, শিশুর আপন ধর্মীয় পরিবেশের কারণেই তার মন তৈরী থাকে। বহির্জাগতিক জীব নিজে কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে না।

বস্তুতঃ, আলোর চেয়ে দ্রুতগতি যোগাযোগ অব- অথবা অতিচেতন মনে প্রেরণা জাগায়, তারই ফলে বহির্জাগতিক জীবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় যোগাযোগ। শিশু মনে সে-প্রেরণা শুধু শান্তি-প্রেম-নিরাপত্তার মূক ছবি জাগায়, সেই ছবি পরিণত হয় যিশু-মেরী-দেবদূতের মূর্তিতে।

দিব্যদর্শনসংক্রান্ত নিরীক্ষার ফল নথিভুক্ত হয়েছে, সরকারী নথি-পত্রে এই ভাবে,—

দিব্যদর্শনের অস্তিত্ব বর্তমান

আমি নিশ্চয় করে জানি, আমি দিব্যদর্শন লাভ করেছি। আমি জানি, সে দর্শনে প্রথমে আমাকে বিরক্ত করেছে (ভয়), তারপর করেছে শান্ত (প্রেম, শান্তি)।

মনে হয়েছে, সে মূর্তি অতি বলবান এবং শক্তিমান, সে এত বড় আর এত সুন্দর যে অমনটি আমি আর কখনো দেখিনি।

সে মূর্তি আমাকে কিছুই বলেনি, আমি তার ইচ্ছা, তার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছি, জেনেছি, সে প্রচার করতে চায় শান্তির বাণী। (সে দর্শন যদি যুদ্ধকালে ঘটে থাকে, তাহলে দিব্যদ্রষ্টার অনুভূতিতে শান্তির বাণীই প্রতিফলিত হবে, সেইটেই যে তৎকালীন সর্বজনীন অবচেতন আবেদন!)

আমি বলতে চাই, সমস্ত মানুষ আবির্ভূত মূর্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে। (মহাজাগতিক সঙ্কেত, এক কালে আমরা সবাই যে একাত্মাই ছিলুম।)

দিব্যদ্রষ্টা বুঝতে পারে না, দিব্যদর্শন কেমন করে ঘটে। বুঝতে তাদের দেওয়া হয় না ইচ্ছে করে, কেননা, বহির্জাগতিক প্রেরণার ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাদের বাধা পেয়ে। দিব্যদ্রষ্টার কাছে দিব্যদর্শনের আবির্ভাব যে অনুভূতি জাগায়, তা হয় ভালো, না হয় মন্দ। যদি ভালো হয়, তাহলে তা নিশ্চয় ভগবানের বিভুতির প্রকাশ, ক্ষেত্র বিশেষে সে প্রকাশ যিশু, মেরী, মহম্মদ ইত্যাদির, আর মন্দ হলে, শয়তানের নিশ্চয়, মুখে তার অনেক ভয়ঙ্কর মুখোস, কণ্ঠে অনেক কু-কথা। দিব্যদ্রষ্টার যদি সন্দেহ জাগে, কাকে দেখেছে, তাহলে ভাবনা নেই, ধর্মগুরুরা আছেন সে সন্দেহ নিরসন করতে।

প্রায় ক্ষেত্রেই দৃষ্ট মূর্তির কেন সাধ যায়, দর্শনের স্থানে গড়ে উঠুক একটা তীর্থক্ষেত্র? দুটো কারণ থাকতে পারে। দর্শন ক্ষেত্রে দ্রষ্টা

হয়তো একদিন একটা তীব্র আনন্দের উপলব্ধি লাভ করেছিল, পেয়েছিল জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দঘন মুহূর্তটিকে। তার তীব্র আনন্দের কথা যে শুনবে সেই চাইবে সে অনুভূতির ভাগ আর এ তো স্বাভাবিক যে ভবিষ্যতে তেমনি অলৌকিকের আশায় তারা গড়ে তুলবে মঠ-মন্দির-গির্জে সেই দর্শনের স্থানে। ধর্মগুরুদের তাতে আপত্তি থাকার কথা নয়,—তোমার টাকা তুমি ওড়াবে, তাতে আমার কি !

দিব্যদ্রষ্টার বিস্ময়কর আনন্দঘন অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। সে চায়, সেই স্থানটিতে বারে বারে গিয়ে দাঁড়াতে,···যেমন প্রেমিক যায় ঘুরে ফিরে পার্কের সেই পুরোন, নিরালা বেঞ্চিটিতে, যেখানে একদিন প্রেমিকার সুখস্পর্শে তার দেহের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরায় বয়ে গিয়েছিল তীব্র আনন্দ-শিহরণ। অনুমান করতে আপত্তি নেই যে বহির্জাগতিক যোগাযোগকারীরাও ওই জায়গাটিকেই পছন্দ করেছিল, চেয়েছিল পারস্পরিক যোগাযোগ দৃঢ়তর করতে। সেইজন্যেই কি যেখানে হৈ হট্টগোল নেই, সেইখানেই ঘটে দিব্যদর্শনের আবির্ভাব ? কল-কারখানা পরিবেষ্টিত স্থানে কে কবে বেতার-জ্যোতিষিক আকাশতার খাটায় ?

* * *

নিজের ওকালতি আমি নিজেই করবো।

দিব্যদর্শনের সঙ্গে বহির্জাগতিক জীবেরই বা সম্পর্ক থাকবে কেন ? দিব্যদর্শন কি মনের অস্থির কল্পনার সৃষ্টি নয় ? খাঁটি দিব্য-দর্শনও (যার ছবি পর্যন্ত তোলা হয়েছে) কি মানব-মস্তিষ্কের কোন অজ্ঞাত শক্তির সৃষ্টি নয় ? তাহলে আর বহির্জাগতিক অতি-মানবদের টানা কেন ?

দ্রষ্টা এবং দৃষ্টের সঙ্গে যে মুহূর্তে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, সেই মুহূর্তেই 'দৃষ্ট' ঘোষণা করে যে সে বহির্জাগতিক।

খৃষ্টান-ভাষায় সে ঘোষণার রূপ এইরকম,—

আমি বিশ্বজননী।

আমি স্বর্গের রাণী।

আমিই অক্ষতযোনি। (আদি কৃত্রিম পরিব্যক্তির গালভরা নাম?)

প্রেরিত সঙ্কেতসমূহকে দিব্য দ্রষ্টা ব্যক্ত করে তার আপন কথায়, দৃষ্ট মূর্তির বর্ণনাও দেয় তার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে।

দিব্যদর্শন যে দাবি করে যে তার উৎস বহির্জাগতিক, সেই কথাই তো যথেষ্ট নয়। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি।—মর্মন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, অষ্টাদশ বর্ষীয় যোসেফ স্মিথের কাছে যদি এক দেবদূত এসে বলে যে মানব-ইতিবৃত্ত সম্বলিত লিপিফলকসমূহ কোন্ গুপ্ত গুহায় রক্ষিত আছে তা সে জানে এবং সত্যিই যদি ঠিক সেইখানেই পাওয়া যায় সে ফলক, তাহলে বলতে পারি, বহির্জাগতিক জীবদের সে কথা জানা ছিল বলেই তারা যোসেফ স্মিথকে জানাতে পেরেছিল (কারণ তারাই যে আমাদের গ্রহে হাজার হাজার বছর আগে ওই গুপ্ত গুহা তৈরী করে তার ভেতর ওগুলো রেখে গিয়েছিল!)। দিব্যদর্শনের ব্যাপারটাকে পরে যা দাঁড় করানো হয়েছে (তিনি যিশু!), তার জন্মো গপ্পোর কারখানায়, যেখানে ধর্ম গড়া হয়ে থাকে। 'আমাদের সমাজে অবিশ্বাস নয়, বিশ্বাসটাই বিপজ্জনক' (২৭)।

অতএব একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে মানুষের জগতে এই স্বর্গীয় আবির্ভাব অলীক নয়। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মপ্রচারক আপন মতবাদ প্রচারের কালে বলেছেন, যে বাণী তিনি প্রচার করছেন সে বাণী, ধর্মের সে অনুশাসন, তাঁর নয়। তাঁর মস্তিষ্কে হঠাৎ-জাগা কোন চেতনা, না হয় তাঁর অন্তর্লীন কোন স্বর্গীয় শক্তি—দেবতা-ঈশ্বর-মহাপ্রভু—তাঁকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, প্রচারক নিমিত্ত মাত্র। মনুষ্যসমাজকে বারবার তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন,

জড়বিজ্ঞান এবং পার্থিব কৃতির অনেক উর্ধ্বস্তরের কালাতীত এক শাশ্বত মহান্ বাণীই তাঁদের উপলব্ধ। কিন্তু প্রচারকদের সবাই কিছু ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেননি, বরং কারুর কারুর অতিমানস চেতনায় যোগাযোগ ঘটেছে ঈশ্বরের সঙ্গে। এমনও অনেক আত্মার কথা শুনেছি, যাঁরা আমাদের এই পার্থিব জগতে নেবে এসে মাঝে মাঝে মহাকাশের অন্য কোন জগতের চিন্তা, অন্য কোন মাত্রার চেতনা আমাদের চিন্তার অণুতে অণুতে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। পরাবিজ্ঞান এবং পরামনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় অমন অনেক নজির পাওয়া গেছে। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে আবির্ভাবের কথা কেউ উচ্চারণ করেন না। মহামানবদের জীবনী পড়তে পড়তে দেখতে পাই, তাঁদের প্রত্যেকের জীবনেই কোন না কোন সময়ে, অন্ততঃ একবারও অতিপ্রাকৃত মুহূর্তের আবির্ভাব ঘটেছে—দর্শন, চিন্তা, বোধি অথবা অমনি কোন এক অপার্থিব পথে। সে সব ক্ষেত্রে সে আবির্ভাব রূপায়িত হয়েছে, মহামানবদের অক্লান্ত অসীম চিন্তা এবং কর্মের অবদানে।

এ সব চমকপ্রদ ঘটনা আমাদের মনে যত কৌতূহলই জাগাক, মূল ব্যাপারটাকে, তথা সৌর-অলৌকিককে যেন ভুলে না যাই! কি সান দামিয়ানো, কি ফতিমা, কি হেরল্ট্স্বাখে হাজার হাজার লোক দেখেছে,—সরকারী নথিপত্রেও লেখা আছে,—'অর' সমেত একটা বিশাল উড়ন্ত চাকা ঘুরে চলেছে ভয়ঙ্কর বেগে। মাঝে মাঝে তার গতি মন্দ হয়েছে, এগিয়ে গেছে সূর্যের সামনে, কখনো বা সূর্য পেরিয়ে চলে গেছে আরো অনেক দূরে। অমন বর্ণনা শুনে '২০০১ চলচ্চিত্রের' সেই জাঁদরেল মহাকাশ-স্টেশনের কথাটাই যেন মনে পড়ে যায়। মহাকাশ-স্টেশনগুলোর চেহারা বিশাল চাকার মত, ঘোরে ধীরে ধীরে তার কেন্দ্রীয় অক্ষের চার পাশে। এর ফলে তার নিরক্ষবৃত্ত ঘিরে বাইরের দিকে যে সব ঘর থাকে, সেগুলোতে একটা কৃত্রিম

অভিকর্ষের সৃষ্টি হয়, আন্তর্নাক্ষত্র যাত্রায় যা একান্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রে অর্থাৎ চক্রের নাভিদেশে থাকে শক্তি-উৎপাদক স্টেশনসমূহ, সেখান থেকে চালক-শক্তি প্রেরিত হয় মূল চক্রে, অর সদৃশ বাহক দণ্ড মারফত।

এটাই কি সৌর-অলৌকিকের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ? বোধ হয়, ব্যাখ্যাটা একেবারে ফেলনা নয়। হাজারে হাজারে লোক যারা দেখেছে, তারা সবাই কিছু মুখ্যু ছিল না এবং তাদের বর্ণনার মিল থেকে মানতেই হয়, তাদের দৃষ্টিপথে ওইরকমই একটা 'জিনিস' পড়েছিল।

আমাদের জাগতিক কালের বিচারে আন্তর্নাক্ষত্র দূরত্ব অতিক্রম করতে হাজার হাজার বছর লেগে যায়। আমাদের মস্তিষ্কের অনুরূপ বহির্জাগতিক মস্তিষ্ক দিব্যদর্শন মারফত 'দিব্যদ্রষ্টাদের' আদেশ করে, একটি বিশেষ দিনে, বিশেষ ক্ষণে এবং বিশেষ স্থানে বহুসংখ্যক লোককে নিয়ে যেতে। তারপর তারার মেলায় ঘূর্ণমান কোন মহাকাশ-স্টেশন তার কেন্দ্রীভূত শক্তির প্রয়োগে 'নিক্ষেপ করে সে-স্টেশনের ছবি'। ফলে আমাদের গ্রহের হাজার হাজার 'গ্রাহক' 'দেখে' দীপ্তিমান বিশাল একটা চাকা রামধনুর সপ্তবর্ণ বিচ্ছুরিত করতে করতে ভেসে চলেছে অপূর্ব মহিমায় আমাদের সূর্যের গা ঘেঁষে। ব্যাপারটাকে আমার যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। একটা কথা ভাববার আছে। তাই যদি হয়, তাহলে সূর্যের আলোয় দীপ্ত সে-স্টেশনকে সর্বত্র দেখা গেল না কেন ? তা হতে পারে না, কারণ বহির্জাগতিক মানুষ যে দিন-ক্ষণ-স্থান এবং সেই সঙ্গে বিশেষ দৃষ্টিকোণ ঠিক করে রেখেছে, দিব্যদর্শন মারফত শুধু সেখান থেকেই তাদের সঙ্কেত দৃষ্টিগোচর হবে।

প্রশ্ন থেকে যায়, বহির্জাগতিক মানুষ অমন কুশলী অভিযানে কেন নাবলো ? আমার মনে হয়, এ কথা ভাবতে দোষ নেই, যে

তারা একটা পরিষ্কার সঙ্কেত দিতে চেয়েছিল,—'এই দেখ, আমরা এখানে রয়েছি, বাস করছি একটা বিশাল মহাকাশ-স্টেশনে। ক্ষুদ্র মানব, বোঝবার চেষ্টা কর, যাদের স্পর্শে তোমার বুদ্ধির উদয় ঘটেছে, সেই আমরাই পারি অমন দৃশ্যের অবতারণা করতে'।

আমরা হীন 'মহীলতা', প্রতিপালনের দোষে পঙ্গু। ক্ষুদ্র মানুষ 'দেবতার' সঙ্কেত বুঝতে পারি না, সে সঙ্কেতকে ভাবি ধার্মিকের কাছে দেবতার বাণী। যদি ভুল বলে থাকি, আমার মুখে পোকা পড়ুক, কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনার ভেতর আমি অলৌকিক দেখতে পাই না, তাতে আমায় যে যাই বলুন।

মানুষের চেতনাকে অর্গলমুক্ত করতে বিশুদ্ধ দিব্যদর্শনের ক্ষমতা বিরাট। সে প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ধর্মপ্রতিষ্ঠাতারা বলেছেন, যে বাণী তাঁরা প্রচার করেছেন, সে বাণী তাঁদের নয়। 'আমার অন্তরে লীন যিনি, আমার সত্তার অতীত যিনি, এ বাণী তাঁর'। প্রকৃত পক্ষে, তাঁরা এমন সব কথা উচ্চারণ করেছেন, যা তাঁদের কালের জ্ঞানের, তাঁদের কালের অভিজ্ঞতার অনেক ঊর্ধ্বে।

তবে একদিক থেকে বাঁচোয়া, ধর্মপ্রতিষ্ঠাতারাই শুধু দিব্যদর্শন লাভে ধন্য নন, মহান্ মস্তিষ্কের অধিকারী আরো আছেন, যাঁরা তাঁদের ধ্যানের বস্তু পেয়ে থাকেন বহির্জাগতিক প্রবুদ্ধ মস্তিষ্কের সংস্পর্শে এসে। তাঁরাই সেরা বাছাই, নামমাত্র ওই কটি লোকই সেই মহাযোগাযোগের উপযুক্ত, বহির্জাগতিক প্রেরণাকে চিন্তার অণুতে রূপান্তরিত করতে সমর্থ। বিজ্ঞানচিন্তায় অনুশীলিত মস্তিষ্ক, অনুসন্ধায়ী মন পারে সঙ্কেতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে, পারে সে সঙ্কেতকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করতে, কিন্তু তারা দিব্যদর্শনের দোহাই পাড়ে না। ইতিহাসের মহামানবদের জীবনী পর্যালোচনা করে দেখেছি, কোন না কোন সময়ে তাঁদের জীবনে দিব্যদর্শন ঘটেছে। সেই বিশেষ ক্ষণের প্রেরণা, সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে

জীবনের মোড় গেছে তাঁদের ঘুরে, জন্ম নিয়েছে পৃথিবী কাঁপানো কোন উপলব্ধি, কোন মহান্ তত্ত্ব। দিব্যদর্শন যে যুক্তিসম্মত, মহামানবদের বিরাট বিরাট অবদানই তার বড় প্রমাণ।

ধর্মপ্রতিষ্ঠাতারা দিব্যদর্শনকে ব্যবহার করেন 'আপন কর্তাদের মেজ হইতে পতিত 'গুঁড়াগাঁড়ার' মত (ম্যাথু ১৫, ২৭)। যে দিব্য-প্রেরণা ধর্মের দিক থেকে অর্থহীন, অতিপ্রাকৃতের কাছ থেকে আসা সেই প্রেরণা, সেই ঝলক পৌঁছোয় মহামানবদের মহান মস্তিষ্কে, তারপর সেই 'মহাদেবের' জটা থেকে নাবে পতিতপাবনী প্রগতির করুণাধারা।

ওই ওঁদের ওপরেই তো আমার ভরসা।

দিব্যদর্শন পঞ্জী

চিন্তা করতে শেখার পর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ কত যে দিব্যদর্শন লাভ করেছে, তার হিসেব কেউ রাখেনি। দেবতার আবির্ভাবের অসাধারণ ব্যাপকতার (খৃস্টধর্মের কালে মেরীর প্রাধান্যই বেশি) একটা ধারণা দেবার উদ্দেশ্যে একটা তালিকা তৈরী করেছি, অবশ্য এ বই লেখবার সময় যে সব দিব্যদর্শনের কথা জেনেছি, 'শুধু সেইগুলির' বিবরণই এ তালিকায় আছে। গবেষকমহল যদি জানা সমস্ত আবির্ভাবের একটা তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহলে সে তালিকা নিঃসন্দেহে এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার চেয়ে অনেক বড় হয়ে যাবে।

নিচে আমার পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে এই ছোট্ট তালিকাটি পেশ করছি।—

পুরাণ—স্লাভ নিয়তি সুদেনিকা ছেলে জন্মাবার পরেই আসতেন। প্রায়ই মাঝরাতে তাঁরা ত্রিমূর্তিতে দেখা দিতেন।

রাখালের রূপে, কখনো বা নেকড়ের রূপে দেখা দিতেন স্লাভ বনদেবতা।

ক্রোয়াশিয়া, স্লোভেনিয়া এবং বায়েলোরুশিয়ার মানুষের কাছে আবির্ভূত হতেন, জলীয় পাদপে সজ্জিত হয়ে দীর্ঘ হরিৎ জলদেবতা।

হাঙ্গেরীর মানুষদের দেখা দিত উড়ন্ত এক হরিণ কৃসোদাসি-উস্‌ৎসার্ফাজ। তার দেহের চারধারে থাকতো উজ্জ্বল একটা আভা।

আয়ার্ল্যাণ্ডের যুদ্ধের দেবী, বাদ্‌ব্‌ প্রায়ই দেখা দিতেন কাকের রূপ ধরে। সেখানকার মাতৃদেবী, মাশা বহু বীরকে দর্শন দিয়েছেন, বিভৎস রূপ ধরে। তাঁর ইচ্ছা মত সে সব বীর কাজ না করলে সুন্দরী রমণীতে পরিণত করতেন তাদের।

রোমানদের যুদ্ধের দেবতা, মঙ্গল রোমের দ্বিতীয় রাজা, নুমা পম্পিলিয়ুসকে দর্শন দিয়েছিলেন।

ভালকিরিরা বুনো পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে এসে যুদ্ধে মধ্যস্থতা করতেন। [ভালকিরি—টিউটন পুরাণের ওডিন (জ্ঞান, বুদ্ধি, যুদ্ধ ও কাব্যের দেবতা) দেবতাদের সঙ্গিনী কুমারীদের নাম। তাঁদের কাজ ছিল আত্মাদের ভালহাল্লায় নিয়ে যাওয়া। (ভালহাল্লা—ওডিন দেবের আলয়, যুদ্ধে নিহত বীর এবং যারা হাসতে হাসতে নির্ভীক-ভাবে প্রাণ দিয়েছে, তাদের আত্মাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হত) —অনুবাদক]।

কেল্টদের বিশ্বাস ছিল, খূয়াহা দে ডূনানদের রাজা, ফিন নিজের গায়ের দোলাইকে মুচড়ে আপনাকে 'মঙ্গান' হরিণে পরিণত করতে পারতেন এবং সেই পরিবর্তিত রূপে যথা ইচ্ছা তথায় আবির্ভূত হতে পারতেন। (খূয়াহা দে ডূনান—দেবতাদের এক জাত, তাঁরা আয়ার্ল্যাণ্ড জয় করে সত্যযুগে সেখানে রাজত্ব করতেন—অনুবাদক)

'মায়া'দের অনেক দেবতাই দর্শন দিতেন, কিন্তু দেবতা হুরাকান প্রায়ই তাদের কাছে আবির্ভূত হয়ে নানা উপদেশ দান করতেন।

আদম এবং ইভকে ছোট বড় নানা দেবদূত দর্শন দিতেন. সেই সঙ্গে দেখা দিত বিশাল ঘূর্ণ্যমান চক্রসমূহ।

আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০০০ — ঈশ্বর-কন্যা ইনান্না উরুকের শাসক, এন্‌মে-কার-এর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে কী ভাবে আরাত্তা নগর ধ্বংস করতে হবে, তার নির্দেশ দেন।

আঃ খৃঃ পূঃ ৪০০০ — উরুকের রাজা গিলগামেশের কাছে বহু দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাঁরা তাঁকে বহু বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন।

আবির্ভাব

আঃ খৃঃ পূঃ ৩৫০০, সুমের দেশীয় উদ্যানপালক, শুকুল্লিতুদা তার উদ্যানে স্বর্গের দেবী ইনান্নাকে বিশ্রামরতা অবস্থায় দেখেছিল।

আঃ খৃঃ পূঃ ১৫০০ মহাপ্রলয়ের পর মনু যখন হিমালয়ের ওপর থেকে প্লাবিত বিশ্ব পরিদর্শন করছেন, তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে মনুসংহিতা রচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

খৃঃ পূঃ ৭২৭-৭২২ আসিরিয়ার রাজা সালমানাজারের রাজত্বকালে বর্তমান অপ্রমাণিক তোবিৎ পুঁথির নায়ক, তোবিয়ুস মেসোপটেমিয়ায় প্রধান দেবদূত রাফায়েলের দর্শন লাভ করেছিলেন।

আঃ খৃঃ পূঃ ৫০০ বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধ বোধি লাভ করেছিলেন 'বিশ্ব আত্মার' কাছ থেকে।

খৃঃ পূঃ ২০৪ চতুর্থ টলেমি মিশরীয় ইহুদীদের সবংশে নির্বংশ করতে মনস্থ করেন, কিন্তু দুটি জ্যোতিষ্মান দেবদূত আবির্ভূত হয়ে আক্রমণকারী সৈন্যদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলেন।

আঃ ২৮৭ খৃস্টাব্দ স্পেনের ভালেন্থিয়ার সন্ত ভিন্থেনশিয়াসের মৃত-দেহকে পাহারা দিতে দেখা গেছে দুটি দেবদূতকে।

আঃ ৩০০ খৃঃ আন্তিয়োকের পাদ্রী সন্ত ইরাসমাসকে কারামুক্ত করেছিলেন দেবদূতেরা। বহু বার তাঁরা তাঁকে দর্শন দিয়েও ধন্য করেছেন।

আঃ ৩০০ খৃঃ ফ্রান্সের আলিস-স্যাঁৎ-রাইনের কারাগারে সন্ত রেজিনার সামনে খৃস্টের ক্রুশ এবং একটি ঘুঘুপাখী আবির্ভূত হয়ে তাঁকে শহীদের মুকুট দানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

আঃ ৩০৩ খৃঃ এশিয়া মাইনরের ইসমিরের সন্ত জুলিয়ানা শয়তানকে দেখেছিলেন দেবদূতের ছদ্মবেশে।

আঃ ৩০৩ খৃঃ জাফ্ফার কাছে (প্যালেস্টাইন) লিড্ডায় (বর্তমান লুড্) কারারুদ্ধ সন্ত জর্জ খৃস্টের দর্শন লাভ করেন। যিশু তাঁকে সান্ত্বনা এবং শক্তি দান করেন।

আঃ ৩০৩ খৃঃ সন্ত কসমাস এবং সন্ত দামিয়ানকে এশিয়া মাইনরের ঈজীয় সাগর থেকে উদ্ধার করেছিলেন এক দেবদূত।

আঃ ৩০৩ খৃঃ রোমের সন্ত তিমথিকে সান্ত্বনা দান করেছিলেন দেবদূতেরা। তিনি দেখলেন, আকাশ খুলে গেল এবং শহীদের মুকুট বাড়িয়ে ধরে রয়েছেন স্বয়ং যিশুখৃস্ট।

আঃ ৩০৪ খৃঃ কাপ্পাডোসিয়ার সিজারিয়ায় সন্ত ডরোথি দেখেছিলেন, তারকাখচিত পোষাকে সজ্জিত, সোনালি চুল একটি বালক, হাতে সাজি ভরা আপেল আর গোলাপফুল।

আঃ ৩০৪ খৃঃ সন্ত ভিতাস যখন মিসিলির কারাগারে বন্দী, তখন দেবদূতেরা তাঁর অন্ধকার কারাকক্ষ আলোকিত করতেন।

আঃ ৩০৭ খৃঃ এশিয়া মাইনরের আন্তিয়োকের সন্ত মার্গারেৎ যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন প্রলুব্ধকারী শয়তান এসেছিল তাঁর কাছে, এক বিরাট ড্রাগনের রূপ ধরে।

আঃ ৩১০ খৃঃ আলেকজান্দ্রিয়ার সন্ত কাথরিন যখন কারাগারে তখন একটি শ্বেত পারাবত তাঁকে খাবার এনে দিত। একটি দেবদূত তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞী এবং কাথরিনের ক্ষতে দেবদূতেরা প্রলেপও লাগিয়ে দিতেন।

আঃ ৩১১ খৃঃ সন্ত আদ্রিয়ান তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীকে দর্শন দিয়েছিলেন।

আঃ ৩১২ খৃঃ আলেকজান্দ্রিয়ার সন্ত কাথরিনের মৃতদেহ সিনাই পর্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন দেবদূতেরা।

আঃ ৩৩৪ খৃঃ আমিয়াঁর (ফ্রান্স) সঁ্যা মার্তাঁর কাছে রাত্তির বেলায় ছিন্নবস্ত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন যিশুখৃস্ট স্বয়ং।

৭।৫।৩৫১ সকাল আটটায় উন্মুক্ত দিবালোকে একটি উজ্জ্বল ক্রুশের আবির্ভাব ঘটেছিল জেরুসালেমবাসীদের চোখের সামনে।

৩৫৬ খৃঃ মিসরের হেরাক্লিয়ায় সন্ত আন্তনিকে সমাধিস্থ করার সময়ে দেখা গিয়েছিল, দেবদূতেরা তাঁর দেহ ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আঃ ৩৫৬ খৃঃ বেলজিয়ামের টঙ্গের্নের সন্ত সের্ভিটিউসের কাছে পিতর আবির্ভূত হয়ে একটি রূপোর চাবি দিয়ে গিয়েছিলেন।

৩।৪।৩৫৭ সন্ত সাইপ্রিয়ান ঈশ্বরকে ভাসতে দেখেছিলেন মেঘের ওপরে।

৪৫২ খৃঃ ইতালির মান্তুয়াতে হুনদের রাজা আত্তিলা দেখেছিলেন, সন্ত লিওর পার্শ্বে মুক্ত কৃপাণ হস্তে পিতর এবং পল দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

৪৫৮ খৃঃ রোমে পোপ, প্রথম সন্ত লিওর সামনে আবির্ভূত হয়ে পিতর একটি শ্বেতবস্ত্র দান করেছিলেন।

৫০০ খৃঃ মৃত্যু শয্যায় শায়িতা সন্ত থার্সিলা যিশুকে অবতরণ করতে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ‘সরে যাও, সরে যাও, যিশু আসছেন’, বলে।

৫৪৭ খৃঃ ইতালির মন্তে কাসিনোর বেনিডিক্ট্ পন্থী সাধুরা

দেখেছিলেন, সন্ত বেনিডিক্ট্কে দেবদূতেরা যে পথ দিয়ে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে পথ গালচে দিয়ে মোড়া এবং উজ্জ্বল। সন্ত বেনিডিক্ট্ নিজেও দেখেছিলেন, সন্ত স্কলাস্তিকা স্বর্গে যাচ্ছেন, শ্বেত পারাবতের রূপ ধরে।

৫৮৯ খৃঃ সন্ত এবং পোপ মহান গ্রেগরী একটি গুহায় লুকিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখতে পান, একটি আলোকস্তম্ভের ওপরে দেবদূতেরা ওঠা-নাবা করছেন।

৬১০ খৃঃ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের কাছে আল্লার দূতেরা আবির্ভূত হয়েছিলেন।

৬২৭ খৃঃ বাইজান্তিয়ামের সম্রাট, সন্ত হেরাক্লিয়াস একটি দেবদূতকে দেখেছিলেন। সে দেবদূত তাঁর জন্যে জেরুসালেমের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

আঃ ৬৪৮ খৃঃ ফ্রান্সের সন্ত জোদোকাসের কাছে যিশু তিনবার আবির্ভূত হয়েছিলেন ভিখারীর বেশে।

৬৫১ খৃঃ অ্যাংলো-স্যাকশন সন্ত কাথবার্ট এক রাত্রে আয়ার্ল্যাণ্ডের আকাশে একটি উজ্জ্বল আলো দেখেছিলেন, সে আলোয় দেবদূতেরা একটি আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

৭৩৫ খৃঃ ইংলণ্ডের ইয়ারো মঠের শ্রদ্ধেয় বীডের সমাধি-প্রস্তরের ওপর একদিন সকালে লিখতে গিয়ে দেখা যায়, কোন দেবদূত আগেই লিখে রেখে গেছেন।

৮১৪ খৃঃ হুইট্সানডের (ঈস্টার পরবর্তী সপ্তম রবিবার) রাত্রে সন্ত আনস্কারের কাছে যিশু আবির্ভূত হয়েছিলেন।

৮১৯ খৃঃ পোপ প্রথম পাস্কালিস যখন সন্ত সিসিলিয়ার

সমাধিস্থলের সন্ধান করছিলেন, তখন সন্ত স্বয়ং আবির্ভূতা হয়েছিলেন পোপের সামনে।

৯৭০ খৃঃ রেগেন্‌স্‌বুর্কের ভল্‌ফ্‌গাঙের কাছে সন্ত অটমার আবির্ভূত হয়েছিলেন সুইৎসারল্যাণ্ডের আইন-সিদেল্‌ন্‌-এর কাছে।

৯৭৩ খৃঃ জার্মানীর আউক্‌স্‌বুর্কের সন্ত উলরিক যখন মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত, তখন দুটি দেবদূত যিশুর নৈশভোজের থালা-বাটি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সন্ত দেখলেন, সোনালি আলোর রশ্মি ভেদ করে ঈশ্বরের বরাভয় হস্ত উত্তোলিত হচ্ছে।

আঃ ৯৮১ খৃঃ সন্ত ভল্‌ফ্‌গাং জার্মানীর রেগেন্‌স্‌বুর্কের গির্জেয় প্রার্থনারত, এমন সময় একটি নেকড়ের আবির্ভাব ঘটলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ শয়তানও প্রস্থান করলো।

১০০৮ খৃঃ মড়কের সময়ে একদিন ফ্রান্সের ভালাঁমিয়েনের গির্জাযাত্রীরা মা মেরীর দিব্যদর্শন লাভ করেছিল।

আঃ ১০২০ খৃঃ জার্মানীর হিল্ডেস্‌হাইমের সেণ্ট বের্নহার্টে এক দেবদূত নাকি একটি স্মারক-আধার এনে দিয়েছিলেন।

আগস্ট ১০৬০ খৃঃ ফ্রান্সের এসপাই গ্রামে যিশু এবং স্বর্গের রানী আবির্ভূত হয়েছিলেন সন্ত আলবের-এর সামনে।

১৬।১ এবং ফ্রান্সের আরাস শহরের সমস্ত মানুষের সামনে
১৭।৪।১০৯৫ মেঘের ভেতর থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন 'বিশ্বের রাণী'।

আঃ ১১০০ খৃঃ ইংলণ্ডের ক্যাণ্টারবেরীর সন্ত অ্যানসেল্‌ম্‌ বহুবার মেরীর দর্শন লাভ করেছেন।

১১১০ খৃঃ ফ্রান্সের ক্লেয়ারভো-এর সন্ত বের্নারের কাছে আবির্ভূতা হয়েছিলেন দেবদূত সঙ্গে করে মাদোন্না।

আঃ ১১১৭ খৃঃ স্পেনের মাদ্রিদে সন্ত ইসিদোরা প্রার্থনা করছেন, এমন সময়ে দেখতে পেলেন, এক দেবদূত দুটো সাদা বলদ জুতে লাঙ্গল দিচ্ছেন।

১১১৭ খৃঃ ইতালির ক্রেমোনায় একটি এক বছরের শিশু হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো, বর্ণনা দিলে, লোকচক্ষে অদৃশ্য এক সুন্দরী রমণীর।

১১৫৫ খৃঃ স্পেনের সন্ত দমিনিককে যখন দীক্ষিত করা হয়, তখন তাঁর ধাত্রী তাঁর কপালে একটি সোনালি তারা দেখতে পেয়েছিল।

১১৭০-১২২৩ খৃঃ স্পেনের সন্ত দমিনিক সামনা-সামনি যিশুর দর্শন পেয়েছিলেন, পৃথিবীর অকল্যাণকে ধ্বংস করতে তাঁর হাতে ছিল তিনটি বর্শা। পিতর এবং পল তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে একটি দণ্ড এবং একটি পুস্তক দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রচারকার্যের উপযুক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। সন্তের মা সাদায়-কালোয় মেশানো একটি কুকুর দেখেছিলেন। তার মুখে ধরা মশালের আলোয় জগৎ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। মেরী সন্ত দমিনিককে একটি জপমালা দান করেছিলেন এবং তার ব্যবহার প্রণালীও বলে দিয়েছিলেন।

আঃ ১১৮০ খৃঃ ভালোয়ার সন্ত ফেলিক্স্ (১১২৭-১২১২) এবং মাথা-র জনের কাছে আবির্ভূত হয়েছিল একটি হরিণ, শিঙে তার লাল-নীল একটা ক্রুশ।

১২১৯ খৃঃ অর্লেয়াঁর ডীন, রেজিনান্দের কাছে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, স্বর্গের রানী, সঙ্গে ছিল দুটি সুন্দরী কুমারী।

আঃ ১২২১ খৃঃ ইতালির পাদুয়ার সন্ত আন্তনির কাছে আবির্ভূতা হয়েছিলেন মা মেরী শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে।

সেপ্টেম্বর ১২২৪ খৃঃ ইতালির মন্তে লা ভের্নায় আসিসির সন্ত ফ্রান্সিসকে যিশু তাঁর পাঁচটি দেহ-ক্ষতচিহ্ন দান করেছিলেন।

৭।১০।১২২৪ লুক্সেম্বুর্কের কাউন্ট থিওবাল্টের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন, শ্লস্ বার্টেনবুর্কের ওপরে, আমাদের আদি পুরুষ আদম, সঙ্গে ছিলেন সাতটি অপূর্ব রূপসী কুমারী।

আঃ ১২২৫ খৃঃ জার্মানীর ত্যুরিঙ্গেনের সন্ত এলিজাবেথের স্বামী লুটভিক তাঁর শয্যায় ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে দেখেছিলেন।

২২।১২।১২২৬ ইতালির আসিসির সন্ত ইজিদিউসকে যিশু অনেকবার দর্শন দিয়েছেন।

আঃ ১২২৮ খৃঃ ত্যুরিঙ্গেনের সন্ত এলিজাবেথ যখন প্রার্থনারত, সেই সময়ে এক দেবদূত তাঁকে মণি-মুক্তা-অলঙ্কার এবং উজ্জ্বল আলোকে ভূষিত করেন।

আঃ ১২৩২ খৃঃ জার্মানীর হোফেন-ইন-ডের আইফেলে হেরমান য়োসেফের কাছে কুমারী মেরী বহুবার আবির্ভূতা হয়েছেন, তার রাত-পাহারার কালে।

আঃ ১২৭৭ খৃঃ ইতালির তোলেন্তিনোর সন্ত নিকোলাস বেদীর ওপরে একটি তারকার আবির্ভাব দেখেছিলেন, বেদী ঘিরে কয়েকজন দেবদূতও দাঁড়িয়েছিলেন।

আঃ ১২৮৮ খৃঃ ইতালির ফোলিনিওর সন্ত আঞ্জেলাকে যিশু প্রায়ই দর্শন দান করতেন, তাঁকে তাঁর ক্ষতচিহ্নও যিশু দেখিয়েছিলেন।

আঃ ১২৯৯ খৃঃ জার্মানীর হেল্ফ্তার মঠের সন্ত গেত্রুদকে যিশু প্রায়ই দর্শন দিয়েছেন।

আঃ ১৩১৫ খৃঃ সুইডেনের সন্ত ব্রিগিত্তার শৈশবে মাদোন্না তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন।

১৩২০ খৃঃ ইতালির পিয়াচেন্‌সার সন্ত রক যখন প্লেগ রোগে পীড়িত, তখন এক দেবদূত তাঁকে আরোগ্যদান করেছিলেন।

১৩২৮ খৃঃ সন্ত আন্দ্রু কর্সিনির প্রথম 'মাস' (Mass) অনুষ্ঠান-কালে মা মেরীর আবির্ভাব ঘটেছিল। পরে মা তাঁকে আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

তারিখ নেই ফ্রান্সের স্যাঁৎ জিলের সন্ত ইজিদিউস বেদীর সামনে প্রার্থনারত, এমন সময়ে একটি দেবদূত তাঁর হাতে একটি কাগজ দেন, তাঁর পাপ ক্ষমা করার নজিরস্বরূপ।

আঃ ১৩৬২ খৃঃ সিয়েনার সন্ত কাথরিনের প্রার্থনাকালে যিশু তাঁকে একটি বিয়ের-আংটি দিয়েছিলেন।

১৮৮৮১৩৭০ একটি দিব্য-ইঙ্গিত পাবার পর সন্ত কাথরিনের দেহে খৃস্টদেহক্ষত প্রকাশিত হয়েছিল।

৩।১১।১৩৯৯ দমিনিক এবং ফ্রান্সিসকে সঙ্গে নিয়ে যিশু ফ্রান্সের আভিনিয়নের সন্ত ভিনসেন্ত ফেবেরের কাছে এসে তাঁর মুখে-মাথায় হাত বুলিয়েছিলেন।

আঃ ১৪১৩ খৃঃ হল্যাণ্ডের শীডামের সন্ত লিটভিনাকে মা মেরী এবং তাঁর পুত্র দর্শন দান করেছিলেন।

আঃ ১৪২৪ খৃঃ ফ্রান্সের দঁরেমীর আর্কের জোয়ান মাইকেল এবং অন্যান্য অনেক সন্তের দর্শন পেয়েছেন বহুবার।

১৬।৫।১৪৩২ ইতালির কারাভাজ্জোয় গিয়ানেত্তা দে পিয়েত্রো ভাচ্চি মেরীকে শান্তির বাণী উচ্চারণ করতে দেখেছেন।

১৪৩৮ খৃঃ ইতালির বোলোনিয়ার অধিবাসীরা আকাশে অপূর্ব আশ্চর্য এক রমণীকে দেখেছিল।

২।৩।১৪৪০ রোমের সন্ত ফ্রান্সেসের শেষ তেইশ বছর এক দেবদূত সব সময়ে তাঁর পাশে পাশে থাকতেন।

১৪৪৯ খৃঃ বেলজিয়ামের আন্দেলিখ্‌তের এক রমণীকে দর্শন দিয়ে মেরী বলেছিলেন, তাঁকে 'করুণাময়ী' বলে অভিহিত করা হোক।

আঃ ১৪৫০ খৃঃ স্পেনীয় সন্ন্যাসী, সন্ত দিদাকাস যখন সমাধিস্থ অবস্থায় প্রার্থনারত, তখন এক দেবদূত এসে তাঁর সমস্ত রান্নাবান্না সেরে রেখে গিয়েছিলেন।

১৪৬৩ খৃঃ ইতালির বোলোনিয়ার সন্ত কাথরিন ঈশ্বরকে দেখেছিলেন, এক দীপ্তিমান সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায়।

৩।৫।১৪৯১ আলসেসের নিডের্‌মর্শভাইয়েরের বাজারে ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে দিয়েতের শোয়েরে দেখতে পেলেন, শ্বেতবস্ত্রাবৃতা মেরীকে। এক হাতে তাঁর একটি তুষার-যষ্টি (icicle) আর এক হাতে তিনটি ধানের শীষ।

১০।৮।১৫১৯ জাঁ দে লা বাউমে নামে এক মজুর হঠাৎ দেখতে পায়, মঁ ভার্দাই পাহাড়ের ওপরে আকাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মা মেরী।

১৫২১ খৃঃ আইজেনাখের (জার্মানী) কাছে ভাৎর্বুর্কে মার্টিন লুথার যখন বাইবেল অনুবাদ করছিলেন, তখন দেখতে পান, তাঁর চিলেকোঠার দেয়ালে শয়তান দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গায়ে দোয়াত ছুঁড়ে মেরে তাকে তাড়িয়েছিলেন।

১৫৫০-১৫৬১ খৃঃ সেবাশ্চেন বারাব্বাসকে লিসবনে (পোর্তুগাল) বারেবারে দর্শন দিয়ে মেরী তাঁকে বলেছেন, জেসুইট সম্প্রদায়ে যোগ দিতে।

আঃ ১৫৬৪ আভিলার (স্পেন) সন্ত তেরেসাকে দর্শন দিয়েছিলেন যিশু এবং পিতর।

১৬শ শতাব্দী লিন্‌ৎসের (অস্ট্রিয়া) ডায়োসিস, আল্‌ড্‌ভাঙের অলৌকিক ছবিকে প্রোটেস্টাণ্টরা ছিঁড়ে পুঁতে দিয়েছিল। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল পিঁপড়ের গর্ত থেকে বেরোনো একটা অদ্ভুত আলো দেখে। শোনা যায়, সে ছবিকে তার আপন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার আগে সে পিঁপড়েদের তাড়ানো যায়নি।

আঃ ১৫৭১ খৃঃ আভিলার (স্পেন) সেণ্ট বার্থলোমিউয়ের আন্নাকে দর্শন দিয়ে যিশু বলেছিলেন, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

১৫৮২-১৫৯১ কাপুশিন সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক, জাকারিয়াস বোভেরিউস নাম করে করে লিখেছেন, তিরিশটি ভাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে পবিত্র পরিবারের দর্শন পেয়েছেন।

৩০।১০।১৫৯৩ জার্মানীর ৎসিত্তাউয়ের আকাশে একটি বিশাল, দীপ্তপক্ষ ঈগল দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। নানা দিক থেকে তাকে গুলি করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু বৃথা। ঘণ্টাখানেক পরে সে নিজেই বাতাসে মিলিয়ে গেল।

১৫৯৭ খৃঃ কিটোর (ইকোয়েডর) ইণ্ডীয়রা যখন নবধর্ম ত্যাগ করতে যায়, শোনা যায়, তখন মেরী তাদের সামনে আবির্ভূতা হয়ে, দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচিয়ে, তাদের ধর্ম-ত্যাগ বন্ধ করেন।

১৫৯৬ খৃঃ জিরনের কাপুশিন সন্ন্যাসী, আম্ব্রোসিউস বলেছেন 'ঈশ্বরের ভাগ্যবতী জননীকে' তিনি বহুবার দেখেছেন। মেরী তাঁকে বলেছেন, সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে, কিন্তু

কাপুশিন সম্প্রদায় ত্যাগ করতে বারণ করেছেন।

১৬০০ খৃঃ আরাউকানি যখন চিলির কনসেপ্‌সিয়ন নগর আক্রমণ করেন, শোনা যায়, মাদোন্নার এক অলৌকিক মূর্তি গির্জের বেদী ছেড়ে একটা গাছের ওপরে আবির্ভূতা হন এবং সেখান থেকে নাকি মাটির ডেলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ইণ্ডীয়দের তাড়িয়ে দেন।

১০।৯।১৬০২ এস্কোবারের মারিনাকে যিশু দর্শন দিয়েছিলেন প্রধান দেবদূতের বেশে। তখন নাকি তাঁর ক্ষত থেকে রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

৬।৪।১৬০৪ ইঙ্গলস্টাটের (জার্মানী) পাদ্রী, য়াকোব রেম মেরীকে মাটির ওপরে বাতাসে ভাসতে দেখেছিলেন।

১৬০৫ খৃঃ জেস্যুইট, পিতর দ'নাস্কোকে মেরীর দিব্যমূর্তির বুকে চেপে ধরা হয়েছিল।

১৬০৯-১০ খৃঃ ইতালির কিয়াভারিতে মেরী এবং শিশু যিশুর একটি মূর্তি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল, কারণ দুটি অলৌকিক আবির্ভাব, অলৌকিক ঘটনাও ঘটেছিল সেখানে।

১৫।১২।১৬৩১ নেপল্‌সের একটি শস্য ক্ষেত্রের ওপরে আবির্ভূতা হয়ে মেরী কয়েকজন জেস্যুইটকে দর্শন দিয়েছিলেন, তাদের জানিয়েছিলেন, ভিস্যুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গার আসন্ন।

৩।১১।১৬৩৭ পারীর সন্ন্যাসী, ফিয়াক্রের কুঠরীতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন মেরী এবং তাঁর শিশুপুত্র।

১৬৪০ খৃঃ ইথিওপিয়ার কারাগারে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষারত জেস্যুইট সন্ন্যাসী, ব্রুন-ব্রুনের সামনে আবির্ভূত হয়ে যিশু তাঁকে সাহস সঞ্চয় করতে বলেছিলেন।

১৬৫৪ খৃঃ আখেনের কাছে আল্ট্‌ হোফেনের চাষী ডিট্রিখ ম্যুয়্‌ফার্ট্‌ শিকার করতে গিয়ে গাছের ডালে একটি অলৌকিক মূর্তি দেখতে পান। তিনি এবং তাঁর দুই বন্ধু প্রতি রাত্রে সে-মূর্তির কাছে স্তোত্র পাঠ করতেন। মূর্তিটি থেকে সব সময়ে একটা উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হত। সে স্থান আজ একটি তীর্থ-ক্ষেত্র, একটি গির্জেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে।

১৬৫৭ খৃঃ আর্জেন্টিনের বুয়েনস আইরেসের একটি চাষার মেয়ে এবং দুটি সন্ন্যাসীর সামনে আবির্ভূতা হয়ে মেরী সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছিলেন।

৮।১১।১৬৭০ সিলীশার গ্যোর্লিৎসের আকাশে সর্বজনসমক্ষে একটি রক্তাক্ত তরবার দৃশ্যমান হয়েছিল।

১৬৭১ খৃঃ ফ্রান্সের মার্গারিট মারি আলাকোক তাঁর সংসারাশ্রমেই মেরীর দর্শন লাভ করেছিলেন, পরে সালেসীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে সন্ন্যাসাশ্রমে যিশুরও দর্শন পেয়েছিলেন।

১৬৭৯ খৃঃ জার্মানীর আল্‌বেগুফের তীর্থক্ষেত্রের গির্জের ওপরে অপূর্ব দীপ্তিমান নানা মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে।

আঃ ১৬৮২ খৃঃ ইতালির মার্কাতেল্লায় ভেরোনিকা গিউলানিকে দর্শন দান করেছিলেন প্রভু যিশু, তাঁর দেহক্ষতও দেখা গিয়েছিল।

১৬৯৬ খৃঃ কিটোর (ইকোয়েডর) পুরোহিত এক মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন অলৌকিক উপায়ে। গুয়াপুলোর মূর্তিকে আনা হয়েছে সান্ধ্য-শোভা-যাত্রার উদ্দেশ্যে, স্তুতিপাঠ শুরু হতেই মেরীর আবির্ভাব 'স্বর্গের রানী' রূপে।

২১।৯।১৮২৩ মর্মন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যোসেফ স্মিথ এক দেবদূতের দর্শন পেয়েছিলেন, দেখেছিলেন, তিনি আলোকরশ্মি বেয়ে স্বর্গে চলে যাচ্ছেন। পরবর্তী এক আবির্ভাব তাঁকে নিয়ে গেছে একটি গুপ্ত স্থানে, সেখানে তিনি পেয়েছেন লিপি সমন্বিত কতকগুলি স্বর্ণ-ফলক। সেই ফলক সমষ্টির অনুবাদই মর্মন বাইবেল।

১৮৩৫ খৃঃ ইতালির ত্রিনিতাপোলিতে একটি ছ'বছরের ছেলে গর্তে পড়ে গিয়েছিল, মেরী তার কাছে আবির্ভূতা হয়ে তাকে বলেছিলেন ভালো ছেলে হতে, দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে আর খেলা না করতে।

২৪।১।১৮৪০ সন্ন্যাসিনী য়ুস্তিন বিস্কোয়েবুরু মেরীর দর্শন লাভ করেছিলেন পারীতে,—তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়ে বিদ্ধ ছিল একটি তরবারি, পরনে ছিল শ্বেত বস্ত্র এবং নীল অবগুণ্ঠন।

৮।৫।১৮৪০ আর্সের পুরোহিত, জাঁ বাপ্তিস্ত্ ভিয়ানি এবং শ্রীমতী এতিয়েনে ডুরিয়ে তাঁদের ঘরে মেরীর দিব্যদর্শন লাভ করেন। মেরীর পরনে ছিল শ্বেত বস্ত্র, তাতে লাল গোলাপের বুটি, মাথায় তারার মুকুট আর হাতে ঝকমকে হীরে।

৮।৯।১৮৪০ সন্ন্যাসিনী য়ুস্তিন বিস্কোয়েবুরু ব্লাঙ্গেতে আরো একটি দিব্যদর্শন লাভ করেছিলেন, সেবারে তাঁর ওড়নার রং ছিল সবুজ।

২০।১।১৮৪১ আলফন্‌সে রাতিস্‌বন্নে (আগে তিনি ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছিলেন) মেরীকে দেখেছিলেন, রোমের সেণ্ট আন্দ্রিয়াস দেল্লে ফ্রাত্তের গির্জেয়। সে-মূর্তি তাঁর পদকে উৎকীর্ণ মূর্তির হুবহু প্রতিচ্ছবি।

১৮।৮।১৮৪২ সন্ন্যাসিনী মারিয়া-স্তানিস্লাউস্ প্রায়ই মেরীকে দেখেছেন, তুর্নাইয়ের (বেলজিয়াম) কাছে, তাঁর মঠের ভেতরে।

১৯।৯।১৮৪৬ লা সালেতে (ইস্রে, ফ্রান্স) মাদোন্নার আবির্ভাব ঘটেছিল মাক্সিমিন গিরাউদ (১১) এবং মেলানি কাল্ভাতের (১৫) কাছে। তাঁর পরনে ছিল উজ্জ্বল শ্বেত বস্ত্র। মেয়ে দুটির সঙ্গে কথাও বলেছিলেন তিনি।

১২।৫।১৮৪৮ বাভেরিয়ার ওবের্মাউয়ের্বাখে কৃষিশ্রমিক স্তিখমায়ের সেদিন সকালে এবং সন্ধ্যায়, দুবার মেরীকে দেখেছিল মাঠের ওপরে। পরনে ছিল লাল পোষাক, মাথায় ঘোমটা এবং মুকুট, নিথর হয়ে বসে বসে কাঁদছিলেন তিনি।

২৩।৬।১৮৪৮ লুর্দের কাছে মন্তেসে গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ মেরীর দর্শন পেয়েছে বারে বারে।

১৯।৫।১৮৫৩ তাসকানির চেরেত্তোর ভেরোনিকা নুক্চি মাদোন্নাকে প্রায়ই দেখেছেন, পরনে নীল পোষাক, মাথায় সোনার মুকুট, গায়ে ফুলের গয়না।

২২।৭।১৮৫৬ আসিসিতে (ইতালি) এক অলৌকিক নিরাময়ের পর ব্রে-এর মারি-ফ্রেদেরিকে মেরীকে দেখেছিলেন দেবদূতদের রাণী রূপে।

১২।২।১৮৫৮ সন্ত বের্নাদেৎ সুবিরু লুর্দে মেরীর দর্শন লাভ করেছে অনেকবার।

১৮৬০ খৃঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'গ্রীন বে'তে মেরী আবির্ভূতা হয়েছিলেন আডিল ব্রিস্-এর কাছে, তখন তাঁর পরিধানে ছিল শুভ্র বস্ত্র এবং নীল কটিবন্ধ।

৬।৯।১৮৬০ যিশুর অনেক দর্শন পাবার পর দৈবশক্তিসম্পন্ন পলিন পেরিয়ে মাদোন্নাকে দেখেছিলেন ফ্রাঙ্কুলের (ফ্রান্স) গির্জেয়। সেদিন তাঁকে বেশ কমবয়সী মেয়ের মত দেখাচ্ছিল, পরনে ছিল তারকাখচিত বস্ত্র, মাথায় সোনার মুকুট আর হাতে ছোট ছোট সাদা ফুল।

১৮৬৩ খৃঃ আংলের (ফ্রান্স) মঠের প্রতিষ্ঠাতা এল. ই. সেস্তাককে মেরী দেখিয়েছিলেন, শয়তানরা কেমন করে পৃথিবী ধ্বংস করেছিল।

১৩।১।১৮৬৬ বোহেমিয়ার ফিলিপ্‌স্‌ডর্ফের (চেকোস্লোভাকিয়া) মাগ্দালেন কাদে (৩০) যখন মরণাপন্ন রোগে শয্যাশায়ী, তখন মেরী আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে রোগমুক্ত করেছিলেন।

১৫।৪।১৮৬৮ বেলজিয়ামের বোয়া দ'হাইনেতে অতীন্দ্রিয়বাদী এবং খৃস্টদেহ ক্ষত প্রাপ্ত লুই লাতো যিশু, মেরী, নানা দেবদূত, এবং সন্তদের দর্শন লাভ করেছিলেন।

২।১২।১৮৭০ ফ্রান্সের পোতে লোয়ানির কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত পোপীয় জোয়াভের ভূতপূর্ব সৈন্যাধ্যক্ষ, দ্য সোনিসকে মা মেরী দর্শন দান করে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

১৭।১।১৮৭১ ফ্রান্সের পঁসেঁতে সাতটি ছেলেমেয়ে মা মেরীকে দেখেছিল, তখন তাঁর পরনে ছিল গাঢ় নীল পোষাক, তাতে সোনালী তারকা খচিত, মাথায় কালো ওড়না আর সোনার মুকুট আর 'উকিলদের জোব্বার মত' তাঁর জামার চওড়া আস্তিন।

৪।৮।১৮৭১ লোসান্নের কাছে (সুইৎসার্ল্যাণ্ড) চাপেলেতে মারি-ফ্রাঁসোয়া দেকোতার্ৎ ছোটবেলা থেকে রোগে

ভুগছিলেন। তাঁর রোগ শয্যায় মেরীর আবির্ভাব ঘটেছিল দুবার।

১৫।৮।১৮৭১ ফ্রান্সের ওয়েল্শ্ব্রন্। বার্বারা কনরাদ (৯) বড্ড ভুগছিল। মেরী তাকে কয়েকবার দর্শন দান করেন, তারপর সে হঠাৎ সেরে ওঠে।

২৫।৮।১৮৭১ যুক্তরাষ্ট্রের সেণ্ট লুইসের টেরিসা শ্যাফার যখন মারাত্মক রোগে শয্যাগত, তখন মেরী তাকে দর্শন দিয়েছিলেন, তাঁর পরনে ছিল শুভ্র বস্ত্র এবং সোনালি তারার মুকুট।

৭।৭।১৮৭২ ক্লেমেন্তিন জি. কুমারী মেরীকে পুরো এক ঘণ্টা ধরে দেখেছিলেন, ফ্রান্সের ল'হপিতাল গির্জেয়, তখন তাঁর পরনে ছিল সোনালি পোযাক, হাতে একটা বল এবং তাঁকে জার্মান এবং ফরাসী সেনারা ঘিরে ছিল।

১৮৭৩ খৃঃ দুটি মেয়ে রাত্রে কয়েকবার মেরীর দর্শন পাবার পরেই মারা গিয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল, মিশেল্স্-বের্গের কাছে রিক্স্হাইমে (ফ্রান্স)।

১০।৩।১৮৭৩ ফ্রান্সের স্যাঁৎ আভোল্দের কাছে কাথরিন ফিল্য়্যং নীলবসনা মেরীর দর্শন লাভ করেছিলেন।

১৭।৩।১৮৭৩ আলজাসের ভিত্তেল্স্হাইমে নানা বয়সের বহু লোক মেরীর দর্শন পেয়েছিল অনেকবার অনেকদিন ধরে।

১২।৪।১৮৭৩ আলজাসের বহু লোক মেরীর দর্শন লাভ করেছিল বটে, কিন্তু তারই কাছাকাছি ভাল্বাখের য়োসেফ হুফেয়ার যখন তাঁর দর্শন লাভ করে, তখন মা বলেছিলেন, লোকে যেন প্রার্থনা করে, প্রায়শ্চিত্ত করে।

৭।৬।১৮৭৩ মঁপেলিয়ের স্যাঁৎ-বজিল দে লা সিল্‌ভিয়ের আঙুর ক্ষেতে কাজ করবার সময় আউগুস্ত্‌ আর্নল্ডের কাছে আবির্ভূত হয়ে মা মেরী বলেছিলেন, আঙুর ক্ষেতে তাঁর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে এবং একটি মিছিলের ব্যবস্থা করতে।

১৯।২।১৮৭৬ পেলেভোয়াসিনে (ফ্রান্সের ইন্দ্রেসে) মরণাপন্ন এস্তেল ফাগুয়েৎ পনেরো বার মেরীর দর্শন পেয়েছিল।

২৭।৮।১৮৭৭ আল্লেনস্তাইনের কাছে (পোলাণ্ডে) দিত্রিখ্‌স্‌-ভাল্তেতে বিভিন্ন বয়সের চারটি মেয়ে অনেকদিন ধরে ১৬০ বার মেরীর দর্শন লাভ করেছিল, কখনো তিনি ভাসমান, কখনো উপবিষ্ট, কিন্তু সব সময়ে একটা উজ্জ্বল মেঘে পরিব্যাপ্ত এবং সঙ্গে কয়েকজন দেবদূত ছিল।

২১।৮।১৮৭৯ আয়ার্ল্যাণ্ডের রুক্‌ মুইরে বিভিন্ন বয়সের পনেরোজন দিব্যদ্রষ্টা মেরীর দর্শন লাভ করেছিল, তাঁর পরিধানে ছিল শুভ্র বস্ত্র এবং স্বুবর্ণ মুকুট। নীরব মেরীর হাত ছুটি প্রার্থনার ভঙ্গিতে উত্তোলিত, দক্ষিণে সন্ত যোসেফ এবং বামে সন্ত জন, সেই সঙ্গে একটি বেদীর ওপর বলির মেষ-শাবক।

২।১।১৮৮২ লায়নসের (ফ্রান্স) হাসপাতালে আনি-মারি কস্তে মেরীকে দেখেছিল জমকালো পোষাকে এবং মুকুটে সজ্জিতা এবং মেঘারূঢ়া। তাঁর কোলে ছিলেন শিশু যিশু। যিশুর হাতে ছিল একটি ভূগোলক এবং একটি ভাঙা ক্রুশ।

১৮৮৪ খৃঃ স্যাঁৎ কলাম্বিনের মারিয়া লর্দো ন'বছর বয়সে অনেকবার মেরীর দর্শন পেয়েছিল।

২৯।১১।১৮৮৬ ফ্রান্সের দিয়েমজে মারি-লুই নের্বোলিয়ে (২৭) মাদোন্নার দর্শন লাভ করেছিলেন।

১২।৩।১৮৮৮ প্রথমে ইতালির পিয়েতায়, পরে কাস্তেল-পেত্রোসোর গুহায় দুটি কুমারী মেয়ে, বয়স তাদের তিরিশের ভেতরে, মেরীর দর্শন লাভ করেছিল।

২।৫।১৮৯০ ফ্রান্সের সিগন্যুতে দুটি শিশু, আলফ্রেদ এবং মারি কাইলোঁ, আলোর মেঘের ভেতরে মেরীকে দেখেছিল, দীর্ঘ ওড়নায় দেহ আবৃত এবং যুক্তকর।

১৮৯৩ খৃঃ এংহিয়েনে (বেলজিয়াম) বার্থা পেতি বড়দিনের অনুষ্ঠানে দেখেছিল ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে, তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেরী এবং জন।

১৮৯৫ খৃঃ তেলেঙ্গানার (ভারত) অসুস্থ কৃষ্ণন শঙ্কর-নারায়ণমের (১২) কাছে শিশু যিশু কোলে মা মেরীর আবির্ভাব ঘটেছিল।

১৮।৩।১৮৯৬ খৃঃ বেয়োঁর (ফ্রান্স) তিল্যু-স্যুর-স্যুয়েতে পাঠশালার পঞ্চাশটি ছেলেমেয়ের কাছে মেরীর আবির্ভাব ঘটেছিল দেবদূত এবং সন্তদের সঙ্গে নিয়ে।

১৯০৬ খৃঃ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক চার্লস্ রিকেটের সামনে মাটির ওপরে আবির্ভূত হয়েছিল উজ্জ্বল সাদা আলোর একটা ভাসমান গোলা।

১৯০৬ খৃঃ কিটোর (ইকোয়েডর) সান গাব্রিয়েল জেস্যুইট কলেজের ক্লাশে পাঠের বিরতির সময়ে শিক্ষক এবং ছাত্রেরা দেখেছিল যন্ত্রণাকাতর মাদোন্নাকে। বারে-বারে তিনি চোখ বুজছিলেন এবং খুলছিলেন, মুখের ভাবেরও পরিবর্তন হচ্ছিল।

১২।৯।১৯১৪ পটশিঙ্কির কাছে এক চাষীবউয়ের কাছে দৈববাণী হয়েছিল, মস্কোর কাছে কোলোসেস্কোয়েতে একটা কালো প্রতিমা লুকোনো আছে। প্রতিমাটি সেইখানেই পাওয়া গিয়েছিল।

১৩।৫।১৯১৭ হঠাৎ অপ্রত্যাশিত একটা বিদ্যুৎচমকের পর পর্তুগালের ফতিমার তিনটি রাখাল ছেলেমেয়ে মেরীকে দেখতে পেলো। উজ্জ্বল সাদা পোষাক পরা, মাথায় সাদা গোলাপের মুকুট, ওক গাছের মাথার ওপরে ভাসছেন।

১২।৫।১৯১৮ তিনটি ছেলেমেয়ে ভান্নের কাছে (ফ্রান্স) মুজিল্লাকে মেরীকে দেখেছিল পঁয়ষট্টিবার।

৮।১২।১৯২১ ত্রিয়েরের কাছে (জার্মানী) বিকেন্ডর্ফে আন্না-মারিয়া গোয়েপেল ত্রাণকর্তা যিশুকে অনেকবার দেখেছিল।

১০।১২।১৯২৫ স্পেনের কনভেন্ট্ দ্য তুইতে ভগিনী লুসির কাছে মেরী আবির্ভূতা হয়েছিলেন শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে।

জুলাই ১৯২৬ ফ্রান্সের মার্লেমঁয়ে ছ'বছরের মারিয়া পি-এর কাছে মেরী দুবার আবির্ভূতা হয়েছিলেন কাঁদতে কাঁদতে। মারিয়া এত বিচলিত হয়েছিল যে মেজে থেকে চোখের জল পুঁছে ফেলার চেষ্টা করেছিল।

১।৩।১৯২৮ ভোজ্-এর (ফ্রান্স) ফেদ্রর্ুপ্তে ছেলেরা মেরীকে দেখেছিল সাদা পোষাকে (ওড়না ছিল না !), কিন্তু তাঁর হাত থেকে রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

৮।৪।১৯৩০ ব্রেজিলের কাম্পিনাসের ইনস্টিট্যুট অব মিশনারিজ অব ক্রাইস্ট ক্রুসিফায়েডে'র সহপ্রতিষ্ঠাত্রী.

ভগিনী আমেলিয়া অনেকবার মেরীর দর্শন লাভ করেছেন।

২।৬।১৯৩১ স্পেনের এস্‌কিয়োগায় বিভিন্ন বয়সের বহু লোক (অনেক অবিশ্বাসীও ছিল তাদের ভেতর) নিষ্কলঙ্ক মেরীকে দেখেছিল, সঙ্গে ছিলেন অনেক দেবদূত এবং সন্ত।

২৯।১১।১৯৩২ বেলজিয়ামের বোরাইঙ্গে পাঁচটি দেগাইস্বার শিশু মেরীকে দেখেছিল, শ্বেত বস্ত্র, উত্তরীয় এবং সোনার মুকুটে সজ্জিতা।

১৫।১।১৯৩৩ বেলজিয়ামের বান্নোতে বারো বছরের মেয়ে মারিয়েৎ বেকোকে দর্শন দিয়েছিলেন মা মেরী 'স্বর্গীয় জননী' রূপে।

১৬।৭।১৯৩৩ মঁ-স্যাঁৎ-মিশেলের কাছে (ফ্রান্স) ক্রোলোঁতে ছেলেরা মেরীকে দেখেছিল শ্বেত বস্ত্র এবং গোলাপের মুকুট পরা।

৪।৮।১৯৩৩ তেরোটি ছেলেমেয়ের জননী, রোগগ্রস্তা শ্রীমতী নিয়েকে ফন দেন্ দিইক্ বেলজিয়ামের অঙ্কার্জীলে অনেকবার মেরীকে দেখেছেন। ২৮-শে ডিসেম্বর তিনি সবজেটে-লাল একটা ঘূর্ণমান সূর্যও দেখেছিলেন।

২।১০।৩৩ বেলজিয়ামের হেৎসিলেতে জুল দ্য ভাইস্ত (৪০) তাঁর ঘরের ভেতরে আলোকমণ্ডিতা মেরীকে দেখেছিলেন।

১২।১০।১৯৩৩ ফ্লাণ্ডার্সের (বেলজিয়াম) আল্‌সেনে মরিস ভাণ্ডেস্বোয়েকের সামনে মেরী আবির্ভূতা হয়েছিলেন নীল পোষাকের ওপর তারার মালা পরে।

১১।৪।১৯৩৬ বেলজিয়ামের হাম-সুর-সাম্বেতে এমেল্ডা এবং

আদিলিন পিয়েৎকুইন পরিষ্কার নীল আকাশে দেখেছিল, দেবদূত পরিবৃতা মেরীকে।

১।১১।১৯৩৭ এম্‌স্‌লাণ্ডের (জার্মানী) হীড্‌-এ বারো থেকে চোদ্দ বছরের চারটি মেয়েকে মেরী দর্শন দিয়েছিলেন কবরের ওপরে, কোলে সোনার মুকুট পরা শিশু যিশুকে নিয়ে।

১৫।৮।১৯৩৮ জার্মানীর বোখুমে উর্স্যলা হিব্বেল্‌ন্‌ মেরীকে প্রায়ই দেখেছেন, 'অতি পবিত্র ত্রয়ীর তুষার শুভ্র লিলি রূপে'।

১৫।৯।১৯৩৮ ব্রিতানির ফেরিজিনেনের চাষী-বউ জা-লুই রামোনেৎএর সামনে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, অপূর্ব নীলবসনা এক 'তরুণী'।

৯।১১।১৯৩৯ ডোনিগলের (আয়ার্ল্যাণ্ড) কেরিটাউনের বাসিন্দারা অনেকদিন ধরে মেরীকে দেখেছে পাহাড়ের ওপরকার আকাশে।

১৩।৫।১৯৪০ জার্মানীর ফাফেনহফেনের বায়ের্পেল রুয়েস (১৬) মা মেরীর দর্শন পেয়েছিল। ছ'বছর পরে সে আরো অনেকবার দিব্যদর্শন লাভ করেছে।

১৯।৬।১৯৪০ ব্রেস্তের কাছে (ফ্রান্সে) বোদেন্ন্যয়ের তেরেসে কোৎ ঘন মেঘের ভেতর শিশুপুত্র ক্রোড়ে মা মেরীর দর্শন পেয়েছিল।

১৮।৬।১৯৪০ অর্তনকুরে জাঁয়েৎ তোশে মেরীকে দেখেছেন নানা মূর্তিতে।

১৯৪৩ খৃঃ শ্রী এবং শ্রীমতী দেবোর মেরীকে দেখেছেন, মৃত যিশুর দিকে চেয়ে কাঁদছেন তিনি।

৪।১২।১৯৪৩ লিথুয়ানিয়ার গ্রিস্কোলনেসের বাসিন্দারা এক

সন্ধ্যায় গির্জের ওপরে আলোর মুকুট পরা কুমারী মেরীকে দেখেছিল।

১৩।৫।১৯৪৪ বের্গামোর কাছে (ইতালি) বোনাতেতে আদিলি রঙ্কাল্লী আটবার মেরীর দর্শন লাভ করেছিল। তাঁর পরনে ছিল শুভ্র বস্ত্র, মাথায় ছিল মূল্যবান মুকুট।

২৭।৫।১৯৪৫ প্রথমে মার্সেলোনা বারোসা (১০) মাদোন্নাকে অনেকবার দেখতে পায়, পরে বয়স্কেরাও দেখতে পেয়েছিলেন।

১১।৬।১৯৪৬ ডালমেশার পাসমানে মেঘের ভেতর তারার মুকুটে সজ্জিতা মেরীকে দেখেছিল সেখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

২২।৮।১৯৪৬ মসাকের কাছে (ফ্রান্স) এস্‌পিসে ছেলে-বুড়ো, সবাই মেরী এবং নানা দেবদূত এবং সন্তদের আবির্ভাব দেখেছে।

১০।১০।১৯৪৬ ভিলার-চাওয়ে হাজারো দর্শকের মাঝে রুগ্ন আমেলিয়া নাহিরিদাদে মেরীর দর্শন লাভ করেছিল।

১২।৪।১৯৪৭ রোমের কাছে ত্রে-ফন্তানের গুহায় ব্রুনো কর্নাককিয়োলা এবং তাঁর তিন ছেলেমেয়ে অনেকবার মেরীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তখন তাঁর পরনে ছিল, শ্বেত বস্ত্র, লাল কটিবন্ধ, সবুজ ওড়না আর হাতে একটা ছোট বই।

২৭।৮।১৯৪৭ হল্যাণ্ডের ফর্স্তেনবশে আন্তেন এবং বের্তুস ভান দেন ভেল্‌দেন নামে এক বাচ্চার কাছে মাদোন্না আবির্ভূতা হয়েছিলেন, আসমানী রঙের পোষাকে এবং লিলি ফুলের সোনালি মুকুটে।

২।৭।১৯৪৭ হাঙ্গেরীর সেণ্ট এম্মেরিখ-বের্কে ক্লারা

লাস্‌লোনের বাড়িতে আবির্ভূতা মেরী এমন একটা ঝর্ণা দেখিয়েছিলেন, যেখানে রোগ সারে।

৪।৭।১৯৪৭ জার্মানীর তানহাউজেনে শ্রীমতী টি. পাউলা (৪৮) শ্বেত গোলাপের মালা পরা মেরীর দর্শন অনেকবার পেয়েছেন।

১৬।১১।১৯৪৭ প্রথমে মন্তিকিয়ারীর রাস্তায়, পরে 'কনভেন্ট্‌ অব দি সিস্টার' অব মার্সি'র গির্জের ওপরে ধাত্রী, পিয়েরিনা জিল্লি মেরীর দর্শন পেয়েছিল 'রহস্য গোলাপ' রূপে।

২৬।১১।১৯৪৭ ভান্নের কাছে (ফ্রান্স) প্লেসকপের তিনটি মেয়ে, তেরেসে লে কাম, আন্নিক, আর মোনিক গোয়ামগুয়েন মেরীর দর্শন পেয়েছিল 'নিষ্কলঙ্ক-গর্ভা' রূপে।

১৯।৫।১৯৪৮ ভিতের্বোর কাছে (ইতালি) মার্তার গুহায় প্রথমে চারটি ছেলেমেয়ে, পরে আরো অনেকে মেরীর দর্শন লাভ করেছিল।

১২।৯।১৯৪৮ ফিলিপাইনের লিপায় নবদীক্ষিতা তেরেসিতা প্রায়ই মেরীর দর্শন লাভ করেছে। তাঁর পরনে ছিল শ্বেত বস্ত্র, মাথায় গোলাপের মুকুট, হাত দুটি প্রথমে ছিল নমস্কারের ভঙ্গিতে যুক্তকর, পরে প্রসারিত।

১১।১১।১৯৪৮ অষ্ট্রিয়ার আস্পাঙের লোকেরা কোয়েনিক্‌স্‌-বের্কের আকাশে একটা মেঘকে দাঁড়াতে দেখলো, তারপর সে মেঘ হালকা হতে হতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। তার ভেতর থেকে ভেসে এলেন নীল ওড়না পরা মা মেরী, মাথায় সোনার মুকুট, হাতে জপমালা।

৭।১২।১৯৪৮ আর্দেনের (ফ্রান্স) লিয়ার্তেতে কমিউনিস্ট, লুই

মার্সিয়ে এবং আরো এগারোজন এক নীরব মাদোন্নার দর্শন পেয়েছিলেন।

১৮।১২।১৯৪৮ ফ্রান্সের স্যাঁৎ জাঁ-ও-বোয়ায় শ্রীমতী লুসি মান্তো (২৩) অল্পক্ষণের জন্যে মা মেরীর দর্শন পেয়েছিলেন।

১২।৫।১৯৪৯ পির্সাজেনসের কাছে (জার্মানী) ফেহ্‌র্বাখে জেন্তারুস মেরীকে দেখেছিল, দীর্ঘ সাদা পোষাকে। মাথায় তাঁর সোনার মুকুট আর হাতে ফিকে-হলুদ জপমালা।

জুলাই ১৯৪৯ পোলাণ্ডের লুবলিনের গির্জেয় মেরীর একটি মূর্তির চোখ দিয়ে পুরো দুদিন ধরে রক্ত ঝরেছিল।

৯।১০।১৯৪৯ প্রথমে চারটি, পরে সাতটি মেয়ে, তারপরে অন্ততঃ তিনশো হেরল্ট্‌স্‌বাখ-থুর্নের বাসিন্দা (বাভেরিয়া) মেরীর দর্শন লাভ করেছিল। তাঁর দেহে ছিল রাণীর মত জমকালো পোষাক এবং মাথায় সোনার মুকুট।

১৪।৩।১৯৫০ ইতালির কাসালিক্কিয়োয় বারো বছরের মেয়ে, পিনা মাল্লিয়া মেরীকে দেখেছিল, বিপুল সাদা পোষাকে, মাথায় ছিল ঝকমকে মুকুট।

৭।৪।১৯৫০ কাসালিক্কিয়ো আর আকোয়াভিভার হাজার হাজার মানুষ বলে, সেদিন তারা একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিল। একখানা মেঘ ফেটে গেল আর তার ভেতরে একটা উজ্জল তারা আর একটা দীপ্ত সূর্য বন-বন করে ঘুরতে ঘুরতে বহু রঙের বিচিত্র ছটা বিকীর্ণ করতে লাগলো।

১৯।৯।১৯৫০ যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভারে একটি স্কুলের মেয়ে, মেরী এলেন (১৫) মা মেরীর দর্শন পেয়েছিল মেঘের ভেতরে। তখন তাঁর দেহ ওড়নায় আবৃত, চোখে

জল, হাত দুটি বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা।

৩০।১০।১৯৫০ প্রধান পুরোহিত, তেদেস্কিনি জানিয়েছিলেন, দ্বাদশ পোপ তাঁর বাগানে, ফতিমায় দেখা সৌর অলৌকিকের মত ঘূর্ণমান একটি সূর্য বহুবার দেখেছেন।

শরৎকাল ১৯৫১ মিলানের কাছে (ইতালি) আর্লিনোয় মেরী দর্শন দিয়েছিলেন, উনচল্লিশ বছরের লুইগিয়া নোভাকে, 'দীন তারিণী' রূপে।

১৯।৮।১৯৫১ ডুগ্নীর (ফ্রান্স) খড়ি কারখানার তিনটি শ্রমিকের কাছে আবির্ভূতা হয়েছিলেন শিশু যিশু কোলে মা মেরী, তাঁর পরনে ছিল, শ্বেত বস্ত্র এবং নীল উত্তরীয়।

১।৭।১৯৫২ জার্মানীর বোদাল্লেনে ষাটজন লোকের চোখের সামনে, দিব্যদর্শন দিতে এসে আন্নেলিজে ভায়াৎ-সিককে মেরী একটি সাদা কাপড়ের ওপরে এঁকে দিয়েছিলেন, রক্ত দিয়ে আঁকা হৃদয়ের একটি ছবি, একটি পানপাত্র এবং পবিত্র ভোগ।

১০।৭।১৯৫২ বেলজিয়ামের জের্পিন্নেসে সাত বছরের রোজেৎ কলমেৎ মেরীকে দেখেছিল, পরনে লাল-নীল 'হৃদয়' ছাপা সাদা পোষাকে।

১৯৫৩ কালের কাছে (ফ্রান্স) হাইদ্রেকোয়েন্তের গুহায় দশ বছরের ও. লাভোয়াসিয়ে এবং পরে আরো পঞ্চাশ জন মেরীকে দেখেছিল নীল পোষাকে এবং সাদা ওড়নায়।

আগস্ট ১৯৫৩ বিভিগ্নিয়ানোর কাছে (ইতালি) মন্তি সেনারিওতে উনপঞ্চাশ বছরের পাচক, গালিলিও সাক্রেস্তানি অনেকবার মাদোন্নার দর্শন লাভ করেছিল।

১৯।৭।১৯৫৪ জার্মানীর পিংস্‌ডর্ফের দুটি বিশ্বাসী প্রোটেস্টাণ্ট ঝি মেরীর দর্শন লাভ করেছিল।

শরৎকাল ১৯৫৪ জার্মানীর আইজেনবের্কের ছ'বছরের মেয়ে আন্নালেক্‌স্‌ মা মেরীকে একটা উজ্জ্বল গোলকে ভাসতে দেখেছিল।

১।৭।১৯৫৮ মাতুশ লাশুৎ (৪১) বলেছেন, আটান্ন সালের ১লা জুলাই থেকে তুর্‌সোফ্‌কায় (চেকোস্লোভাকিয়া) সাতবার যিশুকে দেখেছেন। প্রতিবারেই তিনি গোলাপের একটি সমবাহু ত্রিভুজের ভেতরে ছিলেন। তুর্‌সোফ্‌কা আজ একটি তীর্থক্ষেত্র!

১৮।৬।১৯৬১ স্পেনের কারাবান্দালে চারটি ছোট মেয়ে প্রধান দেবদূত, মাইকেল এবং মেরীর দর্শনলাভ করেছিল কয়েক হপ্তা ধরে। সেখানে সৌর অলৌকিকও দেখা গিয়েছিল।